প্রথম প্রকাশ ঃ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

গ্রন্থন ঃ ব্যানার্জি এণ্ড কোং

ব্লক ঃ স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রণ ঃ মোহন মুদ্রণী

মুদ্রাকর—বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/এ, বলাই সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ঃ কাফি খাঁ

বিষয় সূচী

চতুর্থ স্তবক : রবীন্দ্র চর্চা

পরিশিষ্ট

গোড়ার কথা

রবীন্দ্রনাথের জীবন, সাহিত্য ও মতামত সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের বোধযোগ্য সম্পূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত একখানা বই লেখার অনুরোধ এ পর্যন্ত পেয়েছি অনেক জায়গা থেকেই। কিন্তু এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশী উদ্দীপনা দেন আমাকে কলকাতার উপকণ্ঠস্থিত একটি শিল্প-সহরের জনৈক প্রবীণ কবিরাজ। তিনি বলেন, ছোট্ট করে সহজ করে যা-কিছু জানার কথা, বোঝার কথা, সব যদি লেখেন কবি সম্বন্ধে, একমাত্র তাহলেই উপকার হয় আমাদের মতো মানুষদের। আমরা পড়েছিও কম, জানিও কম, কিন্তু শ্রদ্ধা বা আগ্রহ ত কম নয় আমাদের! সেই আগ্রহ মেটাবার মতো বই কৈ?

ঐ ভদ্রলোকের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুপ্রেরণা থেকেই সূত্রপাত এই বইয়েব। এতে রবীন্দ্র জীবনের সবগুলি দিকের মোটামুটি বিবরণ আছে, আছে রবীন্দ্র সাহিত্যের সবগুলি বিভাগের আলোচনা এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সচরাচর সকলের মনে উদিত হয় যে জিজ্ঞাসাগুলি, তার প্রত্যেকটারই উত্তর আছে। আমি শুধু লক্ষ্য রেখেছি, আলোচনা যাতে দীর্ঘ না হয় এবং পণ্ডিতী বিচারের জটিলতায় সোজা কথাগুলি কোথাও যাতে হারিয়ে না যায়! রবীন্দ্রনাথের জীবন ও মননের একটি সামগ্রিক কাঠামো হিসাবে এই বইই বোধ হয় বাংলা ভাষায় প্রথম এবং এ রকম প্রচেষ্টা যতটুকু সফল হতে পারে, তার বেশী প্রত্যাশা আমি করব না। এই রচনা থেকে যদি কেউ রবীন্দ্র-বোধে এতটুকুও উদ্বুদ্ধ হন, তাহলে সে-ই হবে আমার সেরা পুরস্কার।

এই বই রচনায় আমি প্রধান সহায়তা নিয়েছি রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা থেকেই। আপন জীবন ও মননের ব্যাখ্যাতা হিসাবে তাঁর মতো উদারহস্ত বোধহয় পৃথিবীর আর কোন মনীষীই নন। এ ছাড়া বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ কবিরত্ন, নন্দলাল বসু, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবী, হেমলতা দেবী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, অমল হোম, প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা রবি-প্রসঙ্গও নানা অধ্যায়ে মূল্যবান আলোকপাত করেছে। রবীন্দ্র তত্ত্ব-বিচারেও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অরবিন্দ ঘোষ,

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রিয়নাথ সেন ও অজিত চক্রবর্তী থেকে সুরু করে, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বিনয়কুমার সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত গণনীয় ব্যক্তিদের সকলের আলোচনা-গবেষণাই একযোগে আমার রকমারি সিদ্ধান্ত গঠনে সহায়তা করেছে। করেছে লেভী, লেজনী, কর্মিকি, টমসন, য়েটস, আর্ণেষ্ট রীজ, রোটেনষ্টাইন, কারপালে ও আঁদ্রে জিদ প্রমুখ বিদেশীদের লেখাও। কিন্তু কারো কোন বিচার বা অভিমতই ভালো করে যাচিয়ে বাজিয়ে ভিন্ন গ্রহণ করা হয় নি এই বইয়ে।

এই বই লেখা ও প্রকাশে যাঁদের সাহায্য আমার সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে, সাহিত্যানুজ ঋষি দাস তার মধ্যে প্রধান। এ ছাড়া স্নেহভাজন ছাত্র অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু এবং শিল্পী-বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীর সহায়তাও নানা ভাবেই স্মরণীয়। প্রকাশক বন্ধু শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিখুঁত মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জাসহ বইটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আসরে উপস্থাপিত করেছেন, এজন্যে তাঁর কাছেও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

যুগান্তর সম্পাদকীয় দপ্তর : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

২১শে বৈশাখ, ১৩৬৮

প্র থ ম স্ত ব ক

রবীন্দ্র জীবন

রবীন্দ্রনাথ কাজ কম করেন নি জীবনে। যৌবনে জমিদারী চালিয়েছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়েছেন, পত্রিকা সম্পাদন করেছেন, স্বদেশী-আন্দোলনে দায়িত্বজনক অংশ নিয়েছেন। প্রৌঢ় বয়সে শান্তিনিকেতন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করেছেন, জ্ঞানে-কর্মে পৃথিবীজগতের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধসূত্র প্রতিষ্ঠায় নায়কতা করেছেন। বার্ধক্যেও দেশের জীবন ও মনন ক্ষেত্রে যখনি এসেছে কোন-না-কোন সঙ্কট-মুহূর্ত, তখনি তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন তার পুরোভাগে। জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজদত্ত উপাধিত্যাগ থেকে সুরু করে, হিজলী বন্দীনিবাসে রাজনৈতিক বন্দীর ওপর গুলি চালানোর প্রতিবাদ, অথবা কারাগারে অনশনব্রতী গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্যন্ত, সমস্ত বিপর্যয়েই দেশ তাঁকে অগ্রণী হতে দেখেছে। এমন কি, শেষ রোগশয্যা থেকে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন রাথবোনের উক্তির প্রত্যুত্তরে, তাতেও তাঁর এই কর্মতৎপরতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই বিচিত্র কর্ম-প্রবাহের ভেতর দিয়ে বয়ে গেলেও, জীবনে তিনি কোন দিন একটা কাজকেই সমগ্রভাবে আশ্রয় বা অবলম্বন করে থাকেন নি, একমাত্র সাহিত্য-সাধনা ছাড়া। নিত্য নূতন কাজের ভেতর দিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করে গেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁকে বারম্বার নূতন আঙ্গিক ও নূতন আদর্শের পরীক্ষায় নামতে দেখা গেছে। কখনো গল্প লিখেছেন, কখনো লিখেছেন উপন্যাস-নাটক, কখনো এসেছেন প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। কখনো ধ্বনিগম্ভীর অলঙ্কৃত সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন, কখনো ধরেছেন আটপৌরে কথ্য ভাষাকে। এমন কি, বৃদ্ধ বয়সেও গদ্য-কবিতা, নৃত্যনাট্য, খোসগল্প ইত্যাদির অবতারণা তাঁর এই নূতন নিয়ে পরীক্ষার মনোভাবকেই প্রকটিত করে। প্রাত্যহিক জীবনে যেমন তিনি খাদ্য, পরিচ্ছদ ও বাসগৃহের পরিবর্তন করতেন মুহুর্মুহু, তার এবং কর্মজীবনেও তেমনি রীতি পরিবর্তন করতেন কথায় কথায়। অভ্যস্ততার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী।

এই যে নিত্য নূতনের ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার সজীবতা, শিল্পী হিসাবে এ-ই তাঁকে দিয়েছে অতখানি সাফল্যের প্রবর্তনা। আবার কর্মী হিসাবে এতেই ঘটেছে তাঁতে বস্তুনিষ্ঠার ব্যতিক্রম। আসলে তিনি ছিলেন ভাবের মানুষ। এক-একটা ভাবের বন্যা এসেছে, আর তাই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে এক-একটা কাজের ভেতর। যেই উদ্দীপনা ক্লান্ত হয়েছে, এসেছে বাস্তবের কর্ম-সঙ্ঘাত, অমনি তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। নিজেকে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করে এনেছেন। আকস্মিক ভাবে একদিন যে স্বদেশী-আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, এই হল তার প্রকৃত কারণ। হঠাৎ একদিন জমিদারী তদারক ও বিশ্বভারতী পরিচালনের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারো এই কারণ।

যে পরিবারে তাঁর জন্ম, যে পরিবেশে তিনি মানুষ, তাতে আত্ম-সঙ্কোচনের প্রয়োজন তাঁর

হয়েছে বাল্যকাল থেকেই। আপন ভাব-কল্পনার মধ্যেই তাঁকে বেশীর ভাগ সময় সঙ্গ ও সাহচর্য, আশ্রয় ও অবলম্বন খুঁজতে হয়েছে। জীবনে পিতা-মাতার স্নেহ তিনি পূর্ণ ভাবে পান নি। ভাই-বোনেরা বয়সে এত বড় ছিলেন যে তাঁদের কাছ থেকে তিনি সমবয়সীর সখ্য লাভ করেননি। স্কুল-কলেজে যান নি, তাই সহপাঠী সুজন পান নি। পত্নীর সঙ্গেও মননশীলতার অসমানতা হেতু হয়ত পূর্ণাঙ্গ ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয় নি। আবার সমৃদ্ধ গৃহে জন্মানোর ফলে শিক্ষার জন্যে, আশ্রয় ও অন্ন-বস্ত্রের জন্যে কোন দুঃখ ভোগ করতে হয় নি। কারুর মুখাপেক্ষী হতে হয় নি। তাছাড়া পারিবারিক শাসন ও সতর্কতার আওতায় মানুষ হওয়ায়, ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের সংস্রবে এসে জীবনের প্রত্যক্ষ চেহারাটা ভালো করে দেখারও সুযোগ হয় নি। স্বভাবতই তিনি সকলের মধ্যে থেকেও, থেকেছেন সকলের একান্তে এবং সেই একাকিত্বের শূন্য পূর্ণ করেছেন অধ্যয়ন ও কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়ে। তাই বস্তু-সংসারের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চেয়ে ভাব-কল্পনার সঞ্চয়ের ওপরই তাঁকে বেশী নির্ভর করতে হয়েছে। প্রত্যক্ষ জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দুঃখ-বেদনা, আঘাত-সঙ্ঘাতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় কমই হয়েছে। অথচ দূর থেকে তাঁর সংবেদনশীল কবিচিত্তে এই জীবনের বেদনা কল্পনা পাখায় ভর করে এসে সঞ্চারিত হয়েছে। তারি আহ্বানে তিনি ছুটে গেছেন কর্মের অভিমুখে। কিন্তু নিজেকে টিঁকিয়ে রাখতে পারেন নি সেই সঙ্ঘাতের মধ্যে। তাঁর ভাব-প্রকৃতিই বাধা দিয়েছে তাতে।

দেশের দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অনগ্রসরতা তাঁকে পীড়িত করেছে। তার প্রতীকারও তিনি চেয়েছেন আন্তরিক ভাবে। জ্ঞানে-কর্মে, শিক্ষায়-সংস্কারে দেশের লোক বড় হক, মানুষ হক, সমস্ত ভেদ-বিভেদ ভুলে সকলে এক হক, এই ছিল তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন। স্বদেশী-আন্দোলন, শিক্ষা সংস্কার, সাহিত্য সাধনা, সমস্ত কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর এই স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে। এই স্বপ্নের অনুপ্রেরণাই তাঁকে দেশের সামাজিক অব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সমাজের অনাচার, কদাচার, অন্যায়, অনৈক্যকে তিনি আঘাত করেছেন নির্মম হাতে এবং যা শুভ, যা কল্যাণপ্রদ, তাকে সংস্থাপিত করতেও চেয়েছেন তিনি। কিন্তু এই বেদনাবোধ ও কল্যাণ কামনা যতটা আদর্শের, ততটা বাস্তবের নয়। দেশের চাষী, মজুর, দীনদুঃখী, নিরন্ন, নিরাশ্রয়ের যে জীবন-বেদনা, তার মর্মদেশ পর্যন্ত পৌঁছুবার সুযোগ এবং সুবিধাই তাঁর হয় নি। নিম্ন-মধ্যবিত্তের পরিস্থিতিও তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে কমই। তিনি যে শ্রেণীতে জন্মেছিলেন, সেই শ্রেণী-জীবনের গণ্ডীকে তিনি ছাড়িয়ে উঠেছিলেন শুধু ভাবের প্রেরণায়, কল্পনার উত্তাপে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তু-জীবনে তো নয়ই, ভাব-জীবনেও তিনি শ্রেণী সচেতনতাকে ষোল-আনা বর্জন করতে পারেন নি। তাঁর জীবন-দর্শনের আদি সূত্রটি আবিষ্কার করতে গেলেই দেখা যাবে, পুরাণো তপোবন সংস্কৃতিকে তিনি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। উপনিষদের সাম্য, শান্তি ও সৌন্দর্যবাদই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যাকে তিনি খুব বেশী আমল দেন নি।

এই সাম্য, শান্তি ও সৌন্দর্যবাদই তাঁকে জাতীয়তার গণ্ডী থেকে আন্তর্জাতিকতার অভিমুখে নিয়ে গিয়েছিল। বিশ্বমানব যেখানে নির্যাতিত, পতিত, জীবনের সহজ ছন্দ তার যেখানে

ব্যাহত, সেখানেই তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন দরদী বন্ধুর মতো। জার্মানী ও ইতালীতে স্বৈরশাসনের উদ্ভব তাঁকে ব্যথিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের হাতে উৎপীড়িত চীন ও আবিসিনিয়ার জন্যে তাঁর সহানুভূতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। স্পেনে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ ও ফ্যাসিষ্ট শাসনের আবির্ভাব তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে।

সারা পৃথিবীর জন্যে এই যে বেদনাবোধ, সমস্ত মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্যে এই যে আগ্রহ, এটা উদার মনুষ্যত্বের নিদর্শন হিসাবে স্মরণীয় এবং বরণীয়ও সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বমানবের এই দুর্ভাগ্যের মূল কোথায়, কোন পথে এর স্থায়ী সমাধান, তার ব্যাখ্যানে তিনি অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক পুনর্বিন্যাসকে সমর্থন করেন নি, করেছেন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ব্যাপ্তি ও প্রসারকে। মানব কল্যাণে, সামাজিক বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সোভিয়েট রাশিয়া যা করেছে তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে, মুক্তকণ্ঠে তিনি তার প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু যে উপায়ের সাহায্যে সোভিয়েটকে এই সাফল্যের স্তরে আসতে হয়েছে, তাকে তিনি স্বীকার করতে পারেন নি। বরং 'শোণিতসিক্তনে নতুন সভ্যতার ভিত পত্তন ও ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব গড়বার প্রয়াস' বলেই তিনি সেই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে একাধিক জায়গায় আঘাত করেছেন। সুফী, খৃষ্টান, বৈষ্ণব ও মধ্যযুগীয় মিষ্টিকরা যে মানবাত্মবাদ প্রচার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা ও আন্তর্জাতিকতা তারি একালীন প্রতিরূপ। প্রাচ্যদেশের মর্মবাণী বলেই সারা পৃথিবী এই বাণী আগ্রহ শুনেছে। কিন্তু প্রাণ-বস্তু নিয়ে বিচার করলে, একে ঠিক যুগধর্মসম্মত বলা যায় কি?

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাই বলে প্রগতি-বিরোধী ছিলেন, অথবা প্রতিক্রিয়াশীলতার সমর্থক ছিলেন, এ কথা মনে করলে মহা ভুল হবে। কি ব্যষ্টি আর কি সমষ্টি-জীবনে সর্বত্রই তিনি অগ্রগামিতাকে সমর্থন করেছেন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থার সংস্কার ও রূপান্তরকে তিনি অনিবার্য বলেই স্বীকার করেছেন। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে ধর্মাধর্ম ও সামাজিক ঔচিত্যানৌচিত্য নিয়ে তাঁর যে বহুদিন ব্যাপী বিতর্ক হয়েছিল, তাতেই তিনি বলেছিলেন যে আচারের চেয়ে বিচার এবং অভ্যাসের চেয়ে অনুসন্ধান বড়। পরিণত বয়সে 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'অচলায়তনে' এবং বিভিন্ন সময়ের নানা প্রবন্ধ নিবন্ধেও তিনি যুক্তিনিষ্ঠ আধুনিকতাকেই সমর্থন করেছেন এবং অনড় রক্ষণশীলতা ও অভ্যস্ত কুসংস্কারকে তিনি প্রবলভাবে আঘাতই করেছেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃতি ও উন্নতি যতই একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছে, ততই এক এক ধাপ করে পুরাণো বিশ্বাসের বনিয়াদ শিথিল হয়ে আসছে, এটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং বিশ্বশান্তির বিঘ্নরূপে বিজ্ঞানের বহুমুখী কীর্তির ঘোরতর বিরোধী হয়েও, তিনি এই বৈজ্ঞানিক যুগ-সংস্কৃতির আলোতেই জগৎ ও জীবনের মূল্য যাচাই করার পক্ষপাতী ছিলেন। এটা হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে।

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উৎকর্ষ সম্পর্কে তাঁর যে অননুমোদন, সেটা এসেছিল তাঁর তপোবন সংস্কৃতির প্রতি আস্থা থেকে। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক ইউরোপ বিজ্ঞানের শক্তিকে যে ভাবে

বার বার বিশ্বমনকে বিয়োজিত করেছে, তাও হতবুদ্ধি করেছিল তাঁকে। তাইতেই যন্ত্র-বিজ্ঞানের অসীম প্রতাপকে তিনি নিন্দা করেছেন বার বার। তা সত্ত্বেও বিশ্বকল্যাণে বিজ্ঞানের অমোঘ শক্তিমত্তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিন্যাসের দ্বারা বিজ্ঞানকে সেই সার্বভৌম কল্যাণের পথে চালানো সম্ভব, তাকে তিনি স্বাগত করেন নি এটা অবশ্য সত্যি, আর এইখানেই তাঁর একটু স্ব-বিরোধিতা ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রগতিশীল ভূমিকাই অভিনয় করেছেন। মনোধর্মের স্বাভাবিক ঔদার্য বশে তিনি অগ্রগতির পথেই দেশের মননশীলতাকে চালিত করেছেন। তাকে প্রতিহত বা বিপরীতমুখী হতে দেন নি, এই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

= ১ =

(১৮৬১—৯১)

কলকাতা ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পৈত্রিক ভবনে ১৮৬১ সালের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখে, ১২৬৮) মঙ্গলবার রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। দেবেন্দ্রনাথের পনেরোটি সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চতুর্দশ সংখ্যক।

দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ রামমোহন রায়ের সমসাময়িক এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। তাঁরই প্রভাবে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। আদিতে এঁরা ছিলেন যশোহরের একটি সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবার। সেখান থেকে কোম্পানীর আমলে দ্বারকানাথের পিতামহ কলকাতায় আসেন এবং অর্থোপার্জন করে খ্যাতিমান হন। দ্বারকানাথ সেই খ্যাতিকে নিজ কীর্তিতে করেন সুপ্রতিষ্ঠিত। ইউরোপ গামী ভারতবাসীদের মধ্যেও তিনি রামমোহন রায়ের পরই উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে ভারতের বেসরকারী রাজদূত রূপে গ্রহণ করেছিলেন। লণ্ডনেই দ্বারকানাথের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুটা একটু রহস্যময়।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আদি ব্রাহ্ম সমাজের স্থাপয়িতা, তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক এবং ধর্ম ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট একজন নেতা রূপে তিনি বাংলা দেশে বিদ্যাসাগরের মতোই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পিতা দ্বারকানাথের অতুল ঐশ্বর্য অপব্যয় ও অবিবেচনার ফলে শুধু ক্ষয়ই পায়নি, সমৃদ্ধ ঠাকুর পরিবার তাঁর মৃত্যুর সমকালে আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেই পিতৃ-ঋণের বোঝা পরিশোধ করে আবার ঠাকুর পরিবারের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, এতে অবশ্যই তাঁর তীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়ে তিনি ষোল-আনা লিপ্ত ছিলেন না। অন্তরে তিনি লালন করতেন সুগভীর ধর্মানুরাগ ও সুমহান স্বদেশ প্রেম। বাইরে বহু কর্মে নিবিষ্ট থাকলেও, ভেতরে তাঁর এই দুটি ব্রত পালনের স্পৃহা ও আয়োজন কোন দিন হ্রাস পেত না। তাই পত্নী ও পুত্র-কন্যা

পরিবৃত্ত হয়ে, এমন কি অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও শুধু নামে নয়, কাজেও তিনি 'মহর্ষি' হতে পেরেছিলেন।

বাংলা গদ্য রচনাতেও দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। তাঁর 'আত্মজীবনী' শুধু তাঁর জীবন কাহিনী ও সাধন প্রণালীর পরিচায়ক রূপেই প্রসিদ্ধ নয়, উৎকৃষ্ট বাংলা গদ্য গ্রন্থ হিসাবেও তা বিশেষ উপভোগ্য।

পিতার এই নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক প্রতিভাই তাঁর পুত্র-কন্যাদের, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে।

দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ কবি ও দার্শনিক রূপে সমসাময়িক সমাজে সম্মানার্হ ছিলেন। তাঁর 'স্বপ্ন প্রয়াণ' কাব্য এবং 'নানা চিন্তা' প্রবন্ধ পুস্তক বাংলা ভাষায় স্থায়িত্ব লাভ করেছে। দ্বিতীয় সত্যেন্দ্রনাথ ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ান হিসাবে বেশী খ্যাত হলেও, কবি ও বিদ্বান রূপেও তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। তাঁর 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' এবং মেঘদূতের পদ্যানুবাদ ও 'বুদ্ধকথা' বই সকলেই হয়ত পড়েছেন। 'বন্দেমাতরমে'র পূর্বে 'মিলে সব ভারত সন্তান' নামক প্রসিদ্ধ স্বদেশী সঙ্গীত লিখেও তিনি একসময় জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তৃতীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনে নাট্যকার ও পরবর্তী জীবনে অনুবাদক রূপে উন্নত সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'অশ্রুমতী' ও 'সরোজিনী' নাটক, এবং 'অলীক প্রকাশ' প্রহসন প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের এবং ফরাসী ছোট গল্পের অনুবাদেও তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একাধারে সাহিত্যিক, সঙ্গীত বিশারদ ও সমাজসেবীরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন তখনকার একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবর্তন করতে গিয়ে এক সময় অনেক লোকসানও স্বীকার করেছিলেন। শেষ জীবন তিনি কাটিয়েছিলেন রাঁচিতে, নির্লিপ্ত সাহিত্য সাধনায়।

ভগিনীদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বিনী ছিলেন। কাব্যে ও উপন্যাসে তাঁর কৃতিত্ব খুব নগণ্য ছিল না। ভারতী সম্পাদিকা হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সর্ব কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ধ্যানী ও সংস্কারক পিতার এবং সাহিত্যিক ও শিল্প রসিক ভাই-বোনেদের প্রভাবে অল্প বয়স থেকেই সাহিত্য ও কলা-চর্চার এবং অধ্যয়ন ও মননের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর ভ্রাতৃ-বধূদের মধ্যে

সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীও রুচি ও সংস্কৃতির ব্যাপারে ছিলেন যথেষ্ট প্রগতি সম্পন্না। জ্ঞানদানন্দিনী বাংলা দেশে মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদের যে নূতন ফ্যাসন প্রবর্তন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাই সকলের আদর্শ হয়েছে। পরিবারস্থ বালক-বালিকাদের সাহিত্য সেবায় অনুপ্রাণিত করবার জন্যে তিনি 'বালক' নামে একটি পত্রিকাও বের করতেন। সঙ্গীতে সুনিপুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পত্নী কাদম্বরীকে গান-বাজনা শিখিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারে মেয়েদের মধ্যে গানের চর্চা প্রধাণত এঁর হাত দিয়েই প্রচার পায়। স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্যে পথে বেরুনোতেও এঁরাই ছিলেন অগ্রণী।

রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন এঁদের সাহচর্যে। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি এঁদের নানা আন্দোলন আয়োজনে সহযোগিতা করতেন। তাঁর ভাবী জীবনের ভিত্তি তৈরী হয়েছিল এতেই।

কবিকে শিক্ষার জন্যে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি করা হয় আট বছর বয়সে। কয়েক মাস পরে সেখান থেকে তিনি যান কলকাতা নর্ম্যাল স্কুলে। তারপর আবার তাঁকে ভর্তি করা হয় বেঙ্গল এ্যাকাডেমিতে। কোন জায়গাতেই তিনি ভালো ছেলেটি হয়ে নিবিষ্ট মনে লেখা-পড়া করতে পারলেন না। পিতার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন যে ভাবুকতার প্রেরণা এবং দাদাদের ও ভ্রাতৃ-বধূদের প্রভাবে তাঁর মধ্যে এসেছিল যে শিল্পানুরাগ ও সাহিত্য-প্রীতি, স্কুলের বাঁধা-বরাদ্দ পাঠ্য ও পাঠন-পদ্ধতির সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর পথে তা করল প্রবল বাধার সৃষ্টি। তিনি স্কুল পালিয়ে বেড়াতেন এবং ঠাকুর বাড়ীর প্রকাণ্ড প্রাসাদের কোন এক কোণায় লুকিয়ে বসে হয় কবিতা লিখতেন, নয় আকাশ ও পৃথিবীর বিচিত্র গতি লক্ষ্য করতেন।

বাড়ীতে তাঁর শিক্ষার জন্যে গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁরা আসতেন নিয়মিত সময়ে, নিয়মিত পাঠ্য পড়াতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হল না। শিক্ষার আসল যা উদ্দেশ্য, চিন্তা ও কল্পনার বিস্তার, তা তাঁর হয়ে চলল পারিবারিক আবহাওয়া থেকেই, বরং পাঠ্য তালিকার শক্ত বাঁধন পায়ে না থাকায় সহজ আনন্দেই সেটা হতে লাগল। কিন্তু যাঁর দাদারা নাম করেছিলেন এক-একটি দিগ্‌গজ পণ্ডিত রূপে, তাঁদেরই ছোট ভাইয়ের এইটুকু শিক্ষাকে কে পর্যাপ্ত বলে মনে করবেন? দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে

বেড়ালেন। কখনো ডালহাউসি পাহাড়ে, কখনো অমৃতসরে, তিনি ঘুরতে লাগলেন পিতার সঙ্গে সঙ্গে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও জ্যোতিষে প্রাথমিক শিক্ষা পেতে লাগলেন। অবসর সময়ে পিতার কাছ থেকে মুখে-মুখে উপনিষদের তত্ত্বগুলির সরল ব্যাখ্যা শুনতে লাগলেন। আর শিখতে লাগলেন সকাল-বিকেল পালোয়ানের কাছে কুস্তি। এই সময়ের অভিজ্ঞতা ও ভ্রমণের কাহিনী কবির স্ব-লিখিত 'জীবন স্মৃতি' বইয়ে স্থান পেয়েছে।

কিন্তু অল্পদিন পরেই কলকাতায় ফিরে তাঁকে সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হতে হল। এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে সুরু হল তাঁর সাহিত্য-সাধনা। 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে একখানি নাটক এবং সেক্সপীয়র কৃত 'ম্যাকবেথে'র বঙ্গানুবাদ তাঁর প্রথম রচনা। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি গুলির আজ আর সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ' তত্ত্ববোধিনীতে এবং 'হিন্দু মেলার উপহার' দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় যখন বের হয়, তখন তাঁর বয়স বছর চোদ্দ। এই সময় তাঁর জননী সারদা দেবীর মৃত্যু হয়।

অনেকগুলি সন্তানের জননী এবং প্রকাণ্ড সংসারের গৃহিণী সারদাদেবী ভাব-প্রবণ কনিষ্ঠ পুত্রটির ওপর খুব বেশী নজর রাখতে পারতেন না। শিশু রবির তদারকের বেশীর ভাগ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ভৃত্যদের হাতে। এই ভৃত্যেরা ভালো-মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ঘরে আটকে রেখে কি ভাবে নিজেরা আপন আপন ধান্দায় ঘুরত, তার কৌতুকাবহ অনেক কাহিনী স্থান পেয়েছে 'জীবন-স্মৃতি'তে। তাঁর এই বয়সের অধ্যায়টিকে কবি ভৃত্য রাজকতন্ত্র নামে অভিহিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে বাল্য থেকেই মায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল অল্প। মাতৃ-বিয়োগ তাই তাঁর মনে খুব বেশী ছায়াপাত করতে পারেনি।

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে দাদাদের ও বৌদিদের সাহচর্য তাঁর মনে কি ভাবে শিল্পানুরাগ সৃষ্টি করছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেটা দ্রুত বিকশিত হতে লাগল। 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক তখনকার একটি মাসিক পত্রে তিনি 'বনফুল' নামে আট-সর্গে বিভক্ত একখানি কাব্য-কাহিনী প্রকাশ করেন। দীর্ঘ রচনা হিসাবে এটিই তাঁর প্রথম প্রয়াস। হিন্দু মেলার অনুষ্ঠানে এই সময় তিনি দিল্লীর দরবারকে বিদ্রূপ করে একটি দেশাত্মবোধক কবিতা পড়েন এবং প্রকাশ্যে তাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে নামেন 'অলীক প্রকাশে'র অভিনয়ে। সভা-সমিতিতে যোগদান ও অভিনয়ে অবতরণ এই তাঁর প্রথম। দ্বিজেন্দ্রনাথের

সম্পাদনায় প্রায় এই সময় থেকেই 'ভারতী' পত্রিকা বেরুতে থাকে। ষোল বছরের বালক রবীন্দ্রনাথও এর একজন লেখক হলেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তিনি একাদিক্রমে 'করুণা' ও 'ভিখারিণী' এই দু-খানি উপন্যাস, 'কবি কাহিনী' আখ্যান কাব্য, কতকগুলি খণ্ড কবিতা এবং 'দান্তে ও বিয়াট্রিস,' 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িণীগণ,' 'এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি ও তাহাদের সাহিত্য' প্রবন্ধ লেখেন। এ ছাড়া বিদ্যাপতির অনুকরণে ব্রজবুলিতে লেখা কতকগুলি রাধা-কৃষ্ণ পদাবলী ভানুসিংহের ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। বালক কবি চ্যাটারটনের অনুকরণে অপ্রচলিত প্রাচীন ভাষায় কবিতা লেখার ঝোঁক হয়েছিল বালক রবীন্দ্রনাথের। ভানুসিংহ তারই ফল। তখনকার সমালোচক মহল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের (ভানু-সিংহের) এই কৌশলটুকু ধরতে পারেন নি।

সতেরো বৎসর বয়সে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে গেলেন আমেদাবাদে। কিছুদিন এখানে ঘরে পড়াশুনা চলল। সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং জনৈকা পার্সী মহিলা তাঁকে ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজী আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে লাগলেন। উদ্দেশ্য তাঁকে ইউরোপ পাঠানো। ১৮৭৮ সালে তিনি গেলেন লণ্ডনে। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সেখানে বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এলেন তাঁদের কাছে। প্রথমে তাঁকে ব্রাইটনের একটি স্কুলে ভর্তি করা হল। সেখান থেকে তিনি গেলেন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে। বিখ্যাত লর্ড মোর্লির ভাই হেনরি মোর্লির কাছে তিনি পড়তে লাগলেন ইংরাজী সাহিত্য। এ ছাড়া শিখতে লাগলেন ইউরোপীয় সঙ্গীত, নৃত্য-কলা এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও কমন্স সভায় যাওয়া-আসা করতে লাগলেন মধ্যে মধ্যে।

তখনকার শান্তিপূর্ণ ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের চিত্র সেই সময়ের লেখা 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' বইয়ে কবি চমৎকার এঁকেছেন। এই পত্রগুলি ধারাবাহিক ভাবে বের হয় 'ভারতী'তে। 'ভগ্ন হৃদয়' নাট্যকাব্যও তাঁর ইংলণ্ড প্রবাসের রচনা। কিন্তু ইংলণ্ডে তাঁর বেশীদিন থাকা হল না। দেড় বছরের মধ্যেই তিনি এলেন দেশে ফিরে এবং এখন থেকে সাহিত্য চর্চাকেই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলেন।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্য, 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' কবিতাসংগ্রহ, 'রুদ্রচণ্ড' নক, ট 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস এবং বহু প্রবন্ধ তিনি এই সময়ে লেখেন।

ঠাকুর বাড়ীর ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় হয় এবং তাতে স্বয়ং কবি বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মেডিক্যাল কলেজে অনুষ্ঠিত সভায় এই সময় তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতাও করেন। ইতিমধ্যে আর একবার ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে তাঁর বিলাত যাওয়ার কথা হয়। বন্ধু আশুতোষ চৌধুরী এবং ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীর সঙ্গে তিনি যাত্রাও করেন। কিন্তু মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়েই ফিরে আসেন বাংলায় এবং চন্দননগরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে বাস করতে আরম্ভ করে দেন। বলা বাহুল্য সব রকম পড়ার মতো আইন পড়াকেও তিনি ইচ্ছা করেই ফাঁকি দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ধাত জানতেন, তাই তিনি তাঁর এই পলায়নকে সস্নেহ প্রশ্রয়ে অনুমোদন করেছিলেন।

পনেরো থেকে তেইশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ওপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। এই প্রভাব কবির স্বাভাবিক প্রতিভাকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়ে গান লেখাতেন, সেই গানে নিজে সুর যোজনা করতেন। এ ছাড়া সাহিত্য সাধনাতেও তাঁকে উৎসাহ ও সহযোগিতা দিতেন নানা ভাবে।

নাট্যাভিনয়ে, গীত চর্চায়, সাহিত্য রচনায়, সর্বভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন এই সময়ে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদ। উভয়ে সারস্বত সমাজ নামে একটি সাহিত্যসঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন এবং আরো বহুবিধ ব্যাপারে ছিলেন একে অন্যের একান্ত সহযোগী। এই মধুর সম্পর্কের ওপর ছেদ পড়ল জ্যোতিরিন্দ্র পত্নী কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে। তারপর থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আর বাইরের কর্মক্ষেত্রে পাওয়া গেল না কোনদিন। কৈশোর ও যৌবনের প্রথমাংশে সস্ত্রীক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্য কবির জীবন গঠনে প্রচুর আনুকূল্য করেছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে ও অন্যান্য কয়েকটি রচনায় কবি কৃতজ্ঞ চিত্তে এই সাহচর্যের কথা স্মরণ করেছেন। ঐ সময়ের কয়েকখানি বইও তিনি উৎসর্গ করেছেন উভয়কে।

একুশ বৎসর বয়সে কবির ভাব-জীবনে সহসা একটি পরিবর্তন আসে। কলকাতা যাদুঘরের নিকটবর্তী সদর স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে থাকা কালে একদিন সকাল বেলা তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবী ও তার বিচিত্র জীবন-লীলা একটি নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিল। এই নূতন দৃষ্টির প্রেরণায় তিনি লিখলেন তাঁর প্রসিদ্ধ 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' কবিতা :

না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি!

'প্রভাত উৎসব' কবিতাতেও এই একই সুরের অনুরণণ শোনা যাবে। এই দুটি কবিতা দিয়ে সুরু হল তাঁর নূতন কবিতার বই 'প্রভাত সঙ্গীত'। এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার এইখান থেকেই সূচনা, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' বইয়েরও উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা কমলা দেবীর বিবাহ সভায় রমেশচন্দ্র বঙ্কিমের গলায় একটি মালা পরিয়ে দিলে, বঙ্কিম সেই মালা নিজের গলা থেকে নিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথের গলায় এবং তাঁর সদ্য প্রকাশিত সন্ধ্যা সঙ্গীতের অশেষ সুখ্যাতি করেন।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী দ্বিজেন্দ্রনাথের বন্ধু হিসাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন। ঠাকুর ভ্রাতৃবৃন্দ এবং তাঁদের বধূরা, বিশেষ করে কাদম্বরী দেবী ছিলেন তাঁর রচনার একান্ত অনুরাগী। কাদম্বরীর মৃত্যুতে তাঁর হাতে বোনা একখানি কার্পেটের আসন স্মরণ করেই চক্রবর্তী কবি লিখেছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ 'সাধের আসন' কবিতা। বিহারীলালের এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তরুণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে। আকর্ষণ থেকেই আসে অনুরাগ এবং রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'বাল্মীকি প্রতিভা'য়, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' এবং আরো কোন কোন রচনায় বিহারীলালের ভাব-ভাষা ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রচুর অনুকৃতি দেখা যায়। পরবর্তীকালে কবি এজন্যে বিহারী-লালকে গুরু বলেই স্বীকৃতির সম্মান দিয়েছিলেন।

'প্রভাত সঙ্গীতে'র পর তিনি লেখেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্য এবং 'ছবি ও গান' কবিতা সংগ্রহ। এছাড়া সেকেলে রাজনৈতিক আন্দোলনের আড়ম্বর ও আবেদন নিবেদনের অসারতা উদ্ঘাটিত করে ভারতীর পৃষ্ঠায় কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। 'কড়ি ও কোমল' এবং 'নলিনী' নাটিকা এর অল্প পরের রচনা।

বাইশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল। তাঁর পত্নীর নাম

ভবতারিণী, ঠাকুর পরিবারে এসে নাম হয় মৃণালিনী। ইনি ঠাকুর এস্টেটের তত্ত্বাবধায়ক বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা। মৃণালিনী ঠাকুর পরিবারের বধূ হবার মতো যথেষ্ট শিক্ষিতা এবং রুচিসম্পন্না ছিলেন না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে যোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

১৮৮৩ সালে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক মনোনীত হন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পর্ব শেষ করে 'প্রচার' আরম্ভ করেছেন। এই পত্রিকায় শশধর তর্কচূড়ামণি ও চন্দ্রনাথ বসুর সহযোগিতায় তিনি তখন সুরু করেছেন নব্য হিন্দু-অভ্যুত্থানের আন্দোলন। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে বের করার সেই প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের চোখে অসার্থক মনে হয়। আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি রূপে এই আন্দোলনে ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত আক্রমণের প্রতিবাদে তিনি লেখনী ধরলেন। অনেকদিন চলল এই বিতর্ক। 'প্রচার' ও 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠা ভরে উঠতে লাগল সেই সমস্ত বাদ-বিবাদ ও আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণে। এই বিতর্কে কবি গ্রহণ করেন বিশুদ্ধ যুক্তিবাদীর ভূমিকা। যে-কোন অভ্যাসদুষ্ট অনাচারকে বিজ্ঞানের দোহাইয়ে জলাচরণীয় করা তিনি আদৌ সমর্থন করেন নি। বলা বাহুল্য শেষ পর্যন্ত বিতর্কের মীমাংসা হল না, কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্র সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হল।

আমরা ইতিপূর্বে জ্ঞানদানন্দিনীর 'বালক' পত্রিকার নামোল্লেখ করেছি। এই পত্রিকা বেরুতে আরম্ভ করে এই সময় থেকে। রবীন্দ্রনাথ এতে তাঁর 'রাজর্ষি' ও 'মুকুট' লিখতে সুরু করেন। বিভিন্ন বিষয়ে বহু প্রবন্ধ এবং সমাজ-তত্ত্ব সম্পর্কীয় কতকগুলি পত্রও এতে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া বন্ধু শ্রীশ মজুমদারের সঙ্গে একত্রে বৈষ্ণব কবিতার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেন তিনি এবং স্বরচিত গানগুলি সংগ্রহ করে 'রবিচ্ছায়া' বইয়ে গ্রথিত করেন। তাঁর সে সময়ের প্রবন্ধগুলিও সংগৃহীত হয় 'আলোচনা' নামক পুস্তকে। এই বছর জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলকাতায়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নৌরজী। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে উদ্বোধন সঙ্গীত রচনা করেন 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' এবং স্বকণ্ঠে কংগ্রেস মঞ্চে সেটি সুরারোপিত করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা বেলার জন্ম এই সময়।

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি লিখলেন 'মানসী' কাব্য। তাঁর নিজের মতে

তাঁর কবি-জীবনের প্রকৃত সূচনা এইখান থেকে। ইতিমধ্যে কিছুদিন তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বোম্বাইয়ে কাটিয়ে এসেছিলেন। সেই প্রবাসের সময়ই তিনি লেখেন মানসীর কবিতাগুলি। এ ছাড়া সেকেলে দাদামশায় ও নব্য নাতির মধ্যে যুগ-ধর্ম নিয়ে তর্ক-বিতর্ক মূলক কল্পিত চিঠির একটি সংগ্রহ লেখেন, যার নাম 'চিঠিপত্র'। 'সমালোচনা' বইও এই সময়ের। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় কবি সাহিত্য সমালোচনা সুরু করেছিলেন অতি অল্প বয়সে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা মেঘনাদবধ কাব্যের বিরুদ্ধে। এটি লিখেছিলেন তিনি, যখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল-সতেরো। পরে আরো কতকগুলি স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রকাশিত হয়। সবগুলি একত্র গ্রথিত হল আলোচ্য বইয়ে। এর পরবর্তী তিন বৎসরে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য এবং 'রাজা ও রাণী' আর 'বিসর্জন' নাট্যকাব্য। এগুলি লিখিত হয়েছিল যথাক্রমে তাঁর সাতাশ, আঠাশ ও ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে। 'মায়ার খেলা' তিনি লিখেছিলেন শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে, জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী প্রতিষ্ঠিত 'সখী সমিতি'র সাহায্যার্থে অভিনীত হবার জন্যে। 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' ঠাকুরবাড়ীর ঘরোয়া মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। প্রথমটিতে রাজা বিক্রমের ভূমিকায় এবং দ্বিতীয়টিতে রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন স্বয়ং কবি।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাতে কবিকে ঐকান্তিক কাব্য-সাধনার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে হয় বাস্তব কর্মক্ষেত্রে। দেবেন্দ্রনাথ এই সময় করলেন শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু এবং রবীন্দ্রনাথকে দিলেন ঠাকুর এষ্টেটের সর্বাঙ্গীন তদারকের ভার। বলাবাহুল্য এ থেকেই হল তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সূচনা, আর এর দ্বারাই হল তাঁর দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ। ইতিমধ্যে অল্প দিনের জন্যে তাঁর দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রার সুবিধা হয়ে গেল। মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ও লোকেন পালিতের সঙ্গে একযোগে তিনি রওনা হলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালীর নানাস্থান ঘুরে তিন মাস পরে তিনি দেশে ফিরলেন। ঠাকুর এষ্টেটের ভার নিয়ে এবার তিনি শিলাইদহে তাঁর আস্তানা স্থাপন করলেন। এই সময়ের ভেতর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার জন্ম হয়েছে।

= ২ =

(১৮৯১—১৯০৬)

প্রথম তিরিশ বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবী জীবনের লক্ষ্য পুরোপুরি স্থির করে নিতে পেরেছিলেন। স্কুল-কলেজের পরীক্ষা পাশ যেমন তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি, তেমনি কোন নির্দিষ্ট বৃত্তির অনুসরণ করে জীবিকার্জনে মনোযোগী হওয়াও তাঁর ধাতে পোষাল না। দু-দু-বার বিলাত গিয়েও তিনি অভিভাবকদের প্রত্যাশা ব্যর্থ করে দিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে স্বাধীন ভাবে সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সেবার ভেতর দিয়েই তাঁকে সাফল্যের পথ খুঁজতে হবে।

এই বয়সের মধ্যে সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগে তিনি স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির যে পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতেই প্রমাণিত হয় যে বাংলা সাহিত্যে তিনি যুগান্তর আনবেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ তদানীন্তন কবি ও সাহিত্যিকরা একবাক্যে তাঁর প্রতিভা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে যে তাঁর বাদানুবাদ হয়েছিল, অথবা অক্ষয়চন্দ্র যে তাঁকে উদ্দেশ করে 'ভাই হাততালি' লিখেছিলেন, তাতেও একথাই প্রমাণিত হয় যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সত্যকার শক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তা না হলে তখনকার সাহিত্যাধিপতি হয়ে তাঁরা কখনই তাঁর মতো তরুণের বিরুদ্ধে লেখনী ধরতেন না!

কৈশোর কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভার সর্বোতোমুখিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যের আসরে যত এগিয়ে আসতে লাগলেন, ততই নূতন নূতন পথে তাঁর সৃষ্টির ধারা প্রবাহিত হয়ে চলল। দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে তিনি জমিদারির ভার নেন এবং শিলাইদহে তাঁর স্থায়ী বাসস্থান ঠিক করেন, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। শিলাইদহের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বসে তিনি স্বয়দের দৃষ্টিতে পল্লী-বাংলার জীবন-ধারা লক্ষ্য করলেন। গ্রাম্য জীবনের নিভৃত

অবকাশে সুখে-দুঃখে বয়ে চলেছে যে জীবন, তা থেকে বিষয় আহরণ করে তিনি এই সময়ে সুরু করলেন ছোটগল্প লেখা। তদানীন্তন সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'তে এই সমস্ত গল্প প্রকাশিত হতে লাগল। দ্বিতীয় দফা ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী' বইটিও তাঁর বেরুল এই সময়। শিলাইদহ থেকেই তিনি সুরু করেন 'সাধনা' মাসিকপত্র সম্পাদনা। এতে নিজে তিনি কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ অজস্র ধারায় লিখতে থাকেন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথেরও সাহিত্য-সেবা সুরু হয় 'সাধনা'য়। এ ছাড়া গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্র দুই বিখ্যাত শিল্পী এবং সঙ্গীতজ্ঞ দিনেন্দ্রও এখন থেকে তাঁর কলা চর্চার দোসর হন। এঁরাও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র।

'চিত্রাঙ্গদা' তাঁর এই সময়ের লেখা। এই নাট্যকাব্যটি চিত্রিত করেন অবনীন্দ্রনাথ এবং কবিও বইটি উৎসর্গ করেন তাঁকেই। বাংলা ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন আশ্রমের উপাসনা মন্দির স্থাপিত হয় এবং ঐ বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে কবি কিছুদিন কাটিয়ে যান শান্তিনিকেতনে। বারো বৎসর বয়সে হিমালয় থেকে ফিরে একবার কিছুদিনের জন্যে তিনি শান্তিনিকেতন বেড়িয়ে গিয়েছিলেন পিতার সঙ্গে। এইবার তাঁর দ্বিতীয় আগমন। যে শান্তিনিকেতন তাঁর পরবর্তী জীবনের অনন্য কর্মক্ষেত্র হয়েছিল, এই থেকেই সুরু হয় তার সঙ্গে তাঁর সংস্রব।

'সাধনা'র পৃষ্ঠায় কবি এই সময় যে প্রবন্ধগুলি লিখছিলেন, তাতে সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়। গতানুগতিক ব্যবস্থার সংশোধন ও যুগোচিত আদর্শে তাদের সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর আগে গঠনমূলক আন্দোলন দেশে বিশেষ কিছু হয়নি। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান সমর্থন করে, তিনি দেখান যে বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার বাহন থাকায়, স্বাভাবিক নিয়মেই দেশের মনোবৃত্তি জাতীয়তা-বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' এবং 'ইংরাজের আতঙ্ক' প্রবন্ধে তিনি শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করে উভয়ের পক্ষে কল্যাণের পথ কি, তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। শেষোক্ত প্রবন্ধটি তিনি পড়েন চৈতন্য লাইব্রেরীতে এবং বঙ্কিমচন্দ্র সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সম্পাদক রূপে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, জাতীয় পরিষদ গঠন, স্বদেশী দ্রব্যক্রয়, স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন, আরো নানা সময়োচিত প্রসঙ্গের অবতারণা করে দেশকে সজাগ

করে তুলতে চেষ্টা করেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর রচনায় যে সংস্কারকের ও উদারবুদ্ধি সম্পন্ন বিশ্বপ্রেমিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, প্রথম যৌবনে তার সূচনা হয়েছিল বাংলা ও বাঙালীর সংস্কার নিয়ে। 'ভারতী' ও 'সাধনা' এই দিক থেকে ছিল তাঁর প্রচার-বেদীস্বরূপ।

কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতির সাম্প্রতিক আলোচনায় মনোনিবেশ করলেও, নিছক সাহিত্যের প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না। শিলাইদহের মনোরম গ্রাম্য আবেষ্টনীর ভেতর তাঁর কবি-প্রাণ ভাবে ও অনুভূতিতে অহরহ উদ্বেলিত হয়েছে। 'সোনার তরী'র কবিতাগুলিতে সেই ভাবনাভূতির বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। এই কবিতাগুলি এবং প্রসিদ্ধ 'বিদায় অভিশাপ' তিনি এখানেই লেখেন। 'পঞ্চভূতের ডায়েরী' নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক রচনাটিরও জন্ম শিলাইদহে। জমিদারী পরিদর্শনের জন্যে তাঁকে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হত, কখনও বা যেতে হত উড়িষ্যায় এষ্টেট দেখতে। সেই পরিভ্রমণের পথে তিনি লিখেছেন হয় কবিতা, নয় গল্প, নয় প্রবন্ধ। এক হিসাবে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সই তাঁর সব চেয়ে ফলপ্রসূ বয়স। তাঁর অনেক প্রসিদ্ধ লেখারই জন্ম এই সময়ে। এ ছাড়া দেশের প্রত্যক্ষ বহু আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি এই সময় থেকে আস্তে আস্তে জড়িত হচ্ছিলেন।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ এই সময় স্বদেশী কাপড়ের কারবার সুরু করেন। কলকাতায় স্থাপিত হয় একটি কাপড়ের দোকান এবং কুষ্টিয়ায় একটি চটকল। উভয় স্থানেই কবি তাঁদের সঙ্গে ব্যবসায়িক অংশীদার রূপে যোগদান করেন।

তাঁর এই সময়ের কর্মব্যস্ততা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। জমিদারি চালাচ্ছেন, ব্যবসা চালাচ্ছেন, সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদন করছেন, সভা-সমিতিতে যোগদান করে রাজনীতি ও সমাজ-উন্নয়ন সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করছেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছেলে ভুলানো-ছড়া সংগ্রহ করছেন, আবার তারই সঙ্গে কবিতা-গল্প রচনা করছেন, সাহিত্য সমালোচনা করছেন! জগদীশচন্দ্র বসু দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে বোটে মাঝে মাঝে আনন্দময় মুহূর্ত যাপন করছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা পৃথক হয়ে যাওয়ায়, ১৮৯৯ সালে ঠাকুর এষ্টেট ভাগ হয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথের অংশ থাকে রবীন্দ্রনাথের তদারকে। এই

বৃহৎ সাংসারিক ভাঙাগড়া রবীন্দ্রনাথকে সাময়িক ভাবে কিছুটা নাড়া দিলেও, তাঁর মানসিক স্বস্তির ছন্দটি এতে ব্যাহত হল না। সাহিত্যের প্রবাহ তাঁর অব্যাহত রইল। 'চিত্রা' ও 'চৈতালী' কাব্য দু-খানির এবং 'নদী' নামক দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কবিতাটির রচনা এই বৎসর সম্পন্ন হয়। যে 'জীবন দেবতা' কবিতাটি অনেকের মতে রবীন্দ্র-কাব্যের মূল-সূত্র স্বরূপ, তারও উদ্ভব এই সময়ে। উড়িষ্যা ভ্রমণের পথে এক ফাঁকে তিনি লেখেন 'মালিনী' কাব্যনাট্যটি। তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী এবার তাঁর সংগৃহীত কাব্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ করলেন। কবি এই সংস্করণের জন্যে তাঁর সমুদয় মুদ্রিত রচনার পাঠ সংস্কার করে দেন। এর অল্প পরে তিনি লেখেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' রঙ্গনাট্য এবং তার অভিনয়ে স্বয়ং কেদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এ বছর নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বাংলায় পরিচালিত হওয়ার অনুকূলে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তখনকার ইংরেজী-নবীশদের মত বদলাতে না পেরে, বিরক্ত হয়ে তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। এই সময় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু লণ্ডন রয়েল সোসাইটিতে তাঁর গবেষণা সমূহের পরিচয় দিয়ে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, তাঁর বিলাত যাত্রায় সহায়তাও করেছিলেন তিনি যথেষ্ট। বন্ধুর এই সাফল্যে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং তাঁর উদ্দেশে অপূর্ব একটি কবিতা রচনা করলেন। 'গান্ধারীর আবেদন', 'নরকবাস', 'সতী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকবিতাগুলিও লিখলেন তিনি এই অবকাশে। ১৮৯৮ সালে গভর্ণমেণ্ট যে নূতন রাজদ্রোহ আইন প্রবর্তন করেন, টাউন হলের সভায় 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে কবি জনসাধারণের সেই ন্যায়সঙ্গত নাগরিক অধিকার সঙ্কুচন আইনের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে বালগঙ্গাধর তিলকের বে-আইনী গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে জানালেন তীব্র প্রতিবাদ। তিলকের মামলা চালানোর উদ্দেশ্যে একটি অর্থ-ভাণ্ডার গঠন করা হয় এবং কবি স্বয়ং তার জন্যে টাকা সংগ্রহে অগ্রণী হন।

পরের বৎসর কলকাতায় প্লেগ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করে দিলেন, যাতে এখানেও বোম্বাইয়ের মতো জনসাধারণের কষ্ট ও অসুবিধার প্রতি ঔদাসীন্য না দেখানো হয়। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে

একত্রে তিনি রোগাক্রান্তদের সাহায্যে অর্থ-ভাণ্ডার গঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। প্রাদেশিক সম্মেলনের ঢাকা অধিবেশনে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর যে অভিভাষণ দেন, কবি বাংলায় তার সারমর্ম জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেন। প্রসঙ্গক্রমে দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে জমিদারবর্গের অসহযোগিতায় তিনি তীব্র নিন্দা করেন, স্বয়ং জমিদার হয়েও। বলেন্দ্রনাথদের কারবার ইতিমধ্যে কাহিল হয়ে এল। চটের কারবার কবি বন্ধ করে দিলেন এবং সমস্ত লোকসানের দায়িত্ব নিলেন নিজের কাঁধে। তাঁর স্নেহভাজন বলেন্দ্রনাথের এই বছরই মৃত্যু হয় এবং সেই শোক কবিকে প্রবলভাবে আঘাত করে।

'সাধনা' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এই সময় কিছুদিনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদন ভার নেন। তারপর 'ভারতী'র দায়িত্ব যায় স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবীর হাতে। ভারত ইতিহাসের সুবিদিত বীরত্ব ও মহত্ত্বের উপাখ্যানগুলি নিয়ে এই সময় তিনি লেখেন 'কথা'র প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি। 'ক্ষণিকা'রও রচনা এই সময়ে। শিলাইদহের কুঠীবাড়ীতে বসে কবি মাত্র দু দিনে 'ভারতী'র জন্যে 'চিরকুমার সভা' বইটি লেখেন। প্রথমে তা ছিল একটি রঙ্গ-উপন্যাস, পরে কবি কাহিনীটি নাটকে রূপান্তরিত করেন। ঠাকুর পরিবারের প্রিয়বন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাভাজন কবি বিহারীলালের জ্যেষ্ঠপুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে এই বৎসর তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার বিবাহ হয়। এই বৎসরই ৭ই পৌষ উপলক্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবি প্রথম উপাসনা-বেদীতে আচার্যের কাজ করেন।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ক্রমেই তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছিল। দেবেন্দ্রনাথের আদর্শ, কৈশোরে তাঁর কাছে পাওয়া উপনিষদের উপদেশ, রবীন্দ্রনাথের মনে প্রাচ্য সংস্কৃতি ও জীবন-নীতি সম্বন্ধে যে সুগভীর শ্রদ্ধা সঞ্চার করেছিল, তা-ই তাকে ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনের প্রতি আকৃষ্ট করে। ১৯০১ সালে জমিদারির ভার পরিত্যাগ করে তিনি সপরিবারে চলে আসেন শান্তিনিকেতনে এবং পিতার সম্মতিক্রমে এখানে প্রাচ্য আদর্শে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কবি স্বয়ং নেন ছাত্রদের শিক্ষার ভার। তিনি তাদের সঙ্গে খেলাধূলো ও মেলামেশা করতেন এবং সহজ আনন্দে যাতে তারা হাসি-খুশির ভেতর দিয়ে জ্ঞানলাভ

করতে পারে, যাতে তাদের কল্পনা ও সহজ অনুভূতিগুলি পাঠ্যপুস্তকের চাপে বিকৃত না হয়, তার জন্যে তাঁর সমস্ত বুদ্ধি ও মনীষা একযোগে নিয়োগ করতেন।

এই কাজে তিনি সহযোগী পেলেন জগদানন্দ রায়, উইলিয়াম লরেন্স (স্বামী অণিমানন্দ) এবং পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণবকে। পরে এঁদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং সতীশচন্দ্র রায়। বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় অভিভূত বাঙালীর চোখে নূতন একটি আদর্শের পথ খুলে দিল। কতকগুলি বিশিষ্ট পরিবারের ছেলে এল এখানে শিক্ষালাভ করতে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় চালানোর ব্যয়ভার নির্বাহ করা খুব সহজ হল না। রবীন্দ্রনাথকে একক ভাবে এই ব্যয় বহন করতে প্রচুর বেগ পেতে হল। তিনি পুরীর বাড়ী বিক্রী করে ফেললেন এবং তার স্ত্রীও সানন্দে নিজের অলঙ্কারগুলি একে একে বিক্রী করে স্বামীকে এই সঙ্কটে সহায়তা করলেন। দুর্ভাগ্যবশত ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে আকস্মিক পীড়ায় কবি-পত্নী লোকান্তরিতা হলেন এবং এখানেই সুরু হল রবীন্দ্র-জীবনের নূতন অধ্যায়।

মৃণালিনী দেবী ঠাকুর পরিবারে এসেছিলেন অত্যন্ত অল্প বয়সে। পল্লীগ্রামের সরলচিত্ত বালিকা তিনি এই অভিজাত পরিবারের বধূ হয়ে এবং এত বড় প্রতিভার অধিকারী কবির যোগ্য পত্নী হয়ে, নিজের অসাধারণতারই পরিচয় দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের কর্মব্যস্ত বাইরের জীবনের সঙ্গেই দেশের পরিচয়। তার পারিবারিক জীবনের খবর অনেকের জানা নেই। তাই কবির দাম্পত্য জীবন ও তাঁর গার্হস্থ্য রূপ অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু কবি যে স্বামী ও পিতা রূপে ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল ও কর্তব্য পরায়ণ, অত্যন্ত সুবিবেচক ও একনিষ্ঠতা সম্পন্ন, তা জানা যায় ঠাকুর পরিবারের বধূ হেমলতা দেবী লিখিত 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' নামক রচনাটিতে। এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, কি ভাবে কবি একদা তার পুত্র-কন্যাদের সস্নেহ যত্নে মানুষ করেছেন, কি ভাবে পীড়িতা পত্নীকে অক্লান্ত মমতায় সেবা করেছেন, বাইরের শত রকম কাজের মধ্যেও সংসারের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি জিনিষে কি ভাবে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। কবি-পত্নীর অনেক বৈশিষ্ট্যের কথাও জানা যায় এই প্রবন্ধটিতে। জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের মতো গুণী,

জ্ঞানী ও ধনীর পত্নী হয়েও কি ভাবে তিনি রকমারি দুঃখ-কষ্ট ও কৃচ্ছ তা হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েছেন। পত্নীবিয়োগে ব্যথিত কবি এই সময় তাঁর উদ্দেশে লেখেন তাঁর 'স্মরণ' কাব্য, আর মাতৃহীন শিশু শমীন্দ্রকে ভোলাবার জন্তে লেখেন প্রসিদ্ধ 'শিশু' কাব্য।

কিন্তু এইখানেই তাঁর দুর্ভাগ্যের পালা শেষ হল না। তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা মাতার মৃত্যুর ছয় মাস পরে মারা যান। রেণুকার বিবাহ হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামে এক তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে। পত্নীশোকে অধীর কবি কন্যাবিয়োগে একেবারে ভেঙে পড়লেন। নাবালক ছেলে শমীন্দ্র ও কন্যা মীরার লালন-পালন নিয়ে মহা চিন্তায় পড়তে হল তাঁকে। কি করে তিনি একাধারে মা ও বাবা হয়ে এঁদের মানুষ করেছেন, সেই সঙ্গে বহুমুখী কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেকটি আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, সে কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়!

১৯০১ সালে শ্রীশ মজুমদারের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শন' নব পর্যায় প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এর পৃষ্ঠায় তিনি ধারাবাহিক ভাবে লেখেন 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। এ ছাড়া এ সময় প্রকাশিত হয় তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্য। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' আবার বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ এতে লেখকরূপে যোগদান করেন। এখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে সুরু হয় বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব এবং বিশিষ্ট গুণীদের দ্বারা সে নেতৃত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়।

১৯০৪ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমে হঠাৎ বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দেয় এবং ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় সাময়িক ভাবে শিলাইদহে স্থানান্তরিত করতে হয়। এই সময় অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী সম্পাদন করে নয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। তাঁর নাটক, উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধগুলিও সংগৃহীত গ্রন্থাবলীরূপে 'হিতবাদী' কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্তে নানা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকও কবি লেখেন অনেকগুলি: ইংরেজী সোপান, অনুবাদ চর্চা, সংস্কৃত পাঠ ইত্যাদি। এইগুলির সম্মিলিত আয়ে শান্তিনিকেতনের আর্থিক অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল

হয়। বলে রাখা দরকার যে তখনো শান্তিনিকেতনে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার জন্যে ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু নেওয়া হত না।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক জীবন আস্তে আস্তে সুরু হয় এই সময় থেকে। ধীরে ধীরে নেমে এলেন তিনি প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সেবার নিভৃত লোক থেকে। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তিনি আত্মকর্তৃত্ব সম্পন্ন স্বদেশী শাসন লাভের পক্ষে ও পরকীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাতে লাগলেন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায়। রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখান আবেদন-নিবেদন, বক্তৃতা ও প্রস্তাব গ্রহণ ছেড়ে দেশকে অবহিত হতে হবে আত্ম-সংস্কারে। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে হবে দেশের শিক্ষা, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাষ্ট্র-বিধি পুনর্গঠনে। এই সময়ের লেখা 'রাজকুটুম্ব,' 'ঘুষোঘুষি,' 'রাজা-প্রজা' প্রভৃতি রচনাতেও ধ্বনিত হয়েছে একই সুর। এক বৎসর পরে সমস্ত দেশ উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যে স্বদেশী আন্দোলনে, প্রকৃত পক্ষে তার আবহাওয়া এই ভাবে তৈরী করেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথই।

১৯০৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ আসেন স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করতে। এই সময় কলকাতায় ই বি হ্যাবেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় সরকারী আর্ট স্কুল স্থাপিত হয়। ভগিনী নিবেদিতা, কাউন্ট ওকাকুরা এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রধান উদ্যোগী। ভারতীয় চিত্রকলা আজ যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হয়েছে, তার পিছনে আছে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সাধনা ও রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা, এ কথা হয়ত অনেকের জানা নেই।

এই সময় লর্ড কার্জন বঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্কল্প করেন। ১৯০২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি প্রাচ্যদেশ বাসীদের সম্বন্ধে যে অশিষ্ট উক্তি করেন, তাতেই সমস্ত দেশে তাঁর বিরুদ্ধে ধূমায়িত হচ্ছিল তীব্র অসন্তোষ। বঙ্গ-ভঙ্গের উদ্যোগে তা দাবানলের মতো জ্বলে ওঠে এবং সমগ্র বাংলা জুড়ে সুরু হয় প্রবল আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ নেমে এলেন সেই আন্দোলনে। টাউন হলে ১৯০৫ সালে যে সভা হয়, তাতে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে তিনি পাঠ করেন তাঁর সর্বজনবিদিত বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় তিনি এক

দিকে প্রচার করেন প্রতিক্রিয়াশীল গভর্নমেন্টের সঙ্গে অসহযোগিতার নীতি, অন্যদিকে জ্ঞানে কর্মে বিত্তে-ব্যবসায়ে দেশবাসীকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হতে বলেন। এই আন্দোলন যে কেবলমাত্র বাদ-প্রতিবাদেই পর্যবসিত হয়নি, দেশবাসী যে স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপনের দ্বারা বিদেশী বণিক-সরকারকে হাতে-কলমে কাবু করার কাজেও অগ্রসর হন, সে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক পরিকল্পনার জন্যে। বলা যেতে পারে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখা দেন এই আন্দোলনের দেহরূপে, আর রবীন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পাল তার আত্মারূপে।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ বাংলার অবিচ্ছিন্ন একাত্মতার প্রতীক হিসাবে রাখী-বন্ধন উৎসব প্রবর্তন করলেন। এই উপলক্ষে রচিত তাঁর বিখ্যাত গান, 'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান' তখন জন-মনে প্রবল সাড়া তুলেছিল। আরো অনেক গানই তিনি লেখেন এই সময়ে, যার মধ্যে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' প্রসিদ্ধ এবং স্বয়ং শোভাযাত্রা সহকারে এই গান গেয়ে তিনি সমস্ত দেশ তোলপাড় করে তোলেন। ছাত্রদের রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদান বা 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়া নিষিদ্ধ করে গবর্ণমেণ্ট যে সার্কুলার জারী করেন, ছাত্রদের এক বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি রূপে তার প্রতিবাদ করেন একটি বক্তৃতায়। স্বদেশী আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে চালানোর জন্যে একটি জাতীয় ধন-ভাণ্ডার খোলা হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একদিনের অধিবেশনেই এর জন্যে ওঠে পঞ্চাশ হাজার টাকা। রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন তখনকার যুবক সমাজের মনোরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট।

= ৩ =

(১৯০৬—১৪)

পনেরো থেকে তিরিশ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সমগ্রত লাভ করেছিল। তা সম্পূর্ণতা লাভ করল তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। এখন থেকে জ্ঞান ও কর্মের, শিল্প ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে সমভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে কাটতে লাগল তাঁর জীবন এবং বোঝা গেল যে সমসাময়িক কালের সকলকে ছাপিয়ে উঠবেন তিনি প্রতিভা ও মনীষার প্রদীপ্ত প্রভায়। তখনকার বাংলা দেশে প্রথম শ্রেণীর মনীষার অধিকারী খুব কম ছিলেন না। রাজনীতি ক্ষেত্রে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিবেকানন্দ স্বামী। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগেও বড় নামের অভাব ছিল না। কাব্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস। নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। উপন্যাসে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গদ্য রচনায় প্রিয়নাথ সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রমথ চৌধুরী। এই সমসাময়িকের জনতা ভেদ করে সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি একাধারে প্রধানতম নায়ক, লেখক, শিক্ষাদাতা ও সংস্কারক।

রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম প্রাণ-শক্তি নানা পথে নিজেকে প্রকাশ করেছে অতি অল্পবয়স থেকেই। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে তিনি একই সঙ্গে জমিদারী চালাচ্ছেন, ব্যবসা করছেন, একের পর এক পত্রিকা সম্পাদন করছেন, নূতন নূতন নাটকের অভিনয়ে নামছেন, স্বদেশী আন্দোলনে দায়িত্বপূর্ণ অংশ নিচ্ছেন, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় চালাচ্ছেন, তারই সঙ্গে মাতৃহীন পুত্র-কন্যাদের সযত্নে পালন করছেন! এত কাজ এবং এত বহুমুখী ও বিচিত্র কাজ একসঙ্গে চালানো, তারই ভেতর লেখনীকে সাহিত্যের নব নব পথে অব্যাহত বেগে প্রবাহিত করা যে কি ব্যাপার, যে-কোন সাধারণ বুদ্ধির লোকও তা বুঝতে পারেন।

স্বদেশী আন্দোলনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই আন্দোলন বঙ্গ-ভঙ্গ

থেকে সুরু হয়ে ক্রমে সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হল। রবীন্দ্রনাথ সেই বিক্ষোভে কত বড় অংশ নেন, তারও আভাষ দিয়েছি আমরা। কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই ১৯০৭ সালে তিনি সরে আসেন রাজনীতির জগৎ থেকে এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন শান্তিনিকেতনের সেবায়। কবির এই আকস্মিক অন্তর্ধান নিয়ে পরবর্তীকালে প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছে প্রচুর। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে প্রবন্ধে, বক্তৃতায় ও গানে দেশের যুব-শক্তিকে উদ্‌ভ্রান্ত, বিপর্যস্ত ও উত্তেজিত করে তাদের অসহায় ভাবে বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তে ফেলে, ভাব-বিলাসী কবি এই আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ততার পরিচয় দেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই অন্তর্ধানের পিছনে ভাব-বিলাস বিন্দুমাত্র ছিল না। তিনি যখন দেখলেন, আন্দোলন যে-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সুরু হয়েছিল, তা সার্থক হচ্ছে না, আত্মঘাতী উত্তেজনায় তা শুধু শক্তিক্ষয়ই করছে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট উন্মাদনায় তাঁর অনভিপ্রেত পথে পা বাড়াচ্ছে, তখন তিনি এ থেকে সরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। স্বদেশী আন্দোলন শেষকালে রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে কি ভাবে রূপায়িত হয়েছে, তা আমরা সকলেই জানি। তার এ রূপান্তর চান নি রবীন্দ্রনাথ।

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার' প্রবন্ধে কবি তাঁর অবলম্বিত নীতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখান যে সত্যকার স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সমাজ-ব্যবস্থার আনুপূর্বিক সংশোধন চাই। জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও মূঢ়তার দাসত্ব থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করতে না পারলে, বৃথা উত্তেজনায় কাটাকাটি করে সত্যিকার কোন লাভ নেই। অন্যকে মারার উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতেই পর্যবসিত হবে। তখনকার রাজনীতিক সমাজে এই প্রবন্ধ নিয়ে বাদ-বিবাদ হয়েছে প্রচুর, কিন্তু কবি আর ফিরে আসেন নি রাজনীতির মধ্যে।

এর কিছু আগেই সুরু হয় তাঁর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে মসী-যুদ্ধ। তারই জের চলছে তখনো। 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' বইয়ে কবি তাঁর জীবন ও কাব্য-সৃষ্টির মূল-উৎস বিশ্লেষণ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে কবি তাঁর কাব্য-সৃষ্টির মূলে যে ঐশী শক্তির প্রেরণা দাবী করেন, তাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের আপত্তি। তিনি কবির 'চিত্রাঙ্গদা' এবং বহু প্রেম-সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করে দেখাতে চান যে যৌন-আবেদন বহুল সেই সমস্ত লেখা

ভাগবতী প্রেরণা সঞ্জাত ত নয়ই, বরং রীতিমতো অশ্লীল ও দুর্নীতিদুষ্ট। কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সাহিত্য জগতে প্রথম পরিচিত করেন রবীন্দ্রনাথই। কিন্তু এই সময়ে কি কারণে বলা কঠিন, উভয়ের সেই মধুর সম্পর্কের অবসান হয়েছে দেখা যায়। বাইরে এটা সাহিত্য-কলহ রূপে দেখা দিলেও, জিনিষটা ঠিক তা নয়। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যাঁদের ঈর্ষার বস্তু ছিল, তাঁরাই দ্বিজেন্দ্রলালকে করেন তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে উৎসাহিত, যার ফলে অত বড় রসিক ও রসজ্ঞ হয়েও দ্বিজেন্দ্রলাল কল্পিত সুনীতি-দুর্নীতির অজুহাত তুলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। শুধু এখানেই শেষ নয়, রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তিনি লেখেন 'আনন্দ বিদায়' নামক প্রহসন, যা রুচির বিচারে ধিক্কারজনক। এই বিবাদে রবীন্দ্রনাথ যে সংযম ও আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। একবার মাত্র তিনি লেখনী ধরেন এবং তাতেও শিষ্টতা এবং শালীনতা রক্ষা করেন পূর্ণমাত্রায়।

এই সমস্ত সাহিত্যিক গালাগালি একদিকে, অন্যদিকে রাজনৈতিক গালাগালি, তারই ভেতর নিবিষ্ট চিত্তে কবি লিখে চললেন তাঁর 'খেয়া' কাব্যের কবিতাগুলি এবং 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে লেখা সুরু করলেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোরা'।

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় তিনি 'ভাণ্ডার' নামে একটি নূতন মাসিক পত্র প্রকাশ করেন, তার পৃষ্ঠায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার উন্নয়নের উপায় সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করার জন্যে। এই সময় থেকে দেশের কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির প্রশ্ন তাঁর মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয়। আর এই দিক থেকে প্রত্যক্ষভাবে দেশকে সেবা করার উদ্দেশ্যেই তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু শ্রীশ মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকায় পাঠান কৃষিবিদ্যা শিখতে।

এই বৎসর কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্যক্রমের প্রাথমিক খসড়া রচনা করে দেন। এই উপলক্ষে সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে তিনি কতকগুলি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। পরের বৎসর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যু হয় এবং আবার তিনি নিদারুণ আঘাত পান।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পাবনায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি

সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং গ্রাম্য জীবনের পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে অভিভাষণ দেন, তাতে তদানীন্তন যুবক সমাজ বিশেষ ভাবে কর্মে উৎসাহিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা লক্ষ্য করার পর থেকেই কবি হৃদয়ঙ্গম করেন যে আগে গঠনমূলক কাজের দ্বারা আত্মশক্তি ও আত্মসংহতি অর্জন করতে হবে, তারপর স্বাধীনতার আশা। স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কা যখন বোমা আন্দোলনে পর্যবসিত হল, কলকাতা মাণিক-তলায় বোমার কারখানা ধরা পড়ল, মজঃফরপুরে সাহেব খুন হল, বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা ধরা পড়লেন, কবি তখন আন্দোলন থেকে সরে গেলেন বটে, কিন্তু এত বড় সাংঘাতিক পরীক্ষার ভেতর জাতিকে নির্বিবাদে এগিয়ে যেতে দেওয়া অনুচিত ভেবে তাকে নীরবতা ভঙ্গ করতে হল। যে নিপীড়ন ও শোষণ নীতির ফলে দেশ এই ভয়ানক পথে আপনার মুক্তি খুঁজতে বেরিয়েছে, সেই দুষ্ট শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আক্রমণ করলেন 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে এবং যাঁরা এই ভ্রান্ত পথে দেশকে বন্ধন মুক্ত করতে অগ্রসর, তাঁদের আন্তরিকতা, শৌর্য ও ত্যাগশীলতা স্বীকার করেও, তিনি তাঁদেরও সতর্ক করে দিলেন, এ পথ নয়, এ পথে মুক্তির আশা নেই! এর প্রায় সমসাময়িক 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও তিনি এই প্রসঙ্গকে রূপকের সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছেন। ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি দেখিয়েছেন, অহিংস অসহযোগের দ্বারা কি ভাবে দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হতে হবে। বলা বাহুল্য, গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন দেখা দেয় এর অনেক পরে।

পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করার পর শান্তিনিকেতনে প্রথম সমারোহ করে তাঁর জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হয়। এই সময় বহু অনুরাগীর অনুরোধে তিনি নিজের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতি-কথা লেখা সুরু করেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত সেই বিখ্যাত 'জীবনস্মৃতি'র উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এরি ফাঁকে ফাঁকে তিনি লেখেন 'শারদোৎসব' গীতিনাট্য, 'রাজা' রূপক নাট্য এবং 'গীতাঞ্জলি'র বেশীর ভাগ গান। শান্তি-নিকেতনে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি নাটকের অভিনয়ে মূল ভূমিকাগুলিতেও অবতীর্ণ হন স্বয়ং কবি। 'শারদোৎসবে' সন্ন্যাসীর ভূমিকায়, 'প্রায়শ্চিত্তে' ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় এবং 'রাজা'য় ঠাকুরদার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় যে কত মনোজ্ঞ হয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় ক্ষিতিমোহন সেনের একটি স্মৃতি-কথায়।

কবির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে মহা সমারোহে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে যে বিরাট জন সমাবেশ হয়, বাংলা দেশের ইতিহাসে কোন সাহিত্য-সেবীর নামে কোন দিন এত বড জনতা হয়নি। অনেকের ধারণা, পাশ্চাত্য জগতে সম্মানিত হবার আগে বাংলা দেশ কবির প্রতি কর্তব্য পালন করেনি। দুর্ভাগ্য বশত কবি নিজেও সময় সময় অনুরূপ মতই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু টাউনহলের এই অনুষ্ঠানে বা ইতিপূর্বের রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে দেশের জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীরা তাঁকে যে কতখানি শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আজো তখনকার সংবাদপত্রে।

কবির বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত 'জনগন মন অধিনায়ক' এই সময়ের রচনা। প্রসিদ্ধ 'অচলায়তন' এবং 'ডাকঘর' নাটকও তিনি লেখেন এই সময়। 'অচলায়তন' প্রকাশিত হওয়ার পর সনাতনী হিন্দু মহলে তা নিয়ে প্রচুর হৈ-চৈ হয়। যে বিবেচনাহীন অন্ধ সংস্কারের প্রাচীরে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথ আমাদের সমাজ অবরুদ্ধ করে রেখেছে, এই রূপক নাট্যে কবি তার ওপর নির্মম বিদ্রূপের কশাঘাত করেন বলেই, রক্ষণশীল সমাজের নাড়ী এত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এই সময় দেশে একটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা চলছিল। কবি তার উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে দেন চমৎকার একটি বক্তৃতা। সেই বক্তৃতায় বা ওভারটুন হলে প্রদত্ত এরই সমকালীন 'ভারতীয় ইতিহাসের ধারা' বক্তৃতায় তিনি হিন্দু আদর্শ ও শিক্ষা-পদ্ধতির মূল-সূত্র ব্যাখ্যা করে যুগোচিত ধারায় কি ভাবে আজ তাদের পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে, তার পথ-নির্দেশ করেন। এর কিছু পূর্ববর্তী 'তপোবন' প্রবন্ধেও একই সুরের অনুরণন শোনা যায়। এই তিনটি প্রবন্ধে বোঝা যায়, তাঁর মনে ভাবী 'বিশ্বভারতী'র প্রাথমিক পরিকল্পনা দানা বাঁধছে। সে দিক থেকে রবীন্দ্র-জীবনের পরবর্তী পরিণতির এরা পথ নির্দেশক।

পত্নী-বিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পারিবারিক আবেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে একান্ত ভাবে জ্ঞান ও কর্মের সেবায় নিয়োগ করেন। একমাত্র নাবালক ছেলে শমীন্দ্রও যখন মারা গেল, তখন তাঁর কেটে গেল শেষ বন্ধনটুকুও। সংসারের মধ্যে থেকেও তিনি ছাপিয়ে উঠলেন সংসারের সব

কিছুকে এবং পরবর্তী সমস্ত জীবনটাই তাঁর কেটে গেল এই ভাবে একক কর্ম-সাধনায়। ইতিমধ্যে রথীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন আমেরিকা থেকে এবং শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল। কবি তাঁকে তখন দিলেন জমিদারী তদারকের ভার। নিজে জমিদারী চালানোর সময় তিনি লক্ষ্য করেন, এদেশে অবৈজ্ঞানিক কৃষি-ব্যবস্থার হালচাল এবং সেই সঙ্গেই উপলব্ধি করেন কৃষি-সর্বস্ব বাংলা দেশের অসহায়তা। অনিশ্চিত ও দৈবাধীন ফলনের মুখ চেয়ে না থেকে, যাতে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সেচ, সার-প্রয়োগ ও যান্ত্রিক উৎপাদনের দ্বারা দেশকে নিরন্নতার হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তার জন্যেই তিনি পুত্রকে পাঠান বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করতে। বলা বাহুল্য রথীন্দ্রনাথ সানন্দে গ্রামে গেলেন পিতার ইচ্ছা পূরণ করতে এবং কবি রইলেন শান্তিনিকেতনের সেবায় নিরত।

এই সময় অর্থাৎ ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় বারের জন্যে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ যাবার সুযোগ হল। যাত্রার পথে অবসর বিনোদনের জন্যে তিনি 'নৈবেদ্য', 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'র কতকগুলি বাছাই করা কবিতা ও গান সরল ইংরাজী গদ্যে অনুবাদ করেন। লণ্ডনে শিল্পী রোটেনস্টাইনের বাড়ীতে থাকা কালে কথা-প্রসঙ্গে একদিন তাকে তিনি দেখান এই অনুবাদগুলি। রোটেনস্টাইন তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং তিনিই ইয়েটস, আর্নেষ্ট রিস, হেনরি নেভিনসন, মে সিনক্লেয়ার, ট্রিভেলিয়ান, স্টপফোর্ড ব্রুক প্রমুখ বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের একদিন আমন্ত্রণ করেন এই অনুবাদ শোনার জন্যে। সেই সময় স্বয়ং ইয়েটস কবিতাগুলি আবৃত্তি করেন এবং শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে এই প্রাঞ্জল ইংরাজী অনুবাদ উপভোগ করেন। এঁদেরই আগ্রহে লণ্ডন ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে বই আকারে কবিতাগুলি গ্রথিত হয়। এই বইই হল ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'। রোটেনস্টাইন এর প্রারম্ভে আঁকেন কবির একখানি রেখাচিত্র এবং ইয়েটস সবিস্তারে রবীন্দ্র-কাব্যের মর্ম বিশ্লেষণ করে লেখেন এক মূল্যবান ভূমিকা। এইখান থেকেই সুরু কবির ইউরোপীয় খ্যাতি। দেশে যিনি শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিক নেতা ও ধর্মবেত্তা, সম্পাদক ও বক্তা, কবি ও সুরস্রষ্টা রূপে করেছিলেন সকলের চিত্ত জয়, এখন থেকে তাঁর মনীষা পরিব্যাপ্ত হল সমস্ত জগতে। দেশ-কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে এখন থেকে তিনি হলেন বিশ্বকবি। কিন্তু এ কিছুদিন পরের কথা।

ইংলণ্ড থেকে কবি গেলেন আমেরিকায়। সেখানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা দিলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ সম্বন্ধে এবং রচেষ্টারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে 'জাতি-সংঘাত' সম্বন্ধে। ১৯১৩ সালের প্রারম্ভে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতাগুলি দেন তিনি, তা-ই পরে সংগৃহীত হয় তাঁর 'সাধনা' নামক ইংরাজী বইয়ে। আমেরিকা থেকে ইংলণ্ড হয়ে ঐ বৎসরই তিনি দেশে ফেরেন। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত গীতাঞ্জলি ইউরোপীয় রসিক-সমাজে বিশেষ আদৃত হয় এবং ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশ করেন তার নূতন একটি সংস্করণ।

দেশে ফেরার অল্প দিন পরেই জানা গেল যে সুইডিস একাডেমি ঐ বৎসরের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজে সম্মানিত করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর কিছু আগেই যদিও তাঁকে সম্মানাত্মক ডি-লিট উপাধি দেবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বৈদেশিক সম্মান পাবার পরই তাঁদের সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত হয়।

এই সময় অতিশয় অপ্রীতিকর একটি ব্যাপার ঘটে। কবির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে উল্লসিত হয়ে বাংলার একদল কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক স্পেশাল ট্রেণ যোগে শান্তিনিকেতন যান তাঁকে সম্বর্ধিত করতে। কবি এই সময় তাঁদের প্রতি সময়োচিত দাক্ষিণ্য দেখাতে পারলেন না। বরং নিরতিশয় রূঢ়তার সঙ্গেই তাঁদের সে শ্রদ্ধা নিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। বিদেশীর হাতে সম্মানিত হবার আগে দেশ তার কবিকে সম্মান দেয়নি বলে, তিনি তাঁদের উদ্দেশে উষ্মা প্রকাশ করেন। কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অর্ঘ্য বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা এতে বিশেষ ব্যথিত হন এবং সংবাদপত্রে এই নিয়ে বেধে যায় প্রভূত বাদ-বিবাদ। বলা বাহুল্য কবি ইউরোপে যে সম্মান পেয়েছিলেন, দেশে তা পাননি। কিন্তু যে দেশে মধুসূদন অনাহারে অচিকিৎসায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, সে দেশে আযৌবন তিনি পেয়েছেন দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি। রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক মতদ্বৈধের দরুণ যাঁরা তাঁকে আক্রমণ করতেন, বা তাঁর অনিষ্ট সাধনের ফন্দী আঁটতেন, তাঁরা সবশুদ্ধ কতজন? আসলে লক্ষ লক্ষ নাম-গোত্রহীন সাধারণ দেশবাসী ত বরাবরই ছিলেন তাঁর পিছনে। তাঁদের রক্তমক কল্লোলিত হয়েছে তাঁর নাটকের অভিনয়ে, তাঁদের

শিক্ষায়তন, সংস্কৃত সভা, রাজনৈতিক বক্তৃতা মঞ্চ মুখরিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধে বক্তৃতায় গানে। তাঁদের গৃহাঙ্গণ মধুর হয়েছে তাঁর কাব্যের আবৃত্তিতে, গানের ঝঙ্কারে, গল্প উপন্যাসের অধ্যয়নে। ইউরোপীয় সম্মান লাভের বহু আগেই তা হয়েছে। সেই দেশবাসী সম্পর্কে কবির মনে কোন বেদনা থাকা উচিত ছিল না।

১৯১৪ সালে বাধল ইউরোপের মহাসমর এবং কবি নিজে গিয়ে নোবেল পুরস্কার নিয়ে আসতে পারলেন না। বাংলার ছোটলাট লর্ড কারমাইকেলের মারফৎ এই প্রাইজ (প্রায় এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা, একটি মানপত্র ও একটি স্বর্ণপদক) তাঁর কাছে পৌছে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে কলকাতা লাট প্রাসাদে একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন হয় এবং সরকারী বেসরকারী বহু ব্যক্তি এখানে সমবেত হয়ে কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে। ইংলণ্ড থেকে উইলিয়াম পিয়ার্সন এবং ভারত-বন্ধু চার্লস এণ্ডরুজ এসে যোগ দিয়েছেন এতে শিক্ষক রূপে। বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুও আসেন এই সময়ে।

এই সময় বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' আত্মপ্রকাশ করে। তথাকথিত লেখা ভাষা ছেড়ে ভদ্র-সমাজের কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করা এবং দেশ বিদেশের জ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় ঘটানো, এই ছিল 'সবুজ পত্রে'র লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথই দেখা দেন সবুজ পত্রের প্রধান লেখকরূপে। তাঁর পরিণত বয়সের অধিকাংশ লেখাই প্রকাশিত হয় এতে। প্রমথ চৌধুরী নিজে বলেছেন, 'সবুজপত্র' ছিল রবীন্দ্রনাথের কাগজ, আর আমি ছিলাম তাঁরই নির্বাচিত সম্পাদক। 'সবুজ পত্রে'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ লক্ষ্য করলে, এ কথা অসমীচীন মনে হয় না।

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির অব্যবহিত পর থেকেই কবির মনে ঘুরছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবন-নীতির পূর্ণ পরিচয় বহন করে এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনা, যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সহজ ভাবে এসে মিশতে পারবে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে। এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় আরো কিছুদিন। সেইখান থেকেই সুরু তাঁর জীবনের সর্বশেষ অধ্যায়, যে অধ্যায়ে বিশ্ব-মানবতার বিগ্রহ রূপে তিনি জগদ্বিখ্যাত হন।

= ৪ =

(১৯১৪—২০)

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা যখন দেশে-বিদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, ঠিক সেই সময় ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা দিলেন আর একজন বৃহৎ মানুষ। তিনি হলেন মোহনদাস গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অধিকার নিয়ে সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম পরিচালনা করে তিনি তখন যশস্বী হয়েছেন। ১৯১৫ সালে সস্ত্রীক গান্ধী এলেন শান্তিনিকেতনে। নব ভারতের শ্রেষ্ঠ দুই সন্তানের মধ্যে সৃষ্টি হল বন্ধুত্বের, যা কবির জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন থেকেছে। 'সবুজপত্রে'র কথা আমরা আগেই বলেছি। এতে এই সময় কবি লিখতে সুরু করেন তাঁর বিখ্যাত 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস। এই দুটি বই, বিশেষত 'ঘরে বাইরে' নিয়ে বাংলার সাহিত্য জগতে আবার বিরুদ্ধ আলোচনার ঝড় বইতে সুরু করে। প্রথমটিতে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার এবং দ্বিতীয়টিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের গলদগুলি কবি এমন জোরালো হাতে উদ্‌ঘাটিত করেন, যাতে অনেক সুবিধাবাদী বিব্রত হয়ে পড়েন। এ ছাড়া এই সময় তিনি লেখেন 'বলাকা' কাব্য এবং 'ফাল্গুনী' নাটিকা। ম্যাকমিলান কোম্পানী থেকে তাঁর Gardener এবং Crescent Moon ইংরাজী কবিতার বই দুখানিও বের হয় এই সময়ে। Gardener 'ক্ষণিকা', 'চৈতালী' প্রভৃতি থেকে নির্বাচিত কতকগুলি কবিতার সমষ্টি, আর Crescent Moon 'শিশু' বইয়ের নির্বাচিত কবিতাবলীর অনুবাদ। 'চিত্রাঙ্গদা', 'ডাকঘর,' 'রাজা' প্রভৃতি নাটিকারও ইংরাজী তর্জমা বেরোয় এই সময়। এর মধ্যে Post Office ও King of the Dark Chamber কবির স্বকৃত অনুবাদ নয়।

১৯১৫ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট রবীন্দ্রনাথকে স্যার উপাধিতে সম্মানিত করেন। সম্ভবত স্বদেশী আন্দোলনে কবি যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেন, তা থেকে দেশের জন-মনে তাঁর প্রভাব কতটা বুঝতে পেরে গভর্ণমেণ্ট মনে করেছিলেন, সরকারী খেতাব দিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে খুশী করবেন। কিন্তু তাঁদের হিসাবে

যে ভুল হয়েছিল, সেটা অল্পদিন পরেই টের পাওয়া গেল। সে কথা আমরা পরে বলছি।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের আর একবার বিদেশ যাত্রার অবসর হল। তিনি পিয়ার্সন ও এণ্ডরুজের সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন জাপানে। জাপানে কবিকে যে ভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্বর্ধিত করা হয়, তা বোধহয় জাপানের সম্রাট ছাড়া আর কেউ কোন দিন পান নি। সভায়-সমিতিতে, উৎসবে, পার্টিতে জাপানের আপামর জনসাধারণ কবিকে নিয়ে মেতে ওঠেন। কিন্তু কবি যখন জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতির এবং চীন সম্পর্কে অবলম্বিত শোষণ মূলক কার্য-কলাপের নিন্দা করলেন (তাঁর Nationalism বইয়ে এই বক্তৃতাগুলি গ্রথিত হয়েছে), তখন জাপানের সরকারী মনোভাব তাঁর প্রতি বিরূপ হল। কবি এখন জাপান থেকে রওনা হলেন আমেরিকায়। এখানেও চলল হিংস্র জাতীয়তাবাদ, যা পররাজ্য গ্রাসের দ্বারা আত্মোন্নতির পথ খোঁজে, তার বিরুদ্ধে বক্তৃতার অভিযান। বৃটিশ ঘেঁষা মার্কিন মহল তাঁর এই বক্তৃতায় কুপিত হন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ সুরু হয়ে যায়। এই সময় 'হিন্দুস্থান গদর নামে পরিচিত আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী দলের নেতা রামচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লেখেন, বৃটিশ সরকার প্রদত্ত স্যার উপাধির জয়পত্র কপালে এঁটে, তিনি ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন, শুধু করতালি লাভের জন্যে। আসলে তিনি ভারতে বৈদেশিক শাসন কায়েম রাখারই পক্ষপাতী, কেননা এই শাসনই তাঁকে বিশ্বকবি বানিয়েছে। শুধু এই নয়, এই সময় প্রবল জনরব ওঠে যে গদর দল রবীন্দ্রনাথের প্রাণনাশ করবার সুযোগ খুঁজছে। রবীন্দ্রনাথ এ গুজবে বিশ্বাস করেন নি এবং রামচন্দ্রও লিখিত ভাবে এর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু একটু উদ্যোগ হওয়া অসম্ভব নয়, যেহেতু মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ সতর্ক হয়েছিলেন। অবশ্য আমেরিকার উদারনীতিক সমাজে কবির সমাদরের অভাব হয়নি। নিউ ইয়র্ক এবং বোষ্টনে তিনি বিশেষ ভাবে সম্বর্ধিত হন এবং তাঁর বক্তৃতা লক্ষ লক্ষ লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনেন। এই বক্তৃতাগুলিই Personality নামক বইয়ে গ্রথিত হয়েছে।

১৯১৭ সালে কবি দেশে ফিরলেন। ফেরার পথে হনলুলু হয়ে জাপানে

আর একবার যান তিনি কয়েক দিনের জন্যে। দেশে ফেরার পরই তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় আবার একটি ঝড়ের ভেতর। শ্রীযুক্তা আনি বেশান্তকে এই সময় গভর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে অন্তরীণ করেন। এই সম্মানিতা মহিলার প্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে আলফ্রেড থিয়েটারে কবি তাঁর সর্বজন পরিচিত রাজনৈতিক বক্তৃতা 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' পাঠ করেন। মদনমোহন মালবীয়ের অনুরোধে রচিত তাঁর ভারত-বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটিও তিনি গান এই অনুষ্ঠানে। এই সময় কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে সভানেত্রীরূপে প্রস্তাবিত হয় শ্রীযুক্তা বেশান্তের নাম, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নরমপন্থীরা করেন এর বিরোধিতা। রবীন্দ্রনাথ বেশান্তের মনীষা ও ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বেশান্তের পক্ষ সমর্থন করেন এবং স্বয়ং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হন। ইতিমধ্যে বিবাদের মীমাংসা হয়ে যায় এবং বেশান্ত মহোদয়া সভানেত্রী মনোনীতা হওয়ায় কবি আর অগ্রবর্তী ভূমিকা নিলেন না। কবি এমনিই কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেন এবং 'ভারতের প্রার্থনা' কবিতাটি এখানে আবৃত্তি করেন। কংগ্রেস মণ্ডপে কবি প্রবেশ করা মাত্র যে উল্লাস তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, তার কথা আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। গান্ধী, তিলক, মালবীয়, বেশান্ত এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা কবির আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং কবি নব প্রতিষ্ঠিত 'বিচিত্র' সাহিত্য-সভার পক্ষ থেকে তাঁদের আপ্যায়িত করেন 'ডাকঘর' অভিনয় করে। এই সময় বিহারে হিন্দু-মুসলমানে একটা দাঙ্গা হয়। তাতে কবির লেখনী থেকে বের হয় তাঁর 'ছোট ও বড়' নামক রাজনৈতিক প্রবন্ধ।

১৯১৮ সালে আমেরিকা, জাপান ও ভারতবর্ষে বৃটিশ-স্বার্থের বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পিয়ার্সন ধৃত হন এবং তাঁকে সরাসরি ইংলণ্ডে চালান করে দেওয়া হয়। পিয়ার্সনের সঙ্গে সংস্রব থাকায় এবং আমেরিকা ও জাপানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মত প্রচারের দরুণ, রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের সম্পর্কেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব বেশ একটু বিরূপ হয়। কবি তাতে উদ্বিগ্ন হন, কিন্তু তাঁর উৎসাহ ও কর্মশক্তি দমিত হল না। এই বৎসরই বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং পর বৎসর অর্থাৎ ১৯১৯ সালে জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময়, তথা জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার

কেন্দ্ররূপে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কবি স্বয়ং নেন সাহিত্য বিভাগে পড়ানোর ভার। বিশ্বভারতীর লক্ষ্য ও আদর্শ কবি এইভাবে ব্যাখ্যা করেন :

"Visva-bharati represents India where she has her wealth of mind which is for all. Visva-bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best." অর্থাৎ, 'জগতের জন্যে ভারতের যা-কিছু সম্পদ, বিশ্ব-ভারতী হবে তারই প্রতিভূ। বিশ্বভারতী স্বীকার করবে সমস্ত পৃথিবীকে তার সাংস্কৃতিক আতিথ্যে সম্বর্দিত করতে এবং প্রতিদানে জগতের কাছ থেকে ভারতের পক্ষে গ্রহণীয় যা তা গ্রহণ করতে।'

১৯১৯ সালে পাঞ্জাব জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনায় ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ সরকার প্রদত্ত স্যার উপাধি পরিত্যাগ করেন। এই উপলক্ষে বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে তিনি যে তেজোদ্দীপ্ত চিঠি লেখেন, আউরঙ্গজেবকে লেখা রাণা রাজসিংহের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিঠির সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে। চিঠিখানি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একখানি অবিস্মরণীয় দলিল।

রবীন্দ্রনাথের এই তেজোগর্ভ চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে সাড়া পড়ে যায়। পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সারা ভারতে উদ্দীপনা সঞ্চার করে। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতায় ভগ্ন মেরুদণ্ড দেশ আবার জেগে ওঠে স্বাধীনতা লাভের স্পৃহায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, গোখলে ও তিলকের রাজনীতি শেষ হয়েছিল, তার জায়গায় সুরু হল নূতন নেতৃত্ব, নূতন আন্দোলন। এই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহী বীর মোহনদাস গান্ধী, আর তাঁকে কেন্দ্র করে এগিয়ে এলেন মতিলাল নেহরু, লাজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাস। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ অসহযোগ আন্দোলনে মেতে উঠল। ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ভারত-বাসীর আত্মস্বতন্ত্র অধিকার অর্জনের সেই উদ্দাম আন্দোলন এক দিকে, অন্যদিকে তাকে নিরস্ত করার জন্যে সরকারী হস্তের কঠোর নিপীড়ন। দেশ ডাকল রবীন্দ্রনাথকে, আর একবার তাঁর সেই অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা

নিয়ে এই আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়াতে। গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন তাঁকে ধরে পড়লেন, কিন্তু কবি আর এলেন না।

চরকা, হরতাল ও অহিংসা নিয়ে পরিকল্পিত যে আন্দোলন এই সময় গান্ধীর নেতৃত্বে সুরু হয়, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ রক্ষণশীল নেতা তার ভেতর কোন বিশেষত্ব দেখতে পাননি। আত্মজীবনীতে সুরেন্দ্রনাথ বরং বিদ্রূপই করেছেন এই আন্দোলনকে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবকের উদ্দীপনায় এবং সীমাবদ্ধও থাকে তাঁদেরই মধ্যে। দেশের আপামর জনসাধারণ সেই আহ্বানে সাড়া দেননি। ততখানি জন-চেতনা সৃষ্টি হয়নি তখনো দেশে। গান্ধী-আন্দোলন সে হিসাবে অনেক বেশী ব্যাপক ও সর্বাত্মক রূপ নিয়ে দেখা দেয়। দীনতম কৃষকটি থেকে সুরু করে মতিলাল নেহেরুর মতো বিত্তশালী পর্যন্ত এই আন্দোলনে সমান অংশ নেন। সে হিসাবে ভারত-ইতিহাসে এ-ই হল সত্যিকার প্রথম জাতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলন যদি পেত রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব, দেশের যে অবরুদ্ধ বেদনাকে যদি তিনি ভাষা দিতেন! দুর্ভাগ্য যে কবি এক জায়গাতেই থেমে থাকলেন।

= ৫ =

(১৯২০—৩১)

১৯২০ সালে পঞ্চম বারের জন্যে রবীন্দ্রনাথ বেরোন ইউরোপ সফরে। তাঁর স্যার উপাধি ত্যাগ ও সেই সঙ্গে ভারত-শাসন ব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচনা ব্রিটিশ বড় কর্তাদের চোখে খুব প্রীতিপদ মনে হয়নি। কবি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন, লণ্ডনে আর তাঁর আগের মতো সমাদর নেই। সেখান থেকে তিনি যান ফ্রান্সে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ফ্রান্সের নানা স্থান পরিদর্শন করে তিনি এক দিকে যেমন হলেন নিরতিশয় ব্যথিত, অন্যদিকে তেমনি যে মারাত্মক সাম্রাজ্য-লিপ্সা ও জাতি-দ্বেষ রয়েছে এই ধ্বংসের মূলে, তার ওপর হলেন আরো বীতশ্রদ্ধ। এই সময়ের কয়েকটি বক্তৃতায় তাঁর তৎকালীন মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ফ্রান্সেই তিনি বার্গস, রলাঁ, সিলভাঁ লেভি প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যরথীদের সঙ্গে পরিচিত হন। ফ্রান্স থেকে তিনি যান হল্যাণ্ডে। সেখানে তাঁকে ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ ও ভগবান খ্রীষ্টের প্রতিভূ জ্ঞানে সম্বর্ধনা করা হয়। কয়েক লক্ষ নর-নারী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শোনেন তাঁর বাণী। হল্যাণ্ড থেকে বেলজিয়ামে গিয়েও তিনি একই রকম শ্রদ্ধা ও সমাদর আকর্ষণ করেন। স্বয়ং বেলজিয়ামের রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যান মশাল শোভা-যাত্রার নেতৃত্ব করে। হল্যাণ্ডে ও বেলজিয়ামে কবির বক্তৃতা শোনবার জন্যে যে রকম জন সমাবেশ হয়, তার নিদর্শন ইদানীন্তন ইউরোপে আর কোনদিন হয়নি কারো জন্যে।

ইউরোপ সফর অর্ধ-সমাপ্ত রেখেই কবি চলে যান আমেরিকায়। এখানে অল্প যে কদিন থাকেন, তার মধ্যেই তিনি ব্রুকলিন সঙ্গীত ভবনে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন' এবং নিউইয়র্ক কার্ণেগী হলে 'কবির ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আমেরিকা থেকে আবার তিনি আসেন ইংলণ্ডে। সেখানকার আবহাওয়া তখনো সমান বিরূপ। আবার যান প্যারিসে এবং কয়েকটি বক্তৃতা করেন। এর পর জার্মাণী, সুইডেন, জেনেভা, আরো কোন কোন জায়গায়। জার্মাণীতে তাঁর যে সমাদর হয়, তা পৃথিবীর কোন সম্রাটের

ভাগ্যেও কখনো লাভ হয়নি। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যান এবং জার্মান সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ অতিথি রূপে তাঁকে নিজ প্রাসাদে রাখেন।

আইনষ্টাইন, ফ্রয়েড, টমাস মান, কাইসারলিং প্রমুখ মনীষীদের এবং হিণ্ডেনবুর্গ, ম্যাসরিক, ক্লেমেশঁ প্রমুখ রাষ্ট্রবিদ্‌দের সঙ্গে এই বারকার সফরেই তাঁর সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। তাঁদের হাতে তিনি যে সম্মান পান, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা স্মরণ করতেন। সুইডেনের নোবেল এ্যাকাডেমিতে, বার্লিন, প্রাগ, ভিয়েনা, ফ্রাঙ্কফুর্ট, কোপেনহাগেন, কত জায়গাতেই যে তিনি যান এবং কত বিশ্ববিদ্যালয়েই যে বক্তৃতা দেন, তার ধারাবাহিক ইতিহাস আজো লেখা হয়নি। সর্বত্র তিনি পান বিপুল অভ্যর্থনা ও প্রভূত সমাদর। তাঁর এই সময়কার ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস অবিলম্বে লিখিত হওয়া উচিত। কারণ এক হিসাবে এই বারকার পাশ্চাত্য ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে দিগ্বিজয়ের মতো ঘটনা।

১৯২১ সালের মাঝামাঝি কবি দেশে ফিরলেন। এইবার পুরোপুরি ভাবে হল বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল করেন সেই উদ্বোধনে পৌরোহিত্য। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি, এলমহার্স্ট প্রভৃতি এসে যোগ দেন বিশ্বভারতীতে। শান্তিনিকেতনের অনতিদূরে অবস্থিত সুরুল গ্রামে লর্ড সিংহদের যে বাড়ীটি কবি আগে কিনেছিলেন, এলমহার্স্টের উদ্যোগে সেখানে স্থাপিত হয় শ্রীনিকেতন শিল্প-বিদ্যালয়, আর অধ্যাপক লেভির চেষ্টায় শান্তি-নিকেতনে চৈনিক ও তিব্বতী সংস্কৃতির চর্চা আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে বিশ্বভারতীর কর্মকেন্দ্র নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে, অল্পদিনেই এই আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন সম্পূর্ণ করে। কবি তাঁর নোবেল প্রাইজের টাকা, বইয়ের আয়, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির যাবতীয় আয়, সবই বিশ্বভারতীর ভাণ্ডারে দান করে দেন।

কবি যখন ইউরোপে, তখন দেশে পূর্ণোদ্যমে চলছে গান্ধী-আন্দোলন। কবির অনুপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল এণ্ড্রুজের হাতে। গান্ধী-ভক্ত এণ্ড্রুজ কবির সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই, শান্তিনিকেতনে কতকটা রাজনীতিক কর্ম-ধারার প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করে বসলেন। দেশে ফিরে আন্দোলন যে-পথে চলছে কবি তা অনুমোদন করতে পারলেন না।

কলকাতার এক জনসভায় তিনি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করে জোরালো একটি বক্তৃতা দিলেন। 'শিক্ষার মিলন' নামক সেই বক্তৃতায় আন্তর্জাতিকতার কাছে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাকে ছোট বলে প্রতিপন্ন করেন তিনি। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শিক্ষার বিরোধ' নামে এক বক্তৃতায় কবির মতের প্রতিবাদ করলেন, সেই সঙ্গে করলেন তাঁর বিশ্ব-মৈত্রীর আদর্শকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ। কবিও চুপ করে রইলেন না। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের আর এক বক্তৃতায় ('সত্যের আহ্বান') তিনি তাঁর পূর্ব মতের পুনরুক্তি করলেন। এবার জবাব দিলেন স্বয়ং গান্ধী। ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত গান্ধীজীর সেই 'Great Sentinel' প্রবন্ধ সর্বজন পরিচিত, কেননা একদিন তা নিয়ে হয়েছে প্রচুর বাদানুবাদ।

এই কর্মব্যস্ততার ভেতরেও কবির সাহিত্য-সাধনা কিন্তু পূর্ণোদ্যমেই চলেছে। ইংরাজীতে বেরিয়েছে তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'র অনুবাদ, 'বিসর্জন' এবং আর কয়েকখানি নাটক-নাটিকার অনুবাদ, Personality, Nationalism প্রভৃতি বক্তৃতা সংগ্রহ এবং দুখানি গল্প সঙ্কলন: Hungry Stones এবং Mashi & Other Stories। বাংলাতেও তিনি লিখেছেন 'পলাতকা', 'লিপিকা,' 'মুক্তধারা,' 'শিশু ভোলানাথ'। ১৯২২-১৯২৩ সালের বেশীর ভাগই কবির কাটে ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণে। বোম্বাই, পুণা, মহীশূর, বাঙ্গালোর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মাদ্রাজ, করাচি, হায়দারাবাদ, কাথিয়াবাড়, নানা স্থানে তিনি বক্তৃতা দিয়ে এবং বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করে বেড়ান। এই সময়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা তাঁর 'রক্তকরবী' সাংকেতিক নাট্য।

১৯২৪ সালে চীন সরকারের আমন্ত্রণে কবি আবার বেরোন বিদেশ যাত্রায়। চীনেও তাঁর প্রভূত সমাদর ও অভ্যর্থনা হয়। নব্য চীনের কোন কোন সম্প্রদায় প্রথমে তাঁকে প্রগতি-বিরোধী বলে মনে করেন, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শোনার পর তাঁদের মনোভাব যায় বদলিয়ে। নব্য চীনের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ডাঃ হু-সীর সঙ্গে এই খানেই তাঁর আলাপ হয় এবং চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের যে আদর্শ আজ রূপ লাভ করেছে বিশ্বভারতীতে, তার সূত্রপাতও এইখানে। সাংহাই, নানকিং, হ্যাংকৌ, পিপিং, নানা স্থান ঘুরে ফিরতি পথে কিছুদিন জাপানে কাটিয়ে আসেন কবি। বাংলার মেয়েদের

সম্পর্কে এই সময় লর্ড লিটন যে অশিষ্ট উক্তি করেন, তার প্রতিবাদে তাঁর উদ্দেশে একখানি খোলা চিঠি প্রকাশ করেন তিনি। অল্পদিন পরেই দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাষ্ট্র থেকে স্বাধীনতা-উৎসবে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ এল এবং কবি দক্ষিণ আমেরিকায় রওনা হলেন। কিন্তু মাঝপথে অসুস্থ হয়ে তাঁকে বুয়েনস-এরিসে নামতে হল। এই যাত্রাব পথেই তিনি লেখেন 'পূরবী'র কবিতাগুলি। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তিনি যান ইতালীতে। জেনোয়া, ভেনিস এবং মিলানে তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং বহু বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে সসম্মানে গৃহীত হন। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে অল্পদিনেই দেশে ফিরে আসতে হয়। দেশে ফেরাব পর তাঁর কৈশোরের অনন্য সহায় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। পর বৎসর মৃত্যু হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের। এই বৎসব রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং যৌবনের বন্ধু আগরতলা মহারাজের আতিথ্যে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই আবাব এসে পৌছায় বিদেশেব ডাক।

ইতিপূর্বে শারীরিক অসুস্থতাব জন্যে কবিকে ইতালী সফর সংক্ষিপ্ত করে ফেলতে হয়েছিল। তাই ইতালিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে মুসোলিনী কবিকে ফেব আমন্ত্রণ করলেন। ইতালীতে মুসোলিনী, ইতালীর রাজা ভিক্টর, দার্শনিক ক্রোচে, অধ্যাপক বাঁর্তনি, আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কবিকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির বক্তৃতা হয়। তাঁর নাটকের ইতালীয় অনুবাদ বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং ইতালীয় তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কবিকে মহা উৎসাহে অভ্যর্থিত করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির ইতালী সফর চরম অপ্রীতিকরতার মধ্যে শেষ হয়। ইতালীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা কবির কাছ থেকে যে সমস্ত বিবৃতি নেন, তাতে কবির মুখে ফ্যাসিস্ত ইতালীর শাসন-পদ্ধতির প্রশংসাত্মক অনেক কথা বসিয়ে দেওয়া হয়। সুইজারলণ্ডে এসে কবি এ সংবাদ জানতে পারেন রলাঁর কাছে এবং 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে' সুদীর্ঘ এক পত্র পাঠিয়ে তিনি এর প্রতিবাদ করেন। ফ্যাসিস্ত ইতালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বানিজ্য মূলক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেও যে হত্যা, নিপীড়ন ও স্বৈরাচারের দ্বারা মুসোলিনী আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, কবি তার বিরুদ্ধে এই পত্রে কঠোর মন্তব্য করেন।

ইতালীয়ান প্রেস এতে হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত এবং কবির উদ্দেশে কদর্য কটূক্তি সুরু করে দেয়।

সুইজারলণ্ডে কিছুদিন জর্জ ডুহামেল ও রলাঁর আতিথ্যে কাটিয়ে কবি জুরিক যান। সেখান থেকে যান নরওয়েতে। নরওয়ের রাজা অসলোতে একটি বিরাট জন-সভায় তাঁকে সম্বর্ধিত করেন। বিয়র্ণসেন, জোহান বোয়ার, জ্যানসেন, ন্যুট হামসুন প্রমুখ সাহিত্যসেবীরাও তাঁকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করেন। ড্রেসডেন, কোলোন, বেলগেড, সোফিয়া, বুখারেষ্ট, এথেন্স, কায়রো, এই যাত্রায় সর্বত্র তিনি বিপুল সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হন। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় তিনি ছিলেন রাজ-অতিথিরূপে এবং মিশরে যখন তিনি এসে পৌছান, তখন পার্লামেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন তাঁর সম্মানে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দ কবি দেশে এলেন। ইতিমধ্যে তিনি লিখেছেন 'নটীর পূজা' নাটিকা, 'নটরাজ' গীতিনাট্য এবং 'যোগাযোগ উপন্যাস। এই বৎসর আগরা, জয়পুর, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন পরিভ্রমণ করে, তিনি আবার রওনা হন সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণে।

সিঙ্গাপুর, মালাক্ক, পিনাং, বাটাভিয়, জাভ, বলীদ্বীপ, এই যাত্রায় তিনি বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ওলন্দাজ, ইংরেজ, চৈনিক ও স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা মহা সমারোহে সম্বর্ধিত হন। ফেরার পথে থাইল্যাণ্ড গভর্ণমেন্টের আমন্ত্রণও রক্ষা করে আসেন তিনি। এর কিছুদিন পরে তিনি যান মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী ও সিংহলে। আনি বেশান্ত ও অরবিন্দের সঙ্গে এই সময় তাঁর সাক্ষাৎ হয়। 'শেষের কবিতা' উপন্যাস এবং 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ তিনি লেখেন এই আনাগোনার মুখে।

আবার তাঁর ডাক এল সমুদ্র পার থেকে। কানাডা জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁদের ত্রিবার্ষিক সম্মিলনীতে যোগদান করতে। এইখানে তিনি Philosophy of Leisure বা অবসরের দর্শন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। এই সময় যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড কলোম্বিয়া এবং আরো কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্যে তাঁর আমন্ত্রণ আসে। লস এঞ্জেলস-এ পৌছে তাঁর পাশপোর্ট হারায়, তার ফলে এমিগ্রেশন অফিসারের হাতে হয় তাঁর অশেষ লাঞ্ছনা। তাঁর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে কবি সমস্ত আমন্ত্রণ নাকচ করে

সোজা জাপান চলে আসেন। ফেরার পথে দিন কয়েক তিনি কাটান ইন্দোচীনে। এখানে তখনকার ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করেন।

এই সময় থেকে সুরু হয় কবির চিত্রাঙ্কণ। তাঁর চিত্রাঙ্কণের ইতিহাস খুব বিচিত্র। কবিতা লিখতে লিখতে অনেক সময় পাণ্ডুলিপিতে যে-সমস্ত কাটাকুটি হত, আপন খেয়ালে তার ওপর কলম ঘষতেন তিনি। এই ভাবে ঘষতে ঘষতে অজ্ঞাতসারেই গড়ে উঠছে এক-একটা ছবি, হঠাৎ কবি এটা লক্ষ্য করেন এবং তখন থেকে সজাগ ভাবে আরম্ভ করেন ছবি আঁকা। ছবি আঁকার টেকনিক তিনি হাতে-কলমে শেখেন নি, দেহ-সংস্থান ও বর্ণ-সমাবেশ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রাথমিক জ্ঞান শিল্পবিত্তালয়ে অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়, তা-ও করার সুযোগ হয়নি তাঁর। তাঁর কবি-প্রাণের স্বপ্ন ও কল্পনা রং এবং রেখার ভাষায় আপন আবেগেই উৎসারিত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত বিচারে তাতে ত্রুটি হয়ত আছে, কিন্তু আর্টের প্রাণবস্তু যা, তা তাঁর উৎকৃষ্ট ছবিতে পূর্ণ ভাবেই প্রকাশমান। দেশে ও বিদেশে বহু শিল্পী ও শিল্পরসিক কবির ছবিগুলির উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

১৯৩০ সালে আর একবার বেরোন তিনি ইউরোপ ভ্রমণে। মার্সেলিস, মন্টিকার্লো, চেকোশ্লোভাকিয়া আর্জেনটিনা, নানাস্থানে এবার তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। ইউরোপীয় কলা-রসিকরা, বিশেষ করে ফরাসী সমালোচকরা, তাঁর ছবির শতমুখে প্রশংসা করেন। বিভিন্ন মিউজিয়ামে তাঁর ছবি সমাদরে গৃহীত হয় এবং প্রসিদ্ধ সমালোচক আঁরি বিদ্যো তাঁর ছবির প্রসঙ্গে লেখেন, 'সাহিত্য স্রষ্টা ঠাকুর আর শিল্পী ঠাকুর আসলে একই সত্যদ্রষ্টা মানুষের দুই খণ্ড-অভিব্যক্তি। অখণ্ডরূপে তিনি একজন জীবন-সন্ধানী মিষ্টিক বা মরমিয়া।' লণ্ডনে এসে রবীন্দ্রনাথ খবর পেলেন, গান্ধী গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং বাংলাদেশে হিংস্র দমন-নীতি প্রয়োগ সুরু হয়েছে। ক্ষুব্ধ হয়ে ভারত-শাসনে ব্রিটিশ-নীতির অদূরদর্শিতার আলোচনা করে তিনি 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে'র প্রতিনিধির কাছে একটি সতেজ বিবৃতি দিলেন। এই বৎসরই অক্সফোর্ড বিশ্ববিত্তালয়ে তিনি হিবার্ট লেকচার দেন। সেই প্রসিদ্ধ বক্তৃতা পরে **Religion of Man** পুস্তকে গ্রথিত হয়েছে। ইংলণ্ড থেকে তিনি জার্মাণী যান। মিউনিক এবং ড্রেসডেনেও তাঁর ছবির বিশেষ সমাদর হয়। মোলারের

আর্ট গ্যালারীতে তাঁর ছবির যে প্রদর্শনী হয়, তাতে বহু বিশিষ্ট শিল্পী ও চিত্র সমালোচক কবির কৃতিত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

লণ্ডনে থাকতেই সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে লুনাচার্স্কি তাঁকে আমন্ত্রণ করেন রাশিয়ায় যেতে। মস্কো পৌঁছে তিনি রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পোন্নয়ন বিভাগের বহু বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের দ্বারা বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হন। মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পাইওনিয়ার কম্যুন, রাইটার্স এসোসিয়েশন, নানা স্থানে তাঁকে বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্বর্ধনা জানানো হয়। মস্কো রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ামে তাঁর ছবির প্রদর্শনী বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান, তাঁদের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ, দারিদ্র্য ও সামাজিক অনৈক্য থেকে মুক্ত করে তাঁদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসা, শ্রমকে সম্মান ও শক্তিতে ভূষিত করা, আরো যে সমস্ত প্রয়াস সোভিয়েট রাশিয়াকে বিশ্ববরেণ্য করেছে, কবি তা দেখে মুগ্ধ হন। তাঁর এই সময়ের অভিজ্ঞতা 'রাশিয়ার চিঠি' বইয়ে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। রাশিয়ার শাসন-ব্যবস্থা, তার নূতন সমাজ-বিধান ও জীবন-দর্শন সম্বন্ধে যে তাঁর খুব আস্থা ছিল, তা নয়। তিনি পছন্দ করেন তার জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানগুলিকে। কিন্তু যে বৈপ্লবিক কর্মধারার ভেতর দিয়ে রাশিয়া সামাজিক শোষণ ও কায়েমি স্বার্থের শিকড় উৎঘাটিত করে তবেই এই অনুষ্ঠানগুলি সার্থক করেছে, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দ্বিধামিশ্রিত অপ্রত্যয় ফুটেছে চিঠিতে।

ফাসিস্ত ইতালী ও নাৎসী জার্মানী প্রজার হিতে যে-সব কল্যাণকর অনুষ্ঠান করেছে, কবি তা-ও সপ্রশংস অনুমোদনের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের আভ্যন্তরীণ শাসন-পদ্ধতি, বিশেষ করে বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে কবি স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছেন। রাশিয়া সম্বন্ধে যদিও তাঁর এ রকম কোন সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ উক্তি পাওয়া যাবে না, তবু সংরক্ষিত স্বার্থের বা ব্যবসায়িক, ভৌমিক ও সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের মূলোচ্ছেদ করে সমতার ভিত্তিতে গঠিত শ্রমিক-রাষ্ট্রের শাসনাধীন সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থাকে তিনি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতেও পারেন নি। তাঁর বহু রচনাতেই তার প্রমাণ আছে। তিনি সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্ব-কল্যাণের দিক থেকেই রাশিয়াকে

দেখেন, তার বেশী আর কিছু দেখার মতো মানসিকতা তখন তাঁর ছিল না। মস্কো থেকে জার্মাণী হয়ে তিনি যান আমেরিকায়। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট হুভার তাঁকে অতিথিরূপে গ্রহণ করেন এবং আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতে তাঁর সম্বর্ধনায় বিরাট একটি ভোজ-সভার অনুষ্ঠান হয়। বোষ্টন ও নিউইয়র্কে ছবির প্রদর্শনী সেরে তিনি আসেন ইংলণ্ডে। সেখান থেকে এলেন দেশে ফিরে।

১৯৩১ সালে কবির বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে সমস্ত দেশের পক্ষ থেকে তাঁকে সমারোহময় এক 'জয়ন্তী উৎসবে' সম্বর্ধিত করা হয়। এই উপলক্ষে বাংলার বিখ্যাত কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন যে অভিভাষণ, তার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে সারা দেশের মর্মবাণী :

'কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি, জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন, আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক। বাণীর দেউল আজ গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণ কল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা, তোমার মধ্যে আজ সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের সঙ্গে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। হাত পাতিয়া জগতের কাছে চাহিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক। হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকেও আজ নতশিরে বারংবার নমস্কার করি।'

এই উপলক্ষে বাংলার বিদ্বৎ সমাজের পক্ষ থেকে কবির জীবন ও সাহিত্য, সাধনা ও আদর্শ ব্যাখ্যা করে এবং কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রকাশিত হয় 'জয়ন্তী উৎসর্গ' নামে একখানি বই। বিশ্বের বিভিন্ন সভ্য দেশ থেকে বরেণ্য পণ্ডিতরাও এই উপলক্ষে পাঠান আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্ঘ্য। 'Golden

Book of Tagore' বইয়ে তা গ্রথিত হয়। এই সময়ে কবি তাঁর সমগ্র জীবনের ব্রত ও সাধনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে, আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যে প্রত্যভিভাষণ দেন, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নীচে এই অভিভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

'অনেক দিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে, নানা অবস্থায়। সুরু করেছি কাঁচা বয়সে, তখন নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিষ ভূরি ভূরি আছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে, আশা করি, তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদন, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে, একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি। তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি, অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে। এখানে সবদেশ, সবজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নর-দেবতা, তাঁরি বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার, আর ভেদবুদ্ধি স্খালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি। * * *

মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠ দান প্রীতি আমি পেয়েছি, একথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েছি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে। আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক। আর আমার স্বদেশের লোক যাঁরা অতি নিকটের, অতি পরিচয়ের অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালোবাসতে পেরেছেন, তাঁদের সেই ভালোবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি!'

= ৬ =

(১৯৩১—৪১)

পঞ্চাশ থেকে সত্তর, এই কুড়ি বৎসর হল রবীন্দ্রনাথের পরিব্রাজক জীবন। এই সময়ের ভেতর তিনি এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই এক বার নয়, বার বার গেছেন, এবং জ্ঞানে-কর্মে শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মাননা লাভ করেছেন। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ এই কুড়ি বৎসরের জীবন তাঁর সীমাবদ্ধ দেশের ভেতর এবং সে-জীবন দেশের জ্ঞান ও কর্মের সমস্ত ক্ষেত্রকে আপ্লুত করে। জমিদারী তদারক থেকে তিনি লক্ষ্য করেন দেশের জনসাধারণের বাস্তব অবস্থা, তাঁদের কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শোচনীয় দশা এবং তার উন্নয়নে একই সঙ্গে নিয়োগ করেন তিনি তাঁর লেখনী ও কর্ম-শক্তি। পত্রিকা সম্পাদক রূপে সাহিত্যের সকল বিভাগকে তিনি একাই সমৃদ্ধ করেন নিত্য নানা সম্পদে এবং অনুবর্তী লেখকদের উৎসাহিত করেন নব নব পথে লেখনী চালনা করতে। গায়ক ও বক্তারূপে দেশের জন-মনে আশা, উদ্দীপনা ও জাগরণী সঞ্চার করেন তিনি, আবার রাজনীতিজ্ঞ রূপে স্বদেশী আন্দোলনে নেন দায়িত্বশীল নেতৃত্ব। সমবায় সমিতি স্থাপন, স্বদেশী সমাজ গঠন, বিদেশী শাসনে ম্রিয়মান জাতির মধ্যে আত্ম-চেতনা সঞ্চারের জন্যে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা, শিল্পে বাণিজ্যে দেশকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে তোলা, নানা পথে প্রবাহিত করেন তিনি তাঁর মননশীলতা ও কর্ম-শক্তি। কংগ্রেস, বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষৎ, ব্রাহ্মসমাজ, এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাঁর সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত না হন। এরই সঙ্গে পত্নী এবং পুত্র-কন্যাদের নিয়ে যথারীতি সংসারও করেছেন তিনি। কন্যাদের যোগ্য পাত্রে বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে পাঠানো, পীড়িত পত্নীকে যথাবিধি সেবা করা, কোন কাজেই কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না তাঁর। এ ছাড়াও করেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং আপন আদর্শে দেশের ভাবী বংশধরদের গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন স্বহস্তে।

এই বিশ বৎসর রবীন্দ্র-জীবনের সর্বাপেক্ষা কর্মবহুল ও বহুমুখী অধ্যায়। যদি এই খানেই তাঁর জীবনান্ত হত, তাহলেও তিনি বাংলার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে চিরস্মরণীয় হতেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য-বিধাতা তাঁকে বৃহত্তর সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাই এই সময়ের মধ্যেই তাঁর তথাকথিত সংসার-বন্ধনগুলি একে একে শিথিল হয়ে যায়। বৈষয়িক আকর্ষণ-বিকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে, নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেওয়ার সুযোগ পান তিনি তাঁর সাধনায়। শান্তিনিকেতন, যা পরে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়, তাঁর সেই সাধনার বেদী। এই বিশ্বভারতীই তাঁকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় বৃহত্তর জীবনের ভেতর। বাইরের পৃথিবী এখান থেকেই করে তাঁকে আকর্ষণ এবং তিনিও বাইরের জগৎকে এনে কেন্দ্রীভূত করেন এখানে, 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'।

পঞ্চাশ থেকে সত্তর, এই পরবর্তী কুড়ি বৎসরের জীবন তাঁর পরিব্যাপ্ত বাইরের দুনিয়ায়। এই সময়ের মধ্যেই তিনি বিশ্বজয় করেন। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর এই দিগ্বিজয় সম্বন্ধে বলেছেন,

'From continent to continent, country to country, capital to capital, he has passed as a vision of light, East and West rendering him the obeisance due to a World-Teacher. It has been a royal progress and Rabindranath has moved like a king, a king of all hearts, playing with wizard fingers upon the heart-strings of the nations. The great ones of the world have vied with one another in doing him all possible honour, learned and intellectual men have received him as a leader and the universities have opened wide their doors in scholastic welcome, men and women have jostled one another for a sight of this poet and prophet of the East.'

কবির এই গরিমাময় দিগ্বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা পূর্বেই বিবৃত করেছি। এই গরিমা কবি শুধু নিজের জন্যে আহরণ করেন নি, সমস্ত ভারতবাসীর হয়ে তিনি বিশ্বের দরবারে করেছেন প্রতিনিধিত্ব এবং পরাধীন ও মর্যাদাহীন জন্মভূমিকে চিরদিনের মতো স্মরণীয় ও বরণীয় করেছেন বিশ্ব-সংস্কৃতির

ইতিহাসে। এই বিশ্ব-বিজয়ের ফসল তিনি এনে সঞ্চিত করেছেন তাঁর বিশ্বভারতীতে, যেখানে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন প্রাচ্যের প্রাণ-ধর্মকে এবং প্রতীচ্যের বিজ্ঞান-বোধের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটিয়েছেন। জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, চীন, আমেরিকা, বহিঃপৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেশ থেকেই কবি, কর্মী ও শিক্ষা-নায়কেরা এসে মিলিত হন কবির এই জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে। এণ্ডরুজ, পিয়ার্সন, লেভি, উইনটারনিৎস ফরমিকি, ওকাকুরা, তান-য়ূন-সান প্রমুখ ব্যক্তিরা বিশ্বভারতীর কর্মীরূপেই পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছেন। শ্রীনিকেতন শিল্পবিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সহায়ক রূপে বিখ্যাত হয়েছেন এলমহার্স্ট। আরো কত গুণী, জ্ঞানী ও বরেণ্য অতিথি যে এখানে এসেছেন, তার খবর অনেকেই রাখেন না।

প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কর্ম-জীবনের এইখানেই শেষ। জয়ন্তী উৎসবের পর তিনি আর একবার মাত্র বাইরে বেরিয়েছেন। পারস্য থেকে রেজাশা পহলবী তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। সিরাজ, ইস্পাহান, তেহারাণ ঘুরে তিনি বোগদাদে ইরাকের রাজা ফৈজলের আতিথ্য গ্রহণ করেন। পারস্যে এবং ইরাকে কবির জন্মোৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। রাশি রাশি সুগন্ধী গোলাপে কবিকে সমাবৃত করে, গীতে বাদ্যে আবৃত্তিতে তাঁরা তাঁকে যে ভাবে সমাদৃত করেন, তার স্মৃতি সানন্দে লিপিবদ্ধ করেছেন কবি তাঁর পারস্য ভ্রমণে। এর পর অবশিষ্ট দশ বৎসর কবির অতিবাহিত হয়েছে শান্তিনিকেতনে এবং অনেকটা নিবিষ্ট সাধনাতেই। বলা দরকার যে, প্রত্যক্ষ জীবন থেকে এই অধ্যায়েও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখেন নি। যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে, দেশ তাঁকে স্মরণ করেছে, তিনিও সেখানেই দিয়েছেন সাড়া। ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে কারাগারে গান্ধী মৃত্যু-পণ অনশন সুরু করলে, কবি জারবেদা জেলে স্বয়ং উপস্থিত হন এবং তাঁর সাক্ষাতেই গান্ধী অনশন ভঙ্গ করেন। ঐ বৎসরেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হয়ে কমলা লেকচার দেন এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দেন স্যার কৃষ্ণস্বামী আয়ার বক্তৃতা। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, নানা স্থান থেকেই তাঁর আমন্ত্রণ আসে এবং সর্বত্রই তিনি বক্তৃতা দেন ও বেশীর ভাগ স্থলেই তাঁকে সম্মানাত্মক ডক্টর অব লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৩৩ সালে বোম্বাইয়ে, ১৯৩৪ সালে

সিংহলে, ১৯৩৫ সালে পাঞ্জাবে, ১৯৩৬ সালে দিল্লী, এলাহাবাদ ও পাটনায় তিনি শান্তিনিকেতনের ভ্রাম্যমান অভিনেতাদের নিয়ে তাঁর 'শাপ মোচন', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি নৃত্য-নাট্যের অভিনয় করান এবং সর্বত্রই এই উদ্যোগ প্রভূত সমাদর লাভ করে। বৃদ্ধ কবিকে এই সমস্ত নাট্যাভিনয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর ধন-ভাণ্ডারের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত দেখে, গান্ধী ব্যথিত হন এবং তাঁর অনুরোধে 'জনৈক অজ্ঞাত-নামা ভদ্রলোক' কবিকে ষাট হাজার টাকার একখানি চেক উপহার দেন।

কবি যে শুধু অর্থ সংগ্রহের জন্যেই এত ঘোরাফেরা করতেন তা নয়। তাঁর অন্তরে ছিল তীব্র ভ্রমণের নেশা। তার ওপর সমস্ত ভারতই তাঁকে ডাকত প্রতিনিয়ত, ছোট বড় যে কোন উপলক্ষে। তাই পূর্ণ বার্ধক্যের প্রসন্ন অবকাশ তিনি ভোগ করতে পারেন নি একদিনও। আজ এখানে, কাল ওখানে, তাঁকে ছুটে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। অবশ্য শাখায়-পল্লবে বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ড দিনে দিনে অসম্ভব রকম প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়ায়, প্রতিষ্ঠানটি বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেও কবিকে বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয়। তাঁর এই ঘোরাফেরার সে-ও একটা কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা গৌণ, মুখ্যত ভ্রমণ ও সংস্কৃতি বিতরণই টানত তাঁকে প্রবলভাবে

সবাই দেখেছেন, পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও কবির স্বাস্থ্য, স্মরণ-শক্তি এবং সাহিত্য-সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তিনি একাদিক্রমে তখনো লিখে চলেছেন রাশি রাশি কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও নাটক-নাটিকা। 'শাপ মোচন' ও 'তাসের দেশের' কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ', 'কালের যাত্রা,' 'বাঁশরী', 'চণ্ডালিকা,' 'চার অধ্যায়', তাঁর শেষ জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট রচনাগুলি সবই লিখিত ও প্রকাশিত হয় তাঁর পঁচাত্তর বৎসর বয়সের মধ্যে। এ ছাড়া অজস্র ছবি আঁকেন তিনি এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কত যে প্রবন্ধ ও চিঠি-পত্র লেখেন, তার ষোল-আনা খতিয়ান আজো তৈরি হয় নি। পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও এই রকম উদ্যম, কর্ম-শক্তি এবং শিল্পসেবায় এতখানি তন্ময়তার দৃষ্টান্ত যে-কোন দেশেই দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ শুধু অসামান্য প্রতিভা নিয়েই জন্মাননি, তাঁর স্বাস্থ্যও ছিল অসাধারণ। তাঁর নিজের ভাষায়, "বার্ধক্য তাঁর উপরে শুভ্র একটি মোড়কের মতো হয়ে ভিতরের তাজা প্রাণকে

চির-সজীব রেখেছিল'। আরো উল্লেখযোগ্য যে কবি এই বয়সেও সাহিত্যে নূতন নূতন পথ সন্ধান করেছেন, নূতন নূতন আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। গদ্য কবিতা, নৃত্যনাট্য, নূতন ধরণের ছড়া, বাংলা ভাষায় আনেন তিনিই এবং সে এই বয়সে।

চার অধ্যায় উপন্যাসটি নিয়ে দেশে বেশ একটু হৈ-চৈ হয়। এই বইয়ের গল্পাংশে বৈপ্লবিক কর্ম-ধারার বিরোধিতা এবং সূচনায় ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য অনেকের ভালো লাগে নি। কিন্তু সে যাই হক, এই বইয়ে ভাষার যে বলিষ্ঠতা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর নিজস্বতা দেখা যায়, তা কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। এমন কি, অনেকের মতে চার অধ্যায়ই তাঁর শেষ বয়সের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

১৯৩৭ সালে হঠাৎ কবির স্বাস্থ্যভঙ্গ হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বক্তৃতা সেরে তিনি যান আলমোড়ায় গ্রীষ্ম যাপন করতে। সেখানে তিনি 'বিশ্ব পরিচয়' নামক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছোট্ট বইটি রচনা করেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে যখন ব্যাপৃত আছেন বর্ষামঙ্গল উৎসবের আয়োজন নিয়ে, আকস্মিক ভাবে তিনি হন বিসর্প রোগে আক্রান্ত এবং কয়েক দিন সম্পূর্ণ সংজ্ঞানহীন হয়ে থাকেন। সৌভাগ্য বশত শীঘ্র সেরে উঠলেন তিনি, কিন্তু শরীর আর তাঁর ভালো হল না। স্বাধীন ভাবে চলাফেরা ও যদৃচ্ছ পরিশ্রম করা তখন থেকেই তাঁকে আনতে হল কমিয়ে। অবশিষ্ট যে ক-বছর বাঁচেন তিনি, সে সময়টা মোটের ওপর শান্তিনিকেতনেই কাটান তিনি। শুধু গ্রীষ্মে একবার করে যেতেন কালিম্পং শৈলাবাসে, নয়ত পুজোয় অন্য কোথাও। আর মাঝে মাঝে আসতেন কলকাতায়। কি শান্তিনিকেতনে, আর কি কলকাতায় বিখ্যাত রাজনীতিক নেতারা এবং বিশিষ্ট সাহিত্যব্রতীরা অনেকেই যেতেন তাঁর কাছে নানা বিষয়ে আদেশ-নির্দেশ নিতে, তাঁর বাণী শুনতে, তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। বার্ধক্যের সেই পরিণত অধ্যায়েও কিন্তু কবির লেখনীর বিরাম ছিল না। রোগকালীন সংজ্ঞাহীনতার অনুভূতি নিয়ে তিনি লেখেন 'প্রান্তিক' কবিতা গ্রন্থ, তারপর প্রকাশিত হয় 'বাংলা ভাষা পরিচয়' প্রবন্ধ, 'সেঁজুতি', কবিতার বই এবং 'মুক্তির উপায়' নাটিকা।

উন-আশী বছরে কালিম্পং শৈলাবাসে থাকা কালে তিনি আর একবার গুরুতর ভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন। চিকিৎসার্থে তাঁকে কলকাতায় আনা হল এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে তিনি ফিরলেন শান্তিনিকেতনে। এর কিছু আগে

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডি-লিট উপাধিতে সম্মানিত করবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও অপচিত স্বাস্থ্যের দরুণ কবির পক্ষে বাইরে যাওয়া অসম্ভব হওয়ায়, প্রতিনিধির সাহায্যে শান্তিনিকেতনেই তাঁরা অতিরিক্ত সমাবর্তনের ব্যবস্থা করিয়ে এই উপাধি বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে স্যার মরিস গায়ার এবং ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ অক্সফোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন। স্যার মরিস গায়ার এই অনুষ্ঠানে কবিকে অভিনন্দিত করেন ল্যাটিনে এবং কবি প্রত্যাভিনন্দন দেন সংস্কৃতে। যুদ্ধের হানাহানিতে সমস্ত জগৎ যখন উদ্‌ভ্রান্ত, বিশ্বশান্তির অগ্রদূত কবিকে তখনো বাড়ী এসে সম্মানিত করে যাওয়ার ঘটনা এ যুগের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যেমন থাকবে জার্মান আক্রমণে প্যারিসের পতনের রাত্রেও বেতারে 'ডাকঘর' নাটকের ফরাসী অনুবাদ অভিনয়ের ঘটনা। দ্বিতীয় অসুস্থতার অল্প আগে কবি তাঁর প্রথম বয়সের ঘটনা নিয়ে ছোটদের উপযোগী করে 'ছেলেবেলা' নামে আত্ম-কাহিনী লেখেন। এ ছাড়া রোগ মুক্তির পর প্রকাশিত হয় তাঁর আরো তিন খানি বই। 'রোগ শয্যায়,' 'আরোগ্য', 'তিন সঙ্গী'। এর মধ্যে প্রথম দুটি কবিতার ও শেষটি গল্পের সংগ্রহ।

দ্বিতীয় বার অসুস্থতার পর থেকেই আস্তে আস্তে কবি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। বাংলা ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে তাঁর বয়স আশী পূর্ণ হয়। অন্যান্য বারের চেয়ে এবার অধিকতর সমারোহে তাঁর জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হল, কিন্তু কবি আর সুস্থ দেহে উৎসবে যোগ দিতে পারলেন না। বিস্ময়ের কথা তাঁর মননশক্তি ও সাহিত্য-প্রতিভা তখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। নিজে হাতে তিনি তখন আর কলম ধরতে পারেন না, শুয়ে শুয়ে মুখে মুখে বলে যান এবং তাঁর সেবক ও সহকারীরা তা লিখে নেন। এই ভাবেই বৈশাখ মাসের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রদত্ত 'সভ্যতার সঙ্কট' নামক প্রসিদ্ধ অভিভাষণ রচিত হয়। 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থ এবং 'গল্পসল্প' ছোটদের ছড়া ও গল্পের বই রচনার ইতিহাসও তাই। এই দুটি বই-ই প্রকৃতপক্ষে কবির শেষ রচনা। এরপর তিনি লেখেন মাত্র একটি দুটি প্রবন্ধ, নয়ত কবিতা, আর লেখেন বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিসেস রাথবোন ভারতবাসী সম্বন্ধে যে কটূক্তি করেন, তার প্রতিবাদে একটি বিবৃতি।

শ্রাবণের মাঝামাঝি তাঁকে আনা হয় কলকাতায়। মূত্রগ্রন্থির বিকলতায় তিনি তখন নিরতিশয় কাতর। চিকিৎসকরা তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করলেন

৩০শে জুলাই। তাঁর ক্ষত প্রায় সেরেই এসেছিল। অনেকে আশা করেছিলেন যে হয়ত এবারও তিনি সেরে উঠবেন। কিন্তু পয়লা আগষ্ট থেকে হঠাৎ নাড়ীর গতি খারাপ হয়ে পড়ে এবং উত্তরোত্তর রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠতে থাকে। প্রায় তিন দিন সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন থাকার পর ৭ই আগষ্ট, ১৯৪১ (বাংলা ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮) বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা-১৩ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি কারোকে কিছু বলে যেতে পারেন নি। তাঁর কন্যা মীরা দেবী, পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, সবাই মৃত্যুকালে তাঁর কাছে ছিলেন। ছিলেন অগণ্য সুহৃদ, সহকর্মী ও সেবক। তাঁরা শুধু শোনেন সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে কবিকে মাত্র একবার বলতে, 'কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছিনে'! সে কি যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, অথব বিশ্বভারতীর পরিণাম সম্বন্ধে, অথবা আসন্ন মৃত্যুর মুখে নিজের অনিশ্চিত গন্তব্য সম্বন্ধে উদ্বেগ? কে জানে শেষ মুহূর্তে তাঁর অন্তরে আলোড়িত হয়েছিল কিসের দুর্ভাবনা!

অস্ত্রোপচারের দিন সন্ধ্যায় একটি কবিতা মুখে মুখে রচনা করেছিলেন তিনি। তাতেও এই অনিশ্চয়ের সুরই ধ্বনিত হয়েছে। সেই কবিতাটির সুরু এই রকম:

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী,
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।

কবির বরাবরই ইচ্ছা ছিল, তাঁর আপন হাতে-গড়া শান্তিনিকেতনে অনাড়ম্বর ভাবে সম্পন্ন হবে তাঁর শেষ কৃত্য। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি বলেন যে জনগণের অভিপ্রায় অনুসারেই যেন একাজ করা হয়। তাই নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁর পার্থিব দেহ নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েক লক্ষ শোকমগ্ন নর-নারী বিনম্র স্তব্ধতায় তাঁর শবানুগমন করেন। আর তাঁদের চোখের সামনেই কবির নশ্বর দেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যায় আস্তে আস্তে।

শান্তিনিকেতনে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয় এবং যথাসম্ভব সরল শুচিতার সঙ্গেই সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে একটি গান কবি নিজেই চিহ্নিত করে যান তাঁর শ্রাদ্ধ-বাসরে গাওয়ার জন্মে। সেই গানটি এই :

সম্মুখে শান্তি পারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী,
লহ লহ হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতি ধ্রুব তারকার॥
মুক্তিদাতা তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া,
হবে চির পাথেয় চিরযাত্রার॥
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার॥

দ্বিতীয় স্তবক

রবীন্দ্র সাহিত্য

রবীন্দ্র সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনার গোড়ায় তাঁর বাল্য রচনা সম্বন্ধে বোধহয় দু-চার কথা বলা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা বলতে বহুদিন পর্যন্ত 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ভানুসিংহের পদাবলী' কবিতার বই, 'বৌঠাকুরাণীর হাট', উপন্যাস, 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রবন্ধ এবং 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য বোঝাত। কারণ রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত রচনার একেবারে গোড়ার পর্বের নিদর্শন হিসাবে এই গুলিই পাওয়া যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম রচনা নয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য রচনা সুরু করেন মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে, আর তখন থেকেই তাঁর রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে থাকে। সেইখান থেকে সুরু করে উপরের পর্ব পর্যন্ত আসার মধ্যে তিনি লেখেন কবিকাহিনী (১৮৭৮), বনফুল ১৮৮০), ভগ্নহৃদয় (১৮৮১), রুদ্রচণ্ড (১৮৮১), করুণা (১৮৮১), বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩), নলিনী (১৮৮৪), কালমৃগয়া (১৮৮৪) ও শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৪)। এর মধ্যে প্রথম তিন খানি কাব্য-কাহিনী, চতুর্থ খানি নাট্যকাব্য, পঞ্চম বইখানি উপন্যাস, বিবিধ প্রসঙ্গ প্রবন্ধ সঙ্কলন এবং অবশিষ্ট দুখানি যথাক্রমে গদ্যনাটিকা ও গীতিনাট্য, আর সবশেষ খানি গীতিকবিতা ও গাথার সমষ্টি। এই সব বই কবি লেখেন চোদ্দ থেকে আঠারোর মধ্যে এবং এর ভেতর 'করুণা' ছাড়া আর সবগুলিই পরের পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'করুণা' শুধু 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় কিছুদিন প্রকাশিত হয়েই বন্ধ হয়ে যায়। এই জায়গায় বলে রাখা যেতে পারে যে 'বনফুল' প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক একটি পুরাতন মাসিক পত্রে, 'ভগ্নহৃদয়' ও 'কবিকাহিনী' ভারতীতে, অবশিষ্ট গুলির মধ্যে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধ সমূহও ভারতীতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। আর সবগুলিই একেবারে বই আকারে বের হয়।

এই পর্যায়ের রচনাবলী কবি পরে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেন। এমন কি 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' দিয়ে যে পর্বের সুরু, তার পুনঃপ্রকাশও তাঁর অনভিপ্রেত ছিল। ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'আমার অল্প বয়সের যে সকল রচনা স্খলিতপদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয়নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার। · যে কবিতাগুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি, তার দ্বারা আমাকে দায়ী করলে আমার কোন নালিশ থাকে না। বন্ধুরা বলেন ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি লেখা যখন থেকে কবিতা হযে উঠেছে, তখন থেকেই তার ইতিহাস।···'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ছবি ও গান' এখনো বই আকারে চলছে একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। ঐ তিনটি কবিতা গ্রন্থের আর কোন অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ, লেখাগুলি কবিতার রূপ পায়নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখী হয়ে ওঠেনি এটাতে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু পাখী বললে দোষ দিতেই

হবে। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। 'কড়ি ও কোমলে' অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে, কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূ-সংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। তারপর 'মানসী' থেকে আরম্ভ করে বাকী বইগুলির কবিতায় ভালো-মন্দ-মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।'

বলা বাহুল্য কবির এ মন্তব্য এক হিসাবে সত্য। কিন্তু যে রচনাবলী ভূ-প্রোথিত ভিত্তি রূপে রবীন্দ্র সাহিত্যের সমগ্র ইমারতটি ধারণ করে রয়েছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচকের কাছে তার মূল্য কম নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চেতনা কিভাবে জন্মাল, কোন সোপান-পরম্পরা আশ্রয় করে তার বিকাশ হল, তা না জানলে তাঁর প্রতিভার আন্তর পরিমাণ হয় না। সেইজন্যই 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' পর্যন্ত নয়ই, তার আগের পর্বকেও বিনা পরীক্ষায় বাতিল করা যায় না। আনন্দের বিষয় এই বাল্য রচনাগুলি একত্র করে ইদানীং 'রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে 'ভারতী'তে প্রকাশিত কবির 'মেঘনাদ বধ কাব্য সমালোচনা', গেটে ও তাঁর প্রণয়িনীগণ 'স্যাক্সন ও নর্ম্যান সাহিত্য' এবং অসমাপ্ত 'করুণা' উপন্যাস ছাড়া কবির সমস্ত বাল্য রচনাই কালানুক্রমে গ্রথিত হয়েছে।

কাব্য-কাহিনী ও নাটক-নাটিকাগুলির কথাই আগে বলি। 'বনফুল' 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়' তিনটিই হল হতাশ প্রণয়ের কাহিনী। একটি তরুণ ও একটি তরুণীর ঐকান্তিক ভালোবাসা কি ভাবে সমাজের বাধা অতিক্রম করতে না পেরে ব্যর্থ হল, তারই গল্প এই তিনটি বইয়ে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে এখানে প্রত্যাশা করার কিছু নেই। বাস্তব জ্ঞান বা গভীর জীবন-বোধও এতে অপ্রত্যাশিত। কিন্তু এই অপরিণত বয়সের রচনাগুলির প্রকৃতির সঙ্গে কবি-মনের সুনিবিড় যোগসূত্রটি স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

মানব-সংসারে আছে অবিচার, অত্যাচার, অনৈক্য। জীবনের সহজ প্রশান্তিকে তা নিত্য প্রতি মুহূর্তে বিনষ্ট করে। কিন্তু প্রকৃতির বুকে রয়েছে অগাধ শান্তি, অসীম মমতা, তাই সংসার বিরাগী কবি-মন খুঁজেছে প্রকৃতির সান্নিধ্য, তার ভেতর ডুব দিয়ে ভুলতে চাইছে মানুষের যা-কিছু বাধা-বঞ্চনা। কিন্তু সংসার শুনবে কেন? সে তার অনতিক্রমণীয় কর্ম-জাল বিস্তার করেই টানছে মানুষকে। শেষে মৃত্যু এসে দিচ্ছে তাকে পরম শান্তি ও চরম সমাধানের নির্দেশ। এই হল মোটামুটি তাঁর তিনখানি কাব্যের এবং 'রুদ্রচণ্ড' নাট্যকাব্যেরও মূল বক্তব্য।

'শৈশব সঙ্গীত' কবিতা-সংগ্রহটির কোন কোন রচনাতেও একই বক্তব্যের সাক্ষাৎ পাই। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

সাধের পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার,
প্রাণের পাখীটি উড়িয়া যাক।
সে যে হেথা গান গাহে না,

সে যে মোদের আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে বুঝি সে
শুনেছে কাহার ডাক।
যে যায় সে যায় ফিরিয়া না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়,
মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদর সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।

এই কবিতা সংগ্রহে এবং ভগ্নহৃদয়ে কিছু সংখ্যক গান আছে। গানগুলি রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীদের অপরিচিত নয়, কিন্তু অনেকেই জানেন না হয়ত যে এরা কবির কৈশোরের রচনা। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান হল : 'নলিনী খোল গো আঁখি', 'বলি ও আমার গোলাপ বালা', 'কেন গো সাগর এমন চঞ্চল', দেখে যা লো 'তোরা সাধের কানন মোর'। এই সমস্ত গানে এবং কতকগুলি গাথা কবিতায়, যেমন 'লীলা', 'ভগ্নতরী', ও 'ফুলবালা'য় ভাবী রবির অরুণাভাস লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁর পরবর্তী নব সঙ্গীত কবিতা ও গাথা কবিতার আদি মৃত্তিকা কোথায়, তা-ও বোঝা যায়। যেমন :

নাচিছে ছুটিছে গাহিছে খেলিছে
শত আঁখি তার পুলকে জ্বলিছে,
দিনরাত নাই কেবলই চলিছে,
হাসিছে খল খল।
তরুণ মনের উচ্ছাসে অধীর,
ছুটেছে যেমন প্রভাত সমীর
ছুটেছে কোথায়? কে জানে কোথায়?
তেমনি তোরাও আয় ছুটে আয়,
তেমনি হাসিয়া, তেমনি খেলিয়া,
পুলকে উজল নয়ন মেলিয়া,
হাতে হাতে বাঁধি করতালি দিয়া
গান গেয়ে তুই চল!

অবশ্য এ রকম জম-জমাট ভাবটি এই বয়সের রচনায় তাঁর খুব বেশী পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগ লেখাতেই একটা ভাবী সম্ভাবনার দূরবর্তী কাকলি শোনা যায় মাত্র।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ গদ্য কি রকম লিখতেন, অনেকের তা জানার কৌতূহল থাকতে পারে। চলতি গদ্যের নিদর্শন মিলবে তাঁর ইউরোপ প্রবাসীর পত্র বইয়ে, আর সাধু গদ্যের লক্ষণীয়

নিদর্শন হল 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র রচনাগুলি। এই বইয়ের যে রচনাটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি, তার নাম 'জগৎ-পীড়া': 'জগৎ একটি প্রকাণ্ড পীড়া। অবস্থাকে পরাভূত করিবার জন্য স্বাস্থ্যের প্রাণপণ চেষ্টাকে বলে পীড়া। জগৎও তাহাই। জগৎও অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া উঠিবার জন্য আত্মার উদ্যম, অভাবকে দূর করিবার জন্য পূর্ণতাকাঙ্ক্ষার উদ্যোগ, সুখ পাইবার জন্য অসুখের যোঝা-যুঝি, জীবন পাইবার জন্য মৃত্যুর প্রসব। জগতের প্রত্যেক পরমাণু পীড়া, কিন্তু সেই প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে স্বাস্থ্যের নিয়ম সঞ্চারিত হইতেছে। এই নিয়ম বর্তমান না থাকিলে জীবন থাকিতে পারে না। অতএব এই জগতের যে চেতনা তাহা পীড়ার চেতনা।'

এই সমস্ত বাল্যরচনার মধ্যে দিয়ে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা শুরু থেকেই ছিল সর্বতোমুখী এবং সমস্ত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সীমানা অতিক্রম করে আপন ঈপ্সিত পথে এগিয়ে যাওয়ার মতো প্রভূত প্রাণ-শক্তি ছিল তাঁর জন্মগত। কাব্যে, গানে, নাটকে, গীতিনাট্যে, উপন্যাসে, গল্পে প্রবন্ধে, নিবন্ধে, সাহিত্যের সমগ্র ভুবন যিনি একাই সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করে গেছেন, তাঁর সেই বিরাট সম্ভাবনার প্রকৃতির অন্তঃস্রোতটি না জানলে, তাঁর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন তাই কি ক'রে সম্ভব?

এই সমস্ত বাল্য রচনার সঙ্গে পরিণত কালের রবীন্দ্র-রচনার প্রাণগত আত্মীয়তা কোনখানে, তা পরবর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনায় উদ্‌ঘাটিত হবে। এখানে শুধু একটা কথা বলে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে, তাঁর প্রতিভার সামগ্রিক রূপটিই আমাদের আগে বুঝতে হবে, তারপর সেখান থেকে রওনা হতে হবে তাঁর কীর্তির বিভিন্ন বিভাগে। কারণ এটা স্মরণ রাখা দরকার যে সাহিত্য সৃষ্টির এক-একটা বিভাগে তাঁর সমান বা তাঁর চেয়ে বড় প্রতিভা পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ না হলেও, সমগ্র ভাবে তাঁর দোসর কোন দেশে ও কোন যুগেই জন্মান নি।

— ১ —

কবিতা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের একখানি চিঠিতে বলেছেন, জীবন বিধাতা আমাকে কর্ম-সাধনার অনেক বিভাগে হাত লাগাতে বাধ্য করলেও, আমার শেষ বিচার হবে বোধ হয় কবি রূপেই। কারণ এই রূপেই হয়েছে আমার পরম প্রকাশ। বাস্তবিকই কবি হিসাবে তাঁর যত বড় পরিচয়, এত বড় বোধ হয় আর কোন হিসাবে নয়।

তাঁর প্রথম উল্লেখ যোগ্য কবিতার বই সন্ধ্যাসঙ্গীত যখন প্রকাশ হয়, তখন তাঁর বয়স সতেরো আঠারো, আর তাঁর জীবন কালে প্রকাশিত শেষ কবিতার বই জন্মদিনে যখন বেরোয়, তখন তিনি আশীতে পা দিয়েছেন। এই দীর্ঘ সময় জুড়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় তিনি যত কবিতা লিখেছেন, পৃথিবীর কোন কবির রচনা পরিমাণে ও বৈচিত্র্যে তার পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে না। সনেট গান গীতি-কবিতা গাথা নাট্য-কবিতা কৌতুক-কবিতা নীতি-কবিতা তত্ত্বব্যাখ্যা ও জীবন-জিজ্ঞাসা মূলক কবিতা, এক কথায় কাব্য সাহিত্যের যতগুলি বিভাগ পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীকৃত, তার প্রত্যেকটিতে হাত দিয়েছেন তিনি এবং কোনটাতেই তাঁর কৃতিত্ব সাধারণ স্তরের নয়। মনে হয়, এর যে-কোন একটা বিভাগ নিয়ে থাকলেই তিনি সমান গণনীয় কবির মর্যাদা পেতেন।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে গান ও কবিতায় রবীন্দ্র রচনার মোট পরিমাণ পাঁচ হাজারের কম নয় এবং তার মধ্যে দিয়ে জগতের এমন কোন অবস্থান্তর নেই, জীবনের এমন কোন কামনা-কল্পনা ও অনুভূতি নেই, সংসারের এমন কোন সঙ্কট-সমস্যা নেই, যা না ভাষা পেয়েছে! রবীন্দ্রকাব্যের এই সুবিপুল পরিধি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বিস্ময়কর এই পর্যাপ্ত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনে ও মননে, অনুভূতি ও উপলব্ধিতে স্রষ্টা-কবির নিত্য নূতন রূপান্তরের ধারাটিও।

মনে রাখতে হবে, মধুসূদন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই যদিও বাংলা ভাষায়

নূতন করে গীতি-কবিতার ধারাটি প্রবর্তন করেন, কিন্তু তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি তাঁরা। তাঁরা না পেরেছেন জড় প্রকৃতিকে প্রাণময়ী রূপে দেখতে এবং মানব-হৃদয়ের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক সূত্র গড়ে তুলতে, না পেরেছেন ব্যক্তি-বোধের সীমাতিক্রম করে সর্বজনের সঙ্গে ভাবানুভূতির সেতু বন্ধন করতে। তাই তাঁদের গীতি-কবিতাগুলি হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাব-কল্পনাহীন বর্ণনা ও বিবৃতি স্বরূপ। এই দশান্তর থেকে বাংলা কবিতাকে উদ্ধার করেন বিহারীলাল এবং তিনিই প্রকৃত পক্ষে আধুনিক লিরিকের প্রথম নির্মাতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদি পথযাত্রার প্রেরণা পান এখান থেকে, তারপর স্বকীয় প্রতিভার দ্যুতিতে যে দিগন্তে এসে উপনীত হন, আমাদের আর কোন কবি তার দিশা পান নি কোন দিন।

রবীন্দ্রকাব্যের এই বিশাল পথ-পরিক্রমার মাত্র প্রাথমিক পরিচয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। একেবারে গোড়ার অধ্যায়টি বাদ দিলে, রবীন্দ্রকাব্যের সমগ্র ইতিহাসকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়: মানসী (১৮৯০) ও সোনার তরীর (১৮৯৩) অধ্যায়, চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালী (১৮৯৬), নৈবেদ্য (১৯০১), খেয়া (১৯০৬) ও গীতাঞ্জলির (১৯১০) অধ্যায়, বলাকা (১৯১৬), পূরবী (১৯২৫) ও মহুয়ার (১৯২৯) অধ্যায় এবং প্রান্তিক (১৯৩৮), নবজাতক (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১) ও জন্মদিনের (১৯৪১) অধ্যায়। পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬) ও শ্যামলী (১৯৩৭), এই চারখানি গদ্য-কবিতার বই আসলে পূরবী ও মহুয়ার এবং প্রান্তিক ও জন্মদিনের মাঝখানে অববাহিকা রূপে অবস্থিত। ওর ঠিক একটা অধ্যায় রূপে গণ্য হতে পারে না।

এই চার অধ্যায়ের প্রথমটিতে কবি প্রকৃতি ও প্রেমের পূজারি। জীবন তখনো তাঁর কাছে আনন্দময় স্বপ্ন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাইরে থেকে দৃষ্টি তাঁর অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে অন্তরের দিকে। নিজেকে তিনি সংসার থেকে সঙ্কুচিত করে নিয়ে উৎসর্গ করে দিয়েছেন তাঁর জীবন-দেবতার কাছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি এই প্রাণচঞ্চল পৃথিবীর মধ্যেই এক বিরাম বিহীন গতির ও আনন্দময় অভিব্যক্তির লীলা অনুভব করেছেন। আর বঞ্চিত মানুষ ও পার্থিব সংসারের বিচিত্র ব্যথা নাড়া দিয়েছে তাঁর অন্তরকে শেষ অধ্যায়ে। রবীন্দ্র-মানসিকতার এই ক্রম-বিবর্তনের কাঠামো চলতি সমালোচনার মাপকাঠি

অনুসারেই নির্ধারণ করা হল। কিছু বিচক্ষণ পাঠকরা জানেন, জগৎ ও জীবন-চিন্তার এই রকমারি দিকের মূল সুর যা, তা নিহিত ছিল তাঁর একেবারে গোড়ার ধাপের বইগুলিতেই, অর্থাৎ সন্ধ্যা সঙ্গীত (১৮৮২), প্রভাত সঙ্গীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪) এবং কড়ি ও কোমলেই (১৮৮৬)। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যের আঙ্গিকে এসেছে দাঢ়া, দৃষ্টির প্রসার বেড়েছে, অন্তর্লোকের গভীরে, আরো গভীরে নেমে গেছেন তিনি। কিন্তু কবি-ধর্ম তাঁর মৌল প্রকৃতিতে আমূল পাল্টে যায় নি। সেই জন্যেই সমগ্র কাব্য-চেতনাকে তাঁর অব্যাহত একটি দার্শনিক পারম্পর্যে বাঁধা যায়। সে দর্শনের কথা বলা হবে অন্যত্র।

এখানে শুধু একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। পশ্চিমী দুনিয়ায় রবীন্দ্রনাথ mystic কবিরূপে প্রসিদ্ধ হলেও, কেবল মাত্র মরমিয়া ভাবুক রূপে তাঁকে দেখা ও দেখানো আদৌ অসঙ্গত নয়। তথাকথিত মরমিয়াবাদের ছায়া হয়ত পাওয়া যাবে তাঁর কোন কোন কবিতায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিশ্বপৃথিবী ও মানব-জীবনের বিচিত্র স্তরকেই তিনি স্পর্শ করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরে তাঁর দৃষ্টি ও মননশীলতা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। আপন দেশ সম্পর্কে তিনি দেশপ্রেমিক, বহিঃপৃথিবী সম্পর্কে বিশ্বপ্রেমিক। শিশু সম্পর্কে তিনি দার্শনিক তত্ত্বদৃষ্টি সম্পন্ন, নারী সম্পর্কে কান্ত ভাবাপন্ন। ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি লীলাবাদী, প্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষতা বাদী। কখনো তিনি চেয়েছেন ব্যক্তি-সংস্রবচ্যুত কল্প-জগতে উধাও হয়ে যেতে, গেয়েছেন দেহাতীত অপার্থিব প্রেমের মহিমা গান। কখনো আবার মর্ত্য জীবনের দুঃখ-বেদনা, অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে ধ্বনিত করেছেন উদাত্ত প্রতিবাদ। কখনো তিনি সংস্কারক, কখনো বিদ্রোহী, কখনো প্রেমিক, কখনো সংশয়ী। এমন শতমুখে পরিব্যাপ্ত কাব্য-প্রতিভাকে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বাঁধা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। কাজেই জীবন-দেবতা বাদ, পতিবাদ, ঔপনিষদিক আনন্দবাদ, বিশ্বমানবতা বাদ, নানা বাদের বিবাদে আবৃত না করে, রবীন্দ্র-কবিতার সহজ অর্থ সহজ করে বোঝাই বোধহয় সব চেয়ে ভালো। কবি নিজেই বলেছেন, মাথা ঘামিয়ে মানে বের করতে কেন চাও কবিতার? মনের স্বচ্ছন্দ অনুভূতিতে যেটা যে অর্থ নিয়ে দেখা দেয় তোমার উপলব্ধির কাছে, সেটা সেই অর্থে সত্যি।

রবীন্দ্রকাব্য-ভুবনের এই যে বিশালতা ও বৈচিত্র্যের কথা বলা হল, এর

সব টুকুই কি রবীন্দ্রনাথের একক সৃষ্টি? কোন অনুপ্রেরণার ঋণ কি নেই তাঁর কাব্যে কাছে? বলা বাহুল্য, তা নয়। তাঁর গানে বাঙালী বৈষ্ণব ও বাউলদের গানের ছায়া আছে। আছে মধ্যযুগীয় সন্ত-সাধকদের অনুপ্রেরণা। শব্দালঙ্কারময় স্বভাবোক্তির কবিতায় আছে ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতের এবং পারমার্থিক কবিতায় উপনিষদের অনুসরণ। এই হল দেশের, আবার বিদেশের প্রভাবও আছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানব-হৃদয়ের অন্তরঙ্গতার বোধ তিনি পেয়েছেন শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে। বার্গসোঁ থেকে পেয়েছেন সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তির ধারায় জগৎ জীবন ও প্রেমের ক্রম-বিবর্তনের দর্শন। তাঁর প্রেম কবিতায় কীটসের, গাথা কবিতায় টেনিসনের এবং নাট্য-কবিতায় ব্রাউনিং-এর প্রভাবও কম-বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে চেষ্টা করলেই। কিন্তু নানা দিক দেশের ও সময়ের ধারা তাঁতে এসে মিশলেও, সব কিছুর সমবায়ে তাঁর জীবন-দর্শন ও কবি-ধর্ম যে অসামান্য স্বকীয়তায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে তিনি সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির মতো স্বয়ং সম্পূর্ণ।

সব শেষে একটা কথা। ইউরোপীয় আদর্শে যে শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক লিরিক আমরা পড়তে অভ্যস্ত, রবীন্দ্র সাহিত্যে তার নিদর্শন একটু কম মেলে। ব্যক্তি-জীবনের দুঃখ-বেদনা আশ্রয় করে সঞ্জীবিত হয়েও তাঁর কাব্যানুভূতি পরিব্যাপ্ত হয় নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বমানবতার উপর, দুঃখ যখন আর দুঃখ থাকে না, জীবন যেখানে গিয়ে মেশে জীবনাতীতে। এ জায়গায় হায়েনে পুস্কিন ভার্লেন র‍্যাবো শেলী এবং ব্রাউনিং নিঃসংশয়ে গীতিকবি হিসাবে আমাদের বেশী কাছের।

— ২ —

নাটক

কবিতার পর রবীন্দ্র সাহিত্যের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিভাগ হল নাটক। নাটকের প্রায় সব শাখাতেই তিনি হাত লাগিয়েছেন একেবারে বাল্য বয়স থেকে এবং যাঁরা পৃথিবীর সাহিত্যে শুধু নাট্যকার রূপেই প্রসিদ্ধ, যেমন সেক্সপীয়ার মলেয়ার ইবসেন শ, রচনার বৈচিত্র্যে ও পরিমাণে তাঁরাও কেউ রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পরেন না।

গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, কৌতুকনাট্য, দ্বন্দ্বনাট্য, সাঙ্কেতিক নাট্য, নৃত্যনাট্য, এক কথায় যত রকম নাটক হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তার সবগুলি নিয়েই পরীক্ষা করেছেন এবং লক্ষণীয় যে দেশের প্রচলিত নাট্য-ধারা থেকে তিনি সহায়তা পেয়েছেন কমই। এই বিচিত্র পথে নাট্য-রীতির পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছে একান্ত ভাবে আপন স্বকীয়তার উপর নির্ভর করে এবং সেই জন্যেই দেশের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে তাঁর কোন নাটকই বিশেষ সমাদরে গৃহীত বা অভিনীত হয়নি। প্রথম আমলে ঠাকুর বাড়ীর ঘরোয়া মঞ্চে এবং পরে বিশ্বভারতীতে তিনি তাঁর নাট্য রচনাগুলি রূপায়িত করেছেন এবং তিনি নিজেই নাট্যকার নট ও ব্যবস্থাপক, একসঙ্গে এই তিন ভূমিকা নিয়েছেন। আসলে তাঁর নাট্য সাহিত্য যে দুর্ধর্ষ স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত, তা-ই বাধা হয়েছে তার সার্বজনীন স্বীকৃতিলাভের পথে।

কিন্তু সে যা-ই হক, রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের শ্রেণী ও স্বরূপ-নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় কথাগুলি এখানে বলা হচ্ছে। মোটামুটি ভাবে রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাহিত্যকে আমরা পাঁচটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগে নিতে হবে গীতিনাট্যগুলি : বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ারখেলা (১৮৮৮)। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে কাব্যনাট্যগুলি : প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), মালিনী (১৮৯৬)। বিদায় অভিশাপ (১৮৯৩) গান্ধারীর আবেদন (১৮৯৭), নরকবাস (১৮৯৭), সতী (১৮৯৭) এবং

কর্ণকুন্তী সংবাদ (১৯০০) প্রভৃতি পঠনীয় নাট্য-কবিতাকেও এই বিভাগেই ধরতে হবে। তৃতীয় ভাগে পড়ে কৌতুক নাট্যগুলি : গোড়ায় গলদ (শেষরক্ষা : ১৮৯২), বৈকুন্ঠের খাতা (১৮৯৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬)। চতুর্থভাগে পড়ে সাঙ্কেতিক নাট্যগুলি : রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), শারদোৎসব (১৯২১), মুক্তধারা (১৯২৫), রক্তকরবী (১৯২৬)। সর্বশেষ বিভাগে গ্রহণীয় নৃত্য-নাট্যগুলি : চণ্ডালিকা (১৯৩৩), তাসের দেশ (১৯৩৩) চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), শ্যামা (১৯৩৯)।

এই দীর্ঘ তালিকায় দেখা গেল, একেবারে কৈশোর থেকে জীবনান্তের দু'বছর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অবিচ্ছিন্ন ধারায় নাটক রচনা করেছেন। এক একটা সময়ে তাঁর মধ্যে এসেছে এক-এক রকম সৃষ্টির জোয়ার এবং তাঁর টানে তিনি একই ধরণের নাট্য রচনা করেছেন পরের পর অনেকগুলি। তারপর নূতন তরঙ্গ এসেছে, পূর্বতন ধারা পরিহার করে তিনি আশ্রয় করেছেন নূতন ধারার। সাহিত্যের আর সব বিভাগের মতো এই বিভাগেও নিত্য নূতনের পথে নিজেকে বিকশিত করার সজীবতাই প্রমাণ করে যে তাঁর সৃজনী প্রতিভা চিরদিন অটুট যৌবনে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কিন্তু অন্তরের ইতিহাস যাই হক, বাইরের ইতিহাসের চলতি হিসাব পরিহার করে চলার উপায় নেই সমালোচকের। সেই চলতি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য ও কৌতুকনাট্য কবি লিখেছেন যৌবনে। রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্য লিখেছেন মধ্য বয়সে, আর নৃত্যনাট্য লিখেছেন শেষ বয়সে। এর মধ্যে গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্যের আদর্শ তিনি আমদানী করেছিলেন বিদেশ থেকে। যে নাটকে গানই একমাত্র প্রকাশের মাধ্যম, গানের পৃষ্ঠে ভর করেই নাটকের আখ্যান-বস্তু গড়ে উঠছে, নাটকের চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হচ্ছে, এমন এক ধরণের নাটক বাংলাতেও ছিল। প্রধানত কৃষ্ণলীলা নিয়েই তৈরী হত সে নাটক। রবীন্দ্রনাথ ধাঁচাটা নিয়েছিলেন সেখান থেকেই। কিন্তু তার আঙ্গিক গড়েছিলেন তিনি বিলেতী মিউজিকাল ড্রামার আদর্শে। বাল্মিকী প্রতিভা এদিক থেকে তাঁর সার্থকতম রচনা। মায়ার খেলার গানগুলি অপূর্ব হলেও, তাদের একের সঙ্গে অন্যের গ্রন্থনা ঢিলে।

নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে বিসর্জন তাঁর সব চেয়ে প্রসিদ্ধ রচনা হলেও এবং নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব তাতে প্রবলতর হলেও, কাব্যগুণে চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ নিঃসংশয়ে উৎকৃষ্টতর রচনা। আর গান্ধারীর আবেদন ও কর্ণকুন্তী সংবাদ প্রকৃতপক্ষে সংলাপাত্মক কবিতা হলেও, শক্তিশালী রচনা হিসাবে বাংলা ভাষায় তা-ও তুলনা রহিত। লক্ষ্য করার বিষয় যে নাট্য কাব্যগুলির প্রত্যেকটিতে মর্মবস্তু রূপে কবি এক-একটি তত্ত্ব আশ্রয় করেছেন। যেমন প্রকৃতির প্রতিশোধে তিনি দেখিয়েছেন সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে সংঘাত। রাজা ও রাণীতে দেখিয়েছেন পুরুষের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে নারীর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ। চিত্রাঙ্গদায় এঁকেছেন যৌবনের স্বপ্নভঙ্গে জেগে-ওঠা নারীত্বের অধিকারের দাবী। বিসর্জনে ফুটিয়েছেন শাসক-শক্তি ও পুরোহিত-শক্তির মধ্যে ক্ষমতাদ্বন্দ্বের পরিণাম। বাংলা ভাষায় পুরাণেতিহাসের বিষয় নিয়ে নাটক লেখা হয় রবীন্দ্রনাথের আগেই এবং নাটকে কাব্য-ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজন মাইকেলই প্রথম অনুভব করেন। তার পর গিরিশচন্দ্র ছন্দোবদ্ধ সংলাপে অনেক নাটক লেখেনও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলির সঙ্গে ঐ সব নাটকের আকৃতি বা প্রকৃতি কোনটাতেই মেলে না। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য প্রথমত কাব্য তারপর নাট্য। জগৎ ও জীবনের, অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির, যে বিচিত্র দ্বন্দ্ব বিচিত্রতর কাব্যের ভাষায় রূপ পেয়েছে এই রচনাগুলির মধ্যে, তা-ই বাদ হয়েছে এদের মঞ্চনাট্য হিসাবে সাফল্যলাভে, আবার কাব্যগৌরবে মহীয়ান হয়েছে এরা এই জন্যেই। বাইরণের ম্যানফ্রেড, শেলীর প্রমিথিউস আনবাউণ্ড, টেনিসনের মডেল্‌ এবং ব্রাউনিং-এর পিপ্পা পাসেস যে জাতের রচনা, এরা তারই সগোত্রীয়।

রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাট্যগুলিও অভিনব এবং এগুলি যে মঞ্চে অতি আদৃত, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে মানুষের যে-সমস্ত খামখেয়াল, বিদঘুটে অভ্যাস, হ্যাকামি বোকামি ও কাপট্য সকল যুগেই মানুষকে কৌতুকের খোরাক জুগিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রঙ্গনাট্যগুলিতে সেই সব প্রবণতাই নানা মানুষের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। কোন দেশাচার বা যুগ-সমস্যাকে বিদ্রূপ করার জন্যে বা কোন ভয়াবহ অন্যায় ও অনৌচিত্যকে উদ্ঘাটিত করার জন্যে যে শ্রেণীর বিদ্রূপাত্মক কঠিন কৌতুকনাট্য লিখেছেন মলেয়ার, শেরিডন অথবা অমৃতলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। তাঁর

বৈকুণ্ঠ গদাই ও অকরুরা আমাদের শুধু আমোদই জোগায়, তার আড়াল থেকে কোন কাজের কথা বলে না। সুর-সুরে মেজাজে লেখা চটুল নাট্য হিসাবে এগুলি তাই বাংলা ভাষায় আজও অনতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশাল নাট্যসাহিত্যের সর্ব শ্রেষ্ঠ অংশ হল তাঁর রূপকনাট্য বা সাংকেতিক নাট্যের বিভাগটি। এর প্রত্যেকটিতে তাঁর ভাষা যেমন শানিত তরবারির মতো মুহুর্মুহু ঝিলিক দেয়, তেমনি যুগ-জীবনের নানা জটিল জিজ্ঞাসাও মাথা তুলে দাঁড়ায় প্রতিটি চরিত্রের কাজ ও কথা-বার্তার মধ্য দিয়ে। ইতিহাস ও পুরাণ মন্থন করে তিনি অতীতের অমৃত পরিবেশণ করেছেন বর্তমানের পেয়ালায় তাঁর নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে। বর্তমানের মাটি থেকে হাসি-তামাসার ফসল সংগ্রহ করেছেন তাঁর কৌতুকনাট্যে। সাংকেতিক নাট্যে তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয়তার বার্তা শুনিয়েছেন এবং তা শুনিয়েছেন এমন এক আগ্রহ জীবন্ত ভাষায়, যা কোনদিন পুরানো হবার নয়।

অচলায়তনে অন্ধ দেশাচারের বন্ধ দুয়ার খুলে মানুষকে উদার আত্ম-মুক্তি সন্ধান করতে বলেছেন তিনি। মুক্তধারায় যন্ত্র-সভ্যতার পীড়নে যন্ত্রে রূপান্তরিত মানুষকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন যন্ত্রের দাসত্ব কাটিয়ে যন্ত্র-প্রভু হয়ে উঠতে। রক্তকরবীতে বণিক সভ্যতার গাণিতিক চক্রাম্বজাল ছিন্ন করে প্রকৃতির অকৃপণ সুষমার মধ্যে হৃদয়কে পরিব্যাপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ডাকঘরে বলেছেন, সীমা দিয়ে ঘেরা এই ছোট্ট প্রতিদিনের জীবনের বাইরে যে বিরাট মহাজীবন পড়ে রয়েছে, তার ডাকে সাড়া দিতে। এক-একটি মহৎ দর্শনকে আশ্রয় করে জন্মেছে এক-একটি নাটক। চরিত্রগুলি এর কোনটাই রক্ত মাংসের মানুষ নয়, এক-একটি মানবায়িত ভাব। তাদের কথা বার্তা ও কাজ কর্মের মধ্যে দিয়ে ভাবের সঙ্গে ভাবের ও মতের সঙ্গে মতের দ্বন্দ্বকেই রূপ দেওয়া হয়েছে। তাই সব সময় নাটকগুলির ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। অভিনয়ে ত অনেকগুলি উত্তীর্ণই হতে পারে না। তবু বাংলা ভাষায় এই পর্যায়ের নাট্যরচনা আর কে করেছেন? মেতারলিঙ্ক হাউপ্টম্যান ও ইয়েটস রচিত সাংকেতিক নাট্যগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলির তুলনায় আলোচনা করা যেতে পারে এবং সে আলোচনায় দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের আসন তাঁদের খুব পরে নয়।

এই আলোচনা থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), শোধ-বোধ (১৯২৬) এবং বাঁশরী (১৯৩৩), এই ক-খানি সামাজিক নাট্যের প্রসঙ্গ বাদ রেখেছি। অভিনয়যোগ্য সুনাটক হিসাবে এগুলির বাজার দর আছে। কিন্তু এই সব নাটক বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যেরাও লিখতে পারতেন। অর্থাৎ রবীন্দ্র প্রতিভার অনস্বীকার্য স্বাতন্ত্র্যে এরা চিহ্নিত নয়। তবু লক্ষণীয় যে এগুলিও একটি বিভাগরূপে বৃহৎ রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে সংযুক্ত হওয়ার দাবী রাখে। নৃত্যনাট্যগুলির বিশেষত্ব তাদের বিষয়বস্তু নৃত্যের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করায়। গান তাতে নৃত্যের পরিপূরক, তাই তার স্থান গৌণ। তবে লক্ষণীয় যে নিছক মুখের কথাকেই কবি সুরে গেঁথেছেন তাঁর নৃত্যনাট্যে এবং এ জায়গায় এখনো তিনিই অনন্য।

= ৩ =

উ প ন্যা স

এবার উপন্যাসের কথা। উপন্যাসও রবীন্দ্রনাথ লেখা সুরু করেন অতি অল্প বয়সে। তাঁর প্রথম উপন্যাস বৌঠাকুরাণীর হাট প্রকাশিত হয় তাঁর একুশ বছর বয়সে (১৮৮২)। রাজর্ষি তার তিন বৎসর পরে (১৮৮৫)। এই দু-খানি উপন্যাসে বোঝা যায় কবি তাঁর স্বধর্ম খুঁজে পান নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের আধা ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার ছকে তিনি লিখেছেন যথাক্রমে প্রতাপাদিত্যের ও ত্রিপুরা রাজ-পরিবারের ইতিবৃত্ত নিয়ে দুটি দীর্ঘ কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা বলেই বই দুটি উল্লেখযোগ্য, নিজস্ব মূল্য এদের কম এবং কবি নিজেই তা স্বীকার করে গেছেন, প্রথমটি নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ও দ্বিতীয়টি নিয়ে বিসর্জন নাটক লিখে।

প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় (১৯০১), চোখের বালি (১৯০২) তারই অব্যবহিত সহযাত্রী। নষ্টনীড় গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত রূপে প্রকাশিত হলেও, প্রকৃত পক্ষে তা একটি ছোট উপন্যাসই এবং নষ্টনীড় ও চোখের বালিই বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস, যাতে বাইরের ঘটনা-সংঘাতে অল্পবিস্তর কী পরিমাণ ভাঙাগড়া ঘটে, কোন আদি-প্রবৃত্তির উৎস থেকে জন্মগ্রহণ করে মানুষের রকমারি কথা ও কাজ, তার পথ-নির্দেশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলতে আজ আমরা যে শ্রেণীর রচনা বুঝি, এরাই তার আদি পুরুষ। নষ্টনীড়ে সমাজ ব্যবস্থিত সম্পর্কের গণ্ডী অতিক্রম করে কি ভাবে হৃদয়াবেগ নিজের দাবীকে বাইরে মেলে ধরে এবং তার ফলে সযত্ন রচিত নীড় কেমন ভাবে ভিতরে ভিতরে ধ্বসে পড়ে, তার বলিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চোখের বালিতে প্রচলিত নীতির মাপকাঠিকে দেখানো হয়েছে জৈব ক্ষুধা তৃষ্ণার পরিপন্থী নিরর্থ নিষেধ রূপে। লক্ষ্য করার বিষয় যে কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিম যে সমস্যার অবতারণা করেছেন, চোখের বালির সমস্যাও তাই, সেই বৈধব্য ও জৈব কামনার সংঘর্ষ। কিন্তু বঙ্কিমের সমাধান নীতি সমাশ্রিত, রবীন্দ্রনাথের সমাধান মানব-করুণ

সমৃদ্ধ। এইখানেই এক যুগ থেকে অন্য যুগে বাংলা উপন্যাসের উত্তরণ হয়েছে।

এর পর তিনি লেখেন নৌকাডুবি (১৯০৬) ও গোরা (১৯০৯)। নৌকাডুবি নষ্টনীড় ও চোখের বালির পর রচিত হওয়া একটি বিস্ময়কর কালাতিক্রমণের দৃষ্টান্ত ছাড়া কিছু নয়। কারণ সুষ্ঠু ভাষায় পরিবেশিত চমকপ্রদ গল্প ছাড়া এতে উচ্চতর সম্পদ সহজলভ্য নয়। কিন্তু গোরা রবীন্দ্রনাথের ত বটেই, সম্ভবত বাংলা ভাষারই সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে সংস্থাপিত এই বিরাট উপন্যাসে এক দিকে যেমন বহু চরিত্র অঙ্কিত করেছেন কবি, বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ফেনায়িত করে তুলেছেন তার আখ্যান-বস্তু, অন্যদিকে তেমনি নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও বিচিত্র জীবন-দর্শনের উদ্ঘাটনে মহীয়ান করে তুলেছেন তার পরিকল্পনাকে। দেশাত্মবোধের প্রতীক রূপে গোরা য কিছু সাবেকী য-কিছু সনাতন, তাকেই উগ্র একনিষ্ঠতায় আঁকড়ে ধরেছে জাতীয় মুক্তির উপায় জ্ঞানে। উদ্দাম যুক্তির তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে। হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হল, সে হিন্দু নয়, ভারতবাসীও নয়, হিন্দু পাবদাব সিপাহী বিদ্রোহের আমলে আশ্রয় গ্রহণকারিণী এক আইরিশ মহিলার সন্তান। মুহূর্ত মধ্যে চোখের সামনে থেকে মোহের পর্দা সরে গেল তার। মহামানবের মিলন ক্ষেত্ররূপে সে আবিষ্কার করল ভারতবর্ষকে, দেশপ্রেম রূপান্তরিত হল বিশ্বপ্রেমে এই হল গোরার বিষয়বস্তু। বিষয়ের মহত্ত্বে ও রচনার ধ্রুপদী গাম্ভীর্যে এ বই তলস্তয় বা টমাস মানের লেখনীর উপযুক্ত।

এরপর তিনি লেখেন ঘরে বাইরে (১৯১৬) ও চতুরঙ্গ (১৯.৬)। দুটি উপন্যাসই তখনকার সমাজে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ভাষার গাঁথুনিতে, মনস্তত্ত্বের জটিল গন্থী-উন্মোচনে চতুরঙ্গ এক অতুলনীয় রচনা। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎস্ফুরণের মতো এর চরিত্র ও সংলাপগুলি চমক লাগায় পাঠককে। সুনীতি দুর্নীতি, ভালোমন্দ, সব কিছুর চলতি মূল্যমান উল্টে পাল্টে দেয় যেন। সর্বাঙ্গীন পরিণতি হয়ত দানা বাঁধেনি আখ্যায়িকায়, তবু বুদ্ধিকে তৃপ্ত করে রচনাটি তার অত্যাশ্চর্য বাচনভঙ্গীর গুণে। ঘরে বাইরে বৃহত্তর পটভূমিতে প্রায় একই বিষয়বস্তুর নূতন রূপায়ন

এবং বলাই বাহুল্য, তা বলিষ্ঠতর রচনা। বিপ্লব না প্রেম, ঘর না বাহির, কোন পথে জীবনের মুক্তি, সেই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন কবি এই উপন্যাসে। উত্তর যা দিয়েছেন তিনি, তার সঙ্গে যুক্তির বিরোধ হয়ত থাকবে অনেকেরই, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির অসামান্যতা এড়াবেনা কারো দৃষ্টি। সত্যিই ঘরে বাইরের সন্দীপ এমন একটি চরিত্র, যার দোসর বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আনাতোল ফ্রাঁস বা দস্তয়েভস্কী ছাড়া এমন একটি ষোল-আনা পুরুষ মানুষ আঁকার শক্তি দেখা যায় না অন্য দেশেও খুব বেশী।

ঘরে বাইরে ও চতুরঙ্গের পর বারো-তেরো বৎসর রবীন্দ্রনাথ আর কোন উপন্যাসে হাত দেননি। তারপর বেরল তাঁর যোগাযোগ (১৯২৯), যা প্রথম সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তিন পুরুষ নামে এবং শেষের কবিতা (১৯৩০)। এক হিসাবে শেষের কবিতাই তাঁর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ইদানীন্তন সমাজের স্বচ্ছল শিক্ষিত ইঙ্গ-বঙ্গ নর-নারীর জীবনের চটুল দিকটি নিয়ে কৌতুক করার জন্যে তিনি সুরু করেন বইটি। কিন্তু তাঁর অগোচরেই তাঁর সৃষ্ট লাবণ্য ও অমিতরা তাঁর মমতার ওপর দখলদার হয়ে বসেছে। কৌতুক তাই করুণায় অভিষিক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয়েছে মনোরম বিয়োগান্ত কবিতায়। শিলংএর মায়াময় পরিবেশে রঙে রসে অদ্ভুত এই উপন্যাস কবি লেখেন তাঁর সত্তর বছর বয়সে। সেদিনের অনেক বিমুগ্ধ পাঠক তাই চমৎকৃত হয়ে বইটি স্বাগত জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক উপন্যাস বলে।

এ কথা অতিশয়োক্তি সন্দেহ নেই, কারণ গোরাই যে তাঁর মহত্তম উপন্যাস, এ যে কোন যুক্তিমান পাঠকই স্বীকার করবেন। তাছাড়া ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ এবং চোখের বালিও নিঃসংশয়ে উচ্চতর স্তরের রচনা। আগেই বলা হয়েছে, মনস্তত্ত্বের আলোতে সমাজ-বিধানের মূল্য যাচাই করেছেন কবি চোখের বালিতে এবং সেখানে তিনি নিষ্করুণ সংস্কারক নন, হৃদয়বান শিল্পী। ঘরে বাইরেতে সন্ত্রাসবাদ ও চতুরঙ্গে গুরুবাদ কবলিত মানুষের চরম ট্রাজেডীকে ভাষা দিয়েছেন তিনি। জীবন-দ্বন্দ্বের এই গভীর ও অন্তর্গূঢ় উপলব্ধি শেষের কবিতায় কোথায়? যোগাযোগ উপন্যাস অনেকের উচ্চ অভিমতে সম্বর্ধিত হলেও ক্লান্ত কলমের লেখা, তাই তার গঠনটা যেমন অগোছালো, লক্ষ্যবস্তু তেমনি ঝাপসা, যদিও চিত্রাঙ্কণে ও চরিত্র সৃষ্টিতে

অসামান্যতা আছে এই বইয়েও। দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) ও চার অধ্যায় (১৯২৪) উপন্যাস সাহিত্যে কবির সর্বশেষ দান। এর মধ্যে চার অধ্যায় বইটি নিয়ে এক সময় দেশে প্রভূত বাদ-বিবাদ হয়েছিল। মেদিনীপুরে চট্টগ্রামে এবং আরো কোন কোন জায়গায় যখন সন্ত্রাসবাদের দীপ্ত শিখা জ্বলে উঠেছে, তখন এই আগুন-জ্বালা রক্ত-ঢালা স্বাজাত্য প্রীতিকে নিন্দা করে বহু আক্রমণ ভোগ করেছেন কবি। কিন্তু রচনাটির অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, অনুপেক্ষনীয় উজ্জ্বলতা অস্বীকার করতে পারবেন না কেউ।

সংক্ষেপে এই হল রবীন্দ্র উপন্যাসের পরিচয়। নিছক গল্পরচনা দিয়ে সুরু করে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ এসেছেন সমস্যা বিচারে। তারপর গভীর তত্ত্ববোধ প্রকাশমান হয়েছে তাঁর উপন্যাসে এবং দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে উদ্ঘাটিত করেছেন তিনি মানুষের হৃদয়-রহস্যকে এবং এখানেই হয়েছে তাঁর পরম প্রকাশ। কিন্তু এই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে উপন্যাসে তিনি রূপায়িত করেছেন সমাজের শিক্ষিত ও সম্পন্ন মধ্যবিত্তকেই। নিম্নবর্তী সোপানের যে মানুষরা এই সমাজকে তাঁদের বিচিত্র শ্রমে সজীব করে রেখেছেন, রবীন্দ্র উপন্যাসের আনন্দলোকে তাঁদের প্রবেশ অবরুদ্ধ থেকেছে। সমগ্র ভাবে মানব-জীবন ব্যাখ্যাতা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এই জায়গায় হয়েছে সীমার দ্বারা চিহ্নিত এবং এই জিনিষটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের শেষ অধ্যায়ে।

— ৪ —

গল্প

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে রবীন্দ্রনাথ মাইকেল, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমকে পূর্বাচার্য রূপে পেয়েছিলেন। তাই নিজের গতিবেগ ও গন্তব্য ঠিক করে নিতে তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হয় নি। কিন্তু গল্প বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি করেছেন তিনিই এবং তার সর্বাঙ্গীন রূপায়ণও হয়েছে তাঁরি হাতে। কাজেই এ বিভাগে তাঁর অনস্বীকার্য বৈশিষ্ট্য কতখানি, তা নিশ্চয় বুঝিয়ে বলতে হবে না।

সবাই জানেন আশ কবি যে ত্রিশ বৎসর বয়সে জমিদারী তদারকের ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গিয়ে বাসা বাঁধেন। এই সময় গ্রামে গ্রামে, কখনো নৌকায় কখনো গোরুর গাড়ীতে ঘোরাফেরার মুখে, বাংলার পল্লীজীবন, তার প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, নদী নালা গাছপালা নীলাকাশ, তার পাল-পার্বণ, যেমন তাঁকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করে, তেমনি পল্লীবাসী মানুষের সুখ দুঃখের বিচিত্র ছবি উদ্রিক্ত করে তাঁর কবি-কল্পনাকে। এই বিচিত্র মানুষের মিছিল, তাদের বিচিত্র সুখ দুঃখের পরিচিতিই একের পর এক মূর্ত হয়েছে তাঁর ছোট গল্পগুলিতে। রবীন্দ্র কাব্যে বাংলা পল্লীর আশ্চর্য সুন্দর রূপ ফুটেছে, প্রায় তাঁর কবিজীবনের সূচনা থেকেই। কিন্তু তাঁর নাটকে উপন্যাসে সংব ও সচ্ছল মধ্যবিত্তেরই একাধিকার। নিম্নবিত্ত নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর সাধারণ মানুষরা তাঁর সাহিত্যে একবারেই সদলবলে হাজির হয়েছেন এবং সে তাঁর ছোটগল্পে। পদ্মা মেঘনা শিলাইদহের ভূগোলই সম্ভব করেছে এই ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথের গল্প সংখ্যায় যেমন প্রচুর, বৈচিত্র্যে তেমনি অসাধারণ। তিনি নিজেই একটি প্রবন্ধে বলেছেন, 'এক সময় আমি মাসের পর মাস পল্লীজীবনের গল্প রচনা করেছি। এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপ সিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট

ছিলেন।' সত্যিই অকৃপণ হাতে মেলে ধরেছেন তিনি নিম্নবিত্ত বাঙালী জীবনের সুখ-দুঃখ ও সঙ্কট সমস্যার অজস্র চিত্র। দিদি, ঠাকুর্দা, মাল্যদান, পোষ্টমাষ্টার, আপদ, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, হালদার গোষ্ঠী, কাবুলিওয়ালা, দৃষ্টিদান, ছুটি, যে-কোন গল্প হাতে নিলেই বোঝা যাবে এ কথা। ঘটনার অভিনবত্বায়, চরিত্রাঙ্কনের নিবিড়তায়, ব্যঞ্জনার গভীরতায়, এসব গল্পের কোন তুলনা হয় না। সব গল্পের পটভূমিই তাঁর অবশ্য পল্লী নয়, কতকগুলিতে দেখা দিয়েছে কলকাতাও। কিন্তু কাহিনীর বিচরণভূমি কোন ক্ষেত্রেই সাধারণ গৃহস্থের গণ্ডীর বাইরে যায় নি।

বিশুদ্ধ বাস্তবধর্মী গল্প হয়ত নয় এর সব গুলো। তবু এরা অনেকটাই বাস্তবানুগামী। আবার অন্য জাতের গল্পও আছে তাঁর। দূরবর্তী রোমান্সের কল্প-লোকে প্রক্ষেপ করে, মানব জীবনের নানা আশা, আশঙ্কা, স্বপ্ন ও বেদনাকেও রূপ দিয়েছেন তিনি বহু গল্পে। ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, দুরাশা, মণিহারা প্রভৃতি তাঁর এই পর্যায়ের বিখ্যাত গল্প। নীতিগল্প গুপ্তধন, কৌতুকগল্প ইচ্ছা পূরণ, অধ্যাপক এবং রোমাঞ্চ গল্প কঙ্কালও বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্মরণীয় দান। আর একটি গল্প মেঘ ও রৌদ্র, সমুজ্জ্বল সংযত প্রেমের গল্প হিসাবে এর জুড়ী নেই। এত রকমারি শ্রেণীর গল্প এক হাতে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং লিখেছেন এমন একদিনে, যখন এই রকম রচনার খবরই জানা ছিল না অধিকাংশ বাঙালীর, এ ভাবলে অবাক লাগে। হয়ত ফরাসী সাহিত্য বেত্তা লোকেন পালিতই প্রথম পরিচিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে এই জাতীয় রচনার সঙ্গে।

গল্প রচনার অনুরাগ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত নয়। ১৮৯৩-৯৪ থেকে মোটামুটি ১৯১৫-১৬ পর্যন্তই তিনি একাদিক্রমে গল্প লেখেন এবং হিতবাদী, ভারতী, সাধনা ও নব পর্যায় বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁর সেই গল্প মালা ছোটগল্প (১৮৯৪), বিচিত্রগল্প ১-২ (১৮৯৪), গল্প দশক (১৮৯৫), গল্প গুচ্ছ ১-২ (১৮৯৭), কর্মফল (১৯০৩), আটটি গল্প, গল্প চারটি (১৯১২), গল্প সপ্তক (১৯১৫) এই ক-টি সংগ্রহে গ্রথিত হয়। এরপর মাত্র একটি ক্ষুদ্র গল্পের বই প্রকাশিত হয় তাঁর : পয়লা নম্বর (১৯২০) এবং এখানেই প্রকৃত পক্ষে গল্প রচনার সমাপ্তি। শেষ জীবনে আর একবার ফিরে আসেন তিনি গল্প লেখার রাজ্যে এবং রবিবার, ল্যাবরেটারী ও ছোটগল্প, এই তিনটি

গল্প লেখেন সাময়িক পত্রে, যা তিন সঙ্গী (১৩৪০) বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও বদনাম নামে প্রবাসীতে একটি গল্প প্রকাশিত হয় তাঁর। বলাই বাহুল্য, এসব যতটা কৌতূহলের, ততটা অনুধাবনের বস্তু নয়।

আসলে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথই যদিও ছোটগল্পের প্রবর্তক এবং তাঁর স্বকীয় ধারায় তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, তবু তাঁর অন্যান্য রচনার তুলনায় দেশে ছোটগল্পের আদরের আসন যেন বেশ খানিকটা সঙ্কুচিত হয়েছে এবং তার কারণও আছে। গত অর্ধ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক অনুশীলন হয়েছে সাহিত্যের এই বিভাগটিরই এবং বাংলা ছোটগল্প বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও গঠন-শৈলীতে আজ যে জায়গায় পৌচেছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের এক কালের অনেক প্রসিদ্ধ গল্পই কতকটা দিদিমার গহনার মতো ঠেকে আজকের পাঠকের কাছে। তার সোনার খাঁটিত্ব নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন নেই, কিন্তু রুচি ভিন্ন স্বাদে অভ্যস্ত হয়েছে বলেই, আজ তার গদ্দী ভাষায় যেমন অনেকের আটকায়, তেমনি আখ্যান বস্তুর সুনিপুণ বিন্যাস ও মনোধর্মের সুগভীর আবেদন সত্ত্বেও, গল্পগুলির অত্যধিক কল্পনাশ্রয়িতায় রসবোধ ব্যাহত হয় থেকে থেকে। আসলে কবি উপর থেকে আলো ফেলে জীবনকে দেখেছেন, তাই কি সহর আর কি পল্লী, কি ধনী আর কি নির্ধন, কোনটাই ঠিক সত্য রূপে প্রতিভাত হয়নি তাঁর গল্পে। চলন্ত রেলগাড়ী থেকে দেখা দুনিয়া এর চেয়ে বেশী বাস্তব হতেও পারে না!

তবু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অসীম প্রাণ-প্রাচুর্য কালের বিবর্তনকে পরাভূত করেও যে অনেকটা সজীব আছে, এ বোঝা যায় আজকের ছাঁদে তাদের নূতন করে ঢেলে নাটকে বা ছায়াচিত্রে রূপায়িত করলেই।

= ৫ =

গদ্য সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য নিয়েও সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। এদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধি কবি রূপে এবং কবিতা ও গানই তাঁর সব চেয়ে জনপ্রিয় রচনা। নাটক ও গল্প উপন্যাস আসে তার পরে। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রবন্ধ-সাহিত্যেও যে তাঁর দান অসাধারণ এবং কেবলমাত্র গদ্য রচয়িতা হলেও যে তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক রূপেই পরিগণিত হতেন, একথা সম্যকরূপে জানেন না অনেকেই। বাস্তবিকই জীবনে গদ্য গ্রন্থও তিনি লিখেছেন কম নয় এবং বিভাগের বৈচিত্র্যে সেখানেও তাঁর অসামান্যতা নজর এড়াবার মতো নয়। দার্শনিক তত্ত্ব, সাহিত্যবিচার, ইতিহাস-ব্যাখ্যান, জীবন-বিশ্লেষণ থেকে সুরু করে স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী, ধর্মোপদেশ, রাজনীতি চর্চা, ভাষাতত্ত্ব আলোচনা পর্যন্ত, এমন জিনিষ খুব কমই আছে, যা নিয়ে তিনি মাথা না ঘামিয়েছেন এবং যার ওপর না কলম চালিয়েছেন।

এই ভূরি পরিমাণ গদ্য রচনার আদ্যোপান্ত মন্থন করা খুব সহজ ব্যাপার নয় ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের এই বিভাগটি পর্যালোচনা ভিন্ন মানুষ রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি চেনা ও বোঝার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। কবি নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক রূপে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয়, তার আদি-উৎস খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর গদ্য রচনার মধ্যেই। কি ভাবে ও কোন প্রভাবে তাঁর জীবন গড়ে উঠেছে, জগৎ ও জীবনকে তিনি কি চোখে দেখতেন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কি ছিল, সমাজ ও সংসারের নানা প্রসঙ্গকে তিনি কি ভাবে নিতেন, তার বিশদ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর আত্মকথায়, চিঠিপত্রে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় এবং তাঁর বিচিত্র দার্শনিক নিবন্ধে। অর্থাৎ তাঁর বিশাল সৃষ্টিমূলক রচনার অনেক টুকুরই ভাষ্য পাওয়া যায় তাঁর স্বরচিত প্রবন্ধ সাহিত্যে, রবীন্দ্রতত্ত্ব ব্যাখ্যায় যার চেয়ে যোগ্য পথ-নির্দেশক আর দ্বিতীয় নেই।

কিন্তু এই সব নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি শিল্পী বা দার্শনিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে পর্যটক, শিক্ষক, সমাজ ব্যবস্থাপক, ধর্ম ব্যাখ্যাতা, রাজনৈতিক কর্মী এবং লোকগুরুও। সেই 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও বহুমুখী ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষরও হল তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য। তিনি যত বড় প্রাণ-ধর্মী কবি ছিলেন, তাতে সাহিত্য বা শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যান এবং দার্শনিক আত্মজিজ্ঞাসা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু তিনি যে শিক্ষার বাহন বা স্বদেশী সমাজ বা সমবায় নীতি নিয়েও মাথা ঘামিয়েছেন, এ প্রায় অভাবনীয় মনে হয়। ঠিক এমনি অভাবনীয় মনে হয় ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে, অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান নিয়ে, পুরাবৃত্ত ও পরমাণু বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর নিবন্ধ রচনার আগ্রহ। কিন্তু এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তিনি যত বড় ভাবুক ছিলেন, ঠিক তত বড়ই ছিলেন চিন্তাশীল এবং শিল্পসাধনা ও কর্মসাধনার মধ্যে অদ্ভুত এক সমন্বয় হয়েছিল তাঁর মানসিকতায়। রবীন্দ্র প্রতিভার এই দ্বৈত রূপটিই পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর গদ্য সাহিত্যে।

অতি অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ গদ্য রচনায় হাত দেন। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য বই য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১)। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী ১ম (১৮৯১), ২য় (১৮৯৩) এর পরবর্তী বই। এই দুটি ভ্রমণ কাহিনীর পরই তিনি আমাদের সামনে দেখা দেন বহুমুখী পঞ্চভূত (১৮৯৭) নামক দার্শনিক নিবন্ধের লেখক রূপে। তারপর ১৯০৫-৬-৭ থেকে অব্যাহত ধারায় উৎসারিত হতে দেখা যায় তাঁর অজস্র গদ্য রচনা। বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭) আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), চারিত্র পূজা (১৯০৭), জীবন-স্মৃতি (১৯১২) ছিন্নপত্র (১৯১২), জাপান যাত্রী (১৯১৯), পরের পর এসে সাজত হয়েছে তাঁর রচনা ভাণ্ডারে। লক্ষ্য করার বিষয় যে একদিকে যখন তিনি এই সব ভাব গম্ভীর উচ্চ শিল্পগুণ সম্পন্ন প্রবন্ধরাজি লিখছেন, অন্যদিকে তখনি তাঁর লেখনী রাজনীতি, সমাজনীতি শিক্ষা ও ধর্ম সম্পর্কীয় নানা প্রসঙ্গাত্মক রচনাতেও ব্যাপক ভাবে নিয়োজিত হচ্ছে। সেই বিভাগের উল্লেখযোগ্য রচনা-বলীরও একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। 'বঙ্গীয় সম্মেলন (১৯০৫), আত্মশক্তি, দেশনায়ক (১৯০৬), রাজা প্রজা (১৯০৮), সমাজ (১৯০৮), শিক্ষা (১৯০৮) ধর্ম (১৯০৯), এই প্রসঙ্গাত্মক রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতন

বক্তৃতামালাও ১—১৩ ভাগ (১৯০২—১২) এই সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। সর্ব সাকুল্যে এই রচনাবলীর পরিমাণ কত, তা নিশ্চয়ই কাউকে বোঝাতে হবে না।

কিন্তু তালিকা এখানেই শেষ নয়। এরপরও তিনি লিখেছেন বহু উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ, তার মধ্যে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (১৯১৭), সত্যের আহ্বান, শিক্ষার মিলন (১৯২১), পল্লীপ্রকৃতি (১৯২৮), সমবায় নীতি (১৯২৯), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩০), ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৯৩০), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), ছন্দ (১৯৩৬), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬), কালান্তর (১৯৩৭), বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭), পথে ও পথের প্রান্তে (১৯৩৮), বাংলাভাষা পরিচয় (১৯৩৮), ছেলেবেলা (১৯৪০), সভ্যতার সঙ্কট (১৯৪১) ইদানীন্তন পাঠকের সুপরিচিত।

এই সুদীর্ঘ তালিকায় আমরা রবীন্দ্র-মানসিকতার ক্রম-বিকাশের ধারাটি যেমন লক্ষ্য করতে পারছি, তেমনি বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দ্রুত প্রবহমান গতির সঙ্গে তার সর্বপ্রধান সংস্কৃত-নায়ক কি ভাবে এগিয়ে চলেছেন, তা-ও বুঝতে পারছি। সেদিনের বাংলা দেশে জ্ঞানী গুণী ও কৃতবিদ্য মানুষের সংখ্যা অল্প ছিল না। সেই বরেণ্য সমসাময়িকদের সকলের মাথা ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দিগন্ত স্পর্শ করেছিলেন কেন, তা বোঝা যায় তাঁর মনের এই সজীব গতিপ্রবাহ লক্ষ্য করলে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও ধ্যান-ধারণার এত বিচিত্র বিভাগে একই সঙ্গে সমান পারদর্শিতায় মন ও লেখনী চালনার ক্ষমতা এ দেশে ত নয়ই, অন্য দেশেও খুব সুলভ নয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গদ্য লেখক নন, তিনি কবি এবং সে কাব্যে তাঁর দানের পরিমাণ কত, তা আমরা আগেই দেখিয়েছি।

বর্তমান আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার একটা বিবরণাত্মক পরিচয়ই মাত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তার অন্তরঙ্গ পরিচয় দেওয়া এত অল্প পরিসরে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে পরের পর তিনটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ গদ্যরীতি আশ্রয় করেছেন। প্রথম ধাপে দেখা যায় সাধনা ও বঙ্গদর্শন সম্পাদক রূপে তিনি যখন সংস্কারক মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন, তখন তাঁর গদ্য রচনা হয়েছে কাটা-ছাঁটা কাজের-কথা প্রধান। দ্বিতীয় ধাপে আমরা দেখি তিনি আশ্রয় করেছেন ধ্বনি-গম্ভীর অলঙ্কৃত

গদ্যরীতি। প্রথম বিভাগের দৃষ্টান্ত তাঁর শিক্ষার বাহন, জলকষ্ট, কণ্ঠরোধ, ঝাজকুটুম্ব প্রভৃতি প্রবন্ধ। আর দ্বিতীয় বিভাগের দৃষ্টান্ত কেকাধ্বনি, শ্রাবণ সন্ধ্যা, মেঘদূত, কাব্যের উপেক্ষিতা প্রভৃতি। তৃতীয় ধাপে এসে তিনি আশ্রয় করেছেন চলতি ভাষা এবং এই অধ্যায়ে সবুজপত্র প্রভাব বিস্তার করেছে তাঁর উপর। এই বিভাগের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ লেখা তাঁর রাশিয়ার চিঠি। লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রথম বই ইউরোপ প্রবাসীর পত্রও তিনি লিখেছিলেন কথ্য ভাষায়। সেই ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ পূর্ণ অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে তিনি বাংলা গদ্য ভাষায় যে বিচিত্র গতিবেগ সঞ্চার করেছেন, আজকের বাংলা রচনাভঙ্গী তার পর আর বেশী অগ্রসর হয়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে একটা কথা অনেকের মনে হয় যে তার অনেক স্থানে গভীর অন্তরের কথা যা ফুটেছে, তার চেয়ে বেশী প্রাধান্য নিয়েছে অলঙ্করণের পরিপাটিতা। তাঁর সমালোচনাতেও যুক্তির প্রখরতা আহত হয়েছে বহুক্ষেত্রে উক্তির অতি-সাবলীলতার টানে। এই বিজ্ঞান ও কারিগরী-শিল্প প্রভাবিত ক্ষিপ্রগামিতার যুগে, তাঁর গদ্য রীতির মন্থর পাদবিক্ষেপও হয়ত নাড়া দেয় না সকলের মনকে সব সময়। কিন্তু তাঁর আত্মবীক্ষা সূচক স্মৃতিকথা গুলি, ভ্রমণ-কাহিনী গুলি, সর্বোপরি তাঁর চিঠিগুলির মতো মনোরম সরল ও সুন্দর রচনা পৃথিবীর সাহিত্যেই খুব সুলভ নয়। বাস্তবিকই পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ বোধহয় সকল কালের ও সকল দেশের পত্র লেখককে পরাভূত করে গেছেন, তাঁর পত্রধারার অজস্রতায়, অকপটতায় ও অনস্বীকার্য শিল্প-সুষমায়।

= ৬ =

শিশু সাহিত্য

শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ বেশী না হলেও, সাহিত্যের এই বিভাগটিতেও তাঁর বৈশিষ্ট্য কম নয়। বিস্ময়ের কথা যে এই রাজ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখা যা, 'ছড়ার ছবি', 'খাপছাড়া', 'সে', 'গল্প সল্প', 'ছেলেবেলা' সবই তিনি লেখেন পরিণত বার্ধক্যে। অপচিত স্বাস্থ্যে যখন শ্রমসাধ্য কাজের শক্তি তাঁর ক্রমশ কমে আসছে, তখন হাল্কা কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্যেই বোধহয় তিনি বিশেষ করে শিশুসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তবে শিশুদের সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ চিরদিনই ছিল এবং আগেও যখনি সময় পেয়েছেন, তখনি তিনি ছেলে-মেয়েদের উপযোগী ছড়া, কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন।

পত্নী-বিয়োগের পর মাতৃহীন শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যে তিনি লেখেন 'শিশু'র কবিতাগুলি। 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতাগুলি তারপর। 'শিশু'র ও 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতা ভাষার ভাণ্ডারে সমাদরে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু এগুলি ঠিক শিশু-কবিতা নয়। 'শিশু-মনের অপার রহস্যময়তা, তার রকমারি খেয়ালী কল্পন', অলীক কামনা ও অবুঝ অনুভূতিকে কবি স্নেহশীল প্রবীণের মন নিয়ে রূপায়িত করেছেন এবং করেছেন প্রবীণের উপভোগ্য করেই। তবে প্রকাশ ভঙ্গীর ক্ষেত্রে তিনি প্রায় সর্বত্র তরল শব্দের আশ্রয় নিয়েছেন, তাই শিশুরাও তা পড়ে অপ্রবুদ্ধ একটা আনন্দ পায়। কিন্তু তাদের বোধশক্তির স্বল্প পুঁজি এসব কবিতার শব্দার্থ অতিক্রম করে ব্যঞ্জনা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে কি না সন্দেহ। পরিণত মনের চিন্তা ও উপলব্ধির ছাপ তাদের ছত্রে ছত্রে এত স্পষ্ট যে বলা যেতে পারে যে শিশু এই সব কবিতার বিষয়, সর্ব সময় এর পাঠক নয়। অবশ্য শিশু ও শিশু ভোলানাথে এমন কবিতাও আছে, যা নিছক ছোটদের কবিতা। 'তালগাছ', 'নদী', 'কাগজের নৌকা', 'বীর পুরুষ', 'খোকার বনবাস' কে না পড়েছেন? এ রকম শিশু-কবিতা কবি আরো লিখেছেন। তাঁর বিচিত্র কবিতার বই খুঁজলেই তা পাওয়া

যাবে। 'পূরবী'র 'শিলং-এর চিঠি'কেই ধরা যাক তার একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রূপে।

কিন্তু 'ছড়ার ছবি' আগাগোড়াই শিশু কবিতা। এক-একটা ছোট ঘটনা, নয়ত এক-একটা লোক বা জায়গা নিয়ে এক-একটা গল্প। সে গল্পও গাল-ভরা কিছুর নয়, অতি লঘু এক-একটা সুখ-দুঃখের কাহিনী, যা সহজেই শিশুচিত্তে সাড়া তোলে, তাই নিয়ে এর কবিতা। 'আকাশ প্রদীপ', 'অজয় নদী', 'ছবি আঁকিয়ে', 'বাসাবাড়ী', যে-কোন কবিতাই এর যেমন মধুর, তেমনি মোলায়েম, কোথাও এমন কিছু নেই, শিশুর রসবোধ যাতে আহত হবে। 'খাপছাড়া' হল টুকরো টুকরো রঙ্গ-কবিতার সংগ্রহ। কোনটা নক্সা, কোনটা ঠাট্টা, কোনটা বা একটু বাঁকা ইঙ্গিত। বেশীর ভাগই নূতন নূতন ছন্দ নিয়ে খেলা, আর সেই খেলার সঙ্গেই আছে খেয়াল মতো আঁকা কবির নিজের ছবি। ছোটরা 'ছড়ার ছবি' পড়ে উপভোগ করবে, আর 'খাপছাড়া' পড়ে পাবে আমোদ। বস্তুত ও দুইই আসলে এক হলেও, একের গতি গূঢ়তার দিকে, যে-দিক দিগন্তপ্রসারী কল্পনা-লোকের পথ নির্দেশ করে। অন্যের গতি প্রতিদিনের দুনিয়ার দিকে, যা থেকে রকমারি ভালো-মন্দের ফসল কুড়িয়ে তারা পূর্ণ করবে ভাবের ভাণ্ডার। বাংলা সাহিত্যে এই শেষোক্ত ধরণের কবিতার ভিত পত্তন করেন সুকুমার রায়। গুরু এসেছেন এ পথে শিষ্যের পরে এবং এসেছেন পূর্ণতর শক্তি নিয়ে।

'সে' বইখানির বিশেষত্বও কম নয়। তা রূপকথা নয়, এডভেঞ্চার নয়, খোস-গল্প এবং এমন হাল্কা হাতে তৈরী, যাতে ফুরফুরে হাসি আছে, ঝলমলে রোদ আছে, টুকরো টুকরো জুঁই ফুলের মতো মিষ্টি কান্না আছে, আর সব কিছু ছাপিয়ে আছে আশ্চর্য একটি কৌতুক রসের ছোঁয়া। সাত বছরের নাতনীকে উদ্দেশ করে কবি এই গল্পগুলি বলেছেন এবং আপন আনন্দে বলে গেছেন বলেই তাতে জমে উঠেছে অপূর্ব একটা স্বচ্ছন্দতার আমেজ। গেছো বাবার মাহাত্ম্য বা হাঁচিয়াম্মিনী কুরুকুনার কাহিনী কার না ভালো লাগবে? কবির আপন হাতে আঁকা ছবিগুলি এরও গল্পের ভিয়ানে নূতন রসের যোগান দিয়াছে। তবে জায়গায় জায়গায় হয়ত ছোটরা বক্তব্যের নাগাল পাবে না। পরিণত সাহিত্যের প্রত্যেকটি কথা তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে বুঝতে না পারারও একটা বিশেষ উপকার আছে ছোট বয়সে। সে হল নিজের কল্পনা দিয়ে ফাঁক

ভরিয়ে নেওয়া। এতেই শিশুর মনে উদ্ভাবনী শক্তি দানা বাঁধে, যা অভিব্যক্তি পায় শিল্প-সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথের 'সে' সেদিক থেকে আদর্শ শিশুসাহিত্য। অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' ছাড়া এর জুড়ী বই বাংলা ভাষায় আর নেই।

পাঠ্যপুস্তক নামে শিশুরা বিদ্যালয়ে যে নিষ্প্রাণ বইয়ের বোঝা প্রতিদিন বইতে বাধ্য হয়, তা দূর করার জন্যেও রবীন্দ্রনাথ যে এক সময় কিছু কাজ করেছিলেন, এ বোধহয় অনেকে জানেন না। আশ্চর্যের কথা যে তাঁর স্বনামে প্রকাশিত 'অনুবাদ চর্চা', 'ইংরেজী সোপান', ও 'সহজ সংস্কৃত পাঠ' বই এখনো বাজারে খুঁজলে পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের রাজ্যে উল্লেখযোগ্য লেখা হল তাঁর 'সহজ পাঠ'। একেবারে বর্ণপরিচয় ও বানান শিক্ষা থেকে শুরু করে, যুক্তাক্ষর বিন্যাস ও মিশ্রবাক্য রচনার প্রণালী পর্যন্ত, ভাষা শিক্ষার প্রায় সবগুলি প্রসঙ্গই তিনি এই পাঠমালায় নূতন ভাবে পরিবেষণ করেছেন। সেই পরিবেষণ একদিকে যেমন শিশু-মনের রহস্যানুসন্ধিৎসা সম্বন্ধে তাঁর সজাগতার, অন্যদিকে তেমনি বিচিত্র শব্দ ও বাক্যমালা নিয়ে যথেচ্ছ খেলা করার অদ্ভুত দক্ষতা প্রমাণ করে। সহজ পাঠের অন্তর্গত 'আমাদের ছোট নদী', 'কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ী', 'অঞ্জনা নদীতীরে' প্রভৃতি কবিতার চেয়ে ভালো শিশুকবিতা ব্লেক, ষ্টিভেনসন, ডি-লা-মেয়ার বা কিপলিংও লিখেছেন কিনা সন্দেহ। সহজ পাঠ দিয়ে যারা ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ পাবে, তারা শিক্ষার সঙ্গেই পাবে আনন্দ এবং এদেশের জীবনে তার মূল্য কম নয়।

ইংরেজী রচনা

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনা সম্বন্ধেও একটু আলোচনা দরকার। বাইরের জগতে রবীন্দ্রনাথের যে খ্যাতি, তার মূলে আছে হয় তাঁর রচনাবলীর স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদ, নয় অন্য কোন ভাষায় সেই অনুবাদের অনুবাদ। এমন কি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় তাঁর গ্রন্থাবলীর যে অনুবাদ হয়েছে, তা-ও বেশীর ভাগই হয়েছে ইংরেজী অনুবাদ থেকে। যদি আপন রচনাবলী কবি ইংরেজীতে ভাষান্তরিত না করতেন, তাহলে নোবেল প্রাইজ পাওয়া এবং তার ফলে সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবই হত না। বেশী কি, সমগ্র ভারতবর্ষেও তাঁর এবং বঙ্গ সাহিত্যের কোন সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ হত কিনা সন্দেহ! কাজেই রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজীতে তাঁর রচনা অনুবাদ করতে বসেছিলেন, সেটা একই সঙ্গে তাঁর এবং বাংলা ভাষার এক আশ্চর্য ঘটনা।

কবির ইংরেজী রচনার গোড়ার ইতিহাসটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কবির তৃতীয় বার ইংলণ্ড যাত্রার আগে শিল্পী উইলিয়াম রোটেনষ্টাইন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লেখা এক চিঠিতে তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই যাত্রা-পথে কবি জাহাজে বসে বসে গীতাঞ্জলি, খেয়া ও নৈবেদ্যের কতকগুলি কবিতা ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করেন। নিজের ইংরেজী রচনা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনে কোন আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না, তাই এই অনুবাদগুলি সম্বন্ধে তাঁর ভরসা যা ছিল, ভয় ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু এই অনুবাদ পড়েই যখন ইয়েটস, ট্রেভেলিয়ন, ম্যো সিনক্লেয়ার প্রমুখ ইংরেজ সাহিত্যিক মুগ্ধ হলেন, শুধু মুগ্ধ হওয়া নয়, তাঁদের উদ্যোগে যখন এই রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল, তখন তিনি নিজেই অবাক হলেন। বলা বাহুল্য, এই বইই হল তাঁর ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'। ১৯১২ সালে লণ্ডন থেকে ছাপা হয় এই বই। চিত্রা, সোনার তরী, চৈতালী ও পলাতকা থেকেও সুনির্বাচিত কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয় এর পরে এবং তা Gardener, Lover's Gift & Crossing, Fugitive প্রভৃতি বইয়ে

সংগৃহীত হয়। কণিকার কতকগুলি কবিতা Stray Birds-এ এবং শিশু ও শিশু ভোলানাথের কবিতা Crescent Moon-এ স্থান পায়। এ ছাড়া বিসর্জন, মালিনী, রাজা ও রাণী প্রভৃতি নাটক তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ডাকঘর, রক্তকরবী, ঘরে বাইরে, গোরা এবং গল্পগুচ্ছের নির্বাচিত গল্পেরও অনুবাদ হয় এবং সে-সব অনুবাদ করেন অন্যেরা। ছিন্নপত্রের অনুবাদ হয়েছে Glimpses of Bengal, জীবনস্মৃতির My Reminiscences, আর Personality, Sadhana, Religion of Man প্রভৃতি প্রবন্ধসমষ্টি কোন নির্দিষ্ট বই বা রচনা থেকে অনূদিত না হলেও, 'শান্তি নিকেতন', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'সমূহ' প্রভৃতির বিখ্যাত বইয়ের প্রবন্ধগুলোই ভাষান্তরিত, কতক ক্ষেত্রে ভাবান্তরিত হয়ে এই সব সংগ্রহে উপস্থাপিত হয়েছে। অনেকে হয়ত জানেন যে এই সব প্রবন্ধ প্রথমে হার্ভার্ড বক্তৃতা ও হিবার্ট বক্তৃত রূপে ইস্ট-মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়। ইংরেজীতে মূল লেখা সম্ভবত তাঁর দুটি, Nationalism (১৯১৭) বইয়ের অন্তর্ভুক্ত বক্তৃতামালা, আর অ্যালেন আন-উইন কর্তৃক প্রকাশিত Child নামক গদ্য কবিতার বই। বলা দরকার যে ন্যাশনালিজম বইটি তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ, এই কারণে যে এতে পশ্চিমী সভ্যতার পলিটিক্স-সর্বস্বতা ও যন্ত্রগর্বী হিংস্র জাতীয়তার মুখোস অনাবৃত করে দিয়েছেন কবি। সেদিন একথা বলার লোক বেশী ছিলেন না।

এই হল মোটের ওপর রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এর মধ্যে কবির স্বকৃত বাংলা কবিতার গদ্যানুবাদই বাইরে সর্বাধিক সমাদৃত এবং তার বিশেষত্বও লক্ষণীয়। এই ছন্দায়িত গদ্য কবিতাগুলির মধ্যে এমন একটা সহজ স্বাচ্ছন্দ্য পরিস্ফুট, যাতে বাংলা না-জানা পাঠকের কাছে এরা পুরোপুরি মূল কবিতা রূপেই প্রতিভাত হয়। কি শব্দবিন্যাসের দিক থেকে, আর কি রসসৃষ্টির দিক থেকে, রচনাগুলিতে কোথাও অনুবাদের আড়ষ্টতা দেখা যায় না। ইংরাজী লেখার ওপর স্বাভাবিক অধিকার কতখানি থাকলে, তবেই এ ব্যাপার সম্ভবপর, তা আশা করি আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

কিন্তু কবির ইংরেজী রচনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্বীকার্য হলেও, তাঁর স্বকৃত অনুবাদের বিরুদ্ধে একটা নালিশ আছে। তিনি প্রায় সর্বত্রই মূলের ভাবার্থ ইংরেজীতে নূতন করে লিখেছেন, কোন ক্ষেত্রেই মূলের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। বেশীর ভাগ স্থলেই মূলের অনেকাংশ ছেঁটে ফেলেছেন, নয়ত

ইংরেজী ভাষার সহজ প্রণবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানের জন্তে মূল বহির্ভূত কিছু-কিছু কথা ইতস্তত সংযোজিত করেছেন। তার ফলে ইংরেজী রচনা হিসাবে উৎকর্ষ হয়ত বেড়েছে, কিন্তু অনুবাদ হিসাবে অধিকাংশ লেখারই সার্থকতা গেছে কমে। কাজেই ইংরেজীর মধ্যে দিয়ে যাঁরা রবীন্দ্র সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করেছেন, কিংবা ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে যাঁরা অন্য কোন ভাষায় তার পুনরনুবাদ করেছেন, তাঁরা পেয়েছেন ইংরেজী লিখিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। বাংলা ভাষায় তাঁর দানের বৈশিষ্ট্য বা তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য কি, তা তাঁরা জানতে পারেন নি। সেই জন্তেই রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষত ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায়, তাঁর রচনাবলীর বিশুদ্ধ অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

তাঁর ইংরেজী রচনার বাইরে সমাদর হয়েছে, তার কারণ তাতে বিদেশী পাঠক ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণীর সন্ধান পেয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিড়ম্বিত ইউরোপের কাছে তার মূল্য সেদিন কম ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের রচনাশৈলী, তার অলঙ্করণ ও বাকবিন্যাসের চাতুর্য, কিছুই ধরা পড়েনি তাঁর ইংরেজী লেখায়। তাঁর ইংরেজী রচনার আদর সম্বন্ধে এণ্ডরুজ আর একটা কারণও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে ইংরেজী বাইবেলের সুর ও ধরণ সুস্পষ্ট বলেই নাকি ইউরোপীয় পাঠক তার প্রতি এতটা আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুবাদের ভঙ্গীটা Book of Psalms-এর অনুরূপ, সেটা অবশ্য লক্ষ্য করার বিষয়। তবে কবি নিজে বলেছেন যে গীতাঞ্জলি অনুবাদের আগে তিনি বাইবেল পড়েন নি এবং তাঁর কথা অন্যথা মনে করার হেতু নেই।

তৃতীয় স্তবক

রবীন্দ্র মনন

রবীন্দ্রনাথ একটা যুগ, তিনি একটা প্রতিভামাত্র নন। একাধারে কবি, কর্মী, ভাবুক, শিক্ষানায়ক, রাজনীতিজ্ঞ, বিজ্ঞানী ও ধ্যানী রূপে আমাদের ইতিহাসে তাঁর আসন প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিত। এত বড় সর্বতোমুখী পুরুষকে কেবলমাত্র সাহিত্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ করে দেখলে ও দেখালে চলবে কেন? সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর যা দান, তার মূল্য অসামান্যই। শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতবর্ষই তা বিস্ময়। জ্ঞানী, ধ্যানী ও মনীষীদের বিচারশালায় তাঁর সার্বভৌম শ্রেষ্ঠতাও অসংশয়ে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং তা নিয়ে নূতন কিছু বলার নেই।

কোথায় সে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা, পূর্ববর্তী সাহিত্য-ধারার সঙ্গে কোথায় তার পার্থক্য, ভাবী সাহিত্যের জন্যে তা কতখানি সম্ভাবনীয়তার প্রতিশ্রুতি রেখে গেছে সেদিকের আলোচনা প্রচুরই হয়েছে, এখনো হচ্ছে, পরেও হবে। যেহেতু তা চিরদিনের বস্তু। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তাঁর শতমুখী প্রকাশের পথে সাহিত্য খুব বড় একটা বাহন হলেও, অন্যান্য বাহনগুলোও কোনটা গৌণ বা উপেক্ষণীয় নয়। নানা খণ্ড-শক্তির সমাবেশে যে অখণ্ড ব্যক্তি-সত্তা তাঁর মধ্যে প্রকট হয়েছিল, তা যেমন বিচিত্র তেমনি অদ্ভুত। সেই সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ অনুপম ব্যক্তিত্বের দিকে দৃষ্টি রেখেই যেন আমরা কবিকে স্মরণ করি, কারণ সেটাই তাঁর সম্যক ও সমগ্র পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে ভাব ও কর্মে অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল, এ সবাই জানেন।

প্রথমে তাঁর কর্মের কথাই ধরা যাক। জমিদার রূপে তিনি কৃষির উন্নয়নে ও কুটীর-শিল্পের উজ্জীবনে যে একদা প্রভূত শ্রম স্বীকার করেছিলেন এবং দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবর্তনের এবং দেশের শিক্ষিত সমাজকে সেই পথে আকর্ষণের জন্যে চটকল ও কাপড়ের কল খুলে, প্রচুর লোকসানের বোঝা যে আপন মাথায় নিয়েছিলেন, এ অনেকেই ভুলে গেছেন। অনেকে জানেনই না যে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় পথে পথে চারণ বাহিনী পরিচালনা করে, গান গেয়ে তিনি প্রভূত চাঁদা তুলেছিলেন এবং 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠন করে দেশকে বিদেশী শিক্ষার কবল থেকে মুক্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। হয়ত অনেকে শোনেনই নি যে প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভায় দাঁড়িয়ে একদা উচ্চকণ্ঠে তিনি 'কণ্ঠরোধ', 'রাজকুটুম্ব', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রভৃতি স্মরণীয় বক্তৃতা পাঠ করেছিলেন এবং সহস্র সহস্র তরুণ মনে সে সব বক্তৃতা সেদিন প্রভূত উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের সেই কর্মী-জীবনের ইতিহাস তাঁর কবি-জীবনের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। এ কালের যুবসমাজে তাই শুধু তাঁর শিল্পী-জীবনের পরিচিতিটুকুই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। নৃত্য, গীত, চিত্র ও সাহিত্য, শিল্পের এই চতুর্বর্ণ সাধনায় তাঁর কীর্তি চিরস্মরণীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এই শিল্পী-সত্তার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ঐ কর্মী ভূমিকার ওপর। তাই তাঁর শিল্প-সাধনা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনদিনই নির্বিশেষ রসচর্চায় পর্যবসিত হয়নি। দেশ ও জাতির ঐতিহ্য এবং যুগ-সংস্কৃতির প্রাণরসে পুষ্ট হয়েই তা মানুষকে বৃহত্তর মনুষ্যত্বের সন্ধান দিয়েছে।

এই ব্যক্তি-কাঠামোর কথা ভুলে গেলে, তাঁর সাহিত্যেরও পূর্ণ পরিচয় পাওয়া কঠিন হবে। কারণ আগেই বলেছি, তিনি শুধু লিখবেন বলেই দেখেন নি। তাঁর ব্যক্তিত্ব বহুমুখে আপনাকে ব্যক্ত করে গেছে, সাহিত্য তারি প্রধান একটা মুখ।

একালে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হল বিশ্বজনীনতা। কিন্তু এই খানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব যে বিশ্বকে তিনি ভালোবাসলেও এবং বিশ্বের ভাবৈশ্বর্য দু-হাতে আহরণ করলেও, নিজের দেশকেও তিনি সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছিলেন। দেশের যেখানে সত্যকার দীনতা, মূঢ়তা, বেদনা, তিনি নির্মম কঠোরতার সঙ্গেই তা সংস্কার করতে এগিয়েছিলেন। তার রাষ্ট্রিক পরাধীনতা, সামাজিক অনৈক্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, কোন কিছুকেই তিনি উপেক্ষা করেননি। আবার এই সঙ্গেই দেশের যা সত্য, যা সুন্দর, শাশ্বত, তাকেও তিনি মর্যাদার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন। সেই বিনষ্ট ঐতিহ্যের আলোয় দেশকে আবার জাগিয়ে তুলতেও চেয়েছিলেন। তাঁর মননশীলতায় এই যে ভারতীয়তার প্রভাব, অনেকের মতে এ পুরাতনকে ফিরিয়ে আনার রোমান্টিক কবি-কল্প ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে যে এর চেয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত আর কিছুই হতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্কৃতিকে যিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ ও বরণ করেছিলেন, সভ্য জগতের যাবতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতিমূলক আন্দোলন থেকে যিনি সতিচ্ছন্দ আহরণ করেছিলেন, যুগোপচিত পথে জাতি ও জীবনের সংস্কার ছিল যাঁর আজীবনের ব্রত, জাতিভেদ, স্ত্রী-পুরুষের অধিকার ভেদ এবং অপরাপর ভেদ-বিভেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে, নূতন, সহজ ও স্বচ্ছন্দ সমাজ গড়ে তোলা ছিল যাঁর একমাত্র লক্ষ্য, তাঁর সম্পর্কে এ অভিযোগ যে কতখানি অমূলক তা বুঝিয়ে বলাই নিষ্প্রয়োজন।

ভারতবাসীদের মধ্যে যিনি প্রথম ফ্যাসিস্ট-শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মত দিয়ে মুসোলিনীর কোপদৃষ্টিতে পড়েছিলেন এবং অনুরূপ কারণেই জাপান সরকারের অপ্রীতি লাভ করেছিলেন, উগ্র জাতীয়তাবাদের মত্ততা যে জার্মানীকে তিলে তিলে মহা বিপর্যয়ের পথে টেনে নিয়ে চলেছে, একথা সকলের আগে ব্যক্ত করায়, হিটলারের জার্মানী যাঁর সমস্ত রচনার জার্মানীতে প্রবেশাধিকার রহিত করতে গিয়েছিল, সেই বিপ্লবী পুরুষকে প্রতি-বিপ্লবী বা প্রতিক্রিয়াবাদী প্রমাণ করতে যাওয়া সত্যিই হাস্যকর। মানব-কল্যাণে সোভিয়েট রাশিয়ার যে কৃতিত্ব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে আমাদের শ্রদ্ধাকর্ষণ করল, বহুদিন আগেই কবি তা সসম্মানে স্বীকার করেন এবং সেই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশকে কি রূপে ঢেলে সাজা আবশ্যক, তারও নির্দেশ দেন। এই স্বীকৃতিকে নিছক মানব-করুণা বলে চালালে বা দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে কেন? অন্ধ অতীত-গরিমাই হক, অন্ধ প্রগতিবাদিতাই হক, কোনটারই তিনি সমর্থক ছিলেন না। যুক্তিনিষ্ঠ সত্যানুসন্ধিৎসার আলোয় তিনি সংস্কার আনতে চেয়েছিলেন, আবার তিনি ঐতিহ্যেরও সমর্থক ছিলেন, এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর এই দ্বিমুখী মননশীলতায় আপাতদৃষ্টিতে যে স্ব-বিরোধিতা টুকু দেখা যায়, সম্ভবত তা নিয়েই অনেকে গোলে পড়েছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় ব্যক্তি-চেতনার দ্যুতিতেই স্বয়ংসিদ্ধ, তাঁর হয়ে ওকালতী করতে যাওয়া সত্যিই দুর্ভাগ্যের কথা। মাইকেল, বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর পর বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস যিনি একা গড়ে তুলেছেন, কবি, সঙ্গীতকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্প রচয়িতা,

প্রাবন্ধিক, সমালোচক, সর্বরূপে যিনি সাহিত্যের সকল বিভাগকে শৈশব দশা থেকে পূর্ণ যৌবনে নিয়ে এসেছেন, গায়ক, অভিনেতা, চিত্রকর, নাট ও নৃত্য প্রযোজক রূপে যিনি দেশের শিল্প-রুচিকে গঠিত, সংস্কৃত ও সাধারণ্যে পাঙক্তেয় করে দিয়েছেন, আবার শিক্ষা সংস্কারক, ভাবনায়ক ও জাতীয়তার উদ্বোধক রূপে যিনি জাতির প্রাণকে দিকে দিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন, তাঁর কীর্তি, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। আপন ঐশ্বর্যের সুমেরু-শিখরে স্বয়ংপ্রভ সূর্যের মতোই তিনি চিরদিনের অম্লান আলোকে বিকশিত থাকবেন। ক্ষুদ্র মানুষের আলোক-বর্তিকায় তাঁকে উদ্ঘাটিত করার প্রয়োজন হবে না। তবু রবীন্দ্রনাথের কীর্তি কীর্তনের প্রয়োজন নেই, এ কথা সত্য নয়। এ প্রয়োজন তাঁর জন্যে নয়, আমাদের জন্যে।

এত বড় লোকোত্তর পুরুষ যিনি আমাদের মধ্যে জন্মেছিলেন, আমাদের জীবন ও মননের সকল দিকই যে তাঁর আলোয় আলোকিত করেছিল, সে পরিচয় আমাদের রেখে যেতে হবে পরবর্তী পুরুষের কাছে। নইলে আমাদের কি কৈফিয়ৎ থাকবে? তাঁর সমসাময়িক হয়ে জন্মাবার যে দুর্লভ সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল, তার অমর উত্তরাধিকার যে আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয়নি, তারও প্রমাণ রেখে যাওয়ার প্রয়োজন আছে আমাদের। হয়ত প্রশ্ন উঠবে, কি করতে হবে সে জন্যে? সে উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব রাজনীতিবিৎ ও শাসকদের। আমরা শুধু এইটুকু জেনে রাখি যেন যে এই শতাব্দীর নিদারুণ দুঃখের তপস্যা যেদিন শেষ হবে, সেদিন নব প্রভাতের মুক্ত আলোয় যাঁর রূপ সব চেয়ে দীপ্ত, প্রোজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে দিগন্তে ফুটে উঠবে, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

= ১ =

দর্শন

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মতামত সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলার চেষ্টা করব। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলদের মতো রবীন্দ্রনাথেরও জগৎ, জীবন এবং পরমার্থ সম্বন্ধে নিজস্ব কতক গুলি মত ছিল। এই মতবাদ গুলির আলোতেই তাঁর দার্শনিকতার বিচার করতে হবে। কান্ট বা হেগেল যে হিসাবে দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ যে সে হিসাবে দার্শনিক নন, এ কথা আশা করি সকলেই জানেন। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে দৃষ্টি ও অনুভূতি, যার অনুপ্রেরণায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যকে, তা-ই হল তাঁর দর্শন। বস্তুত এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে যদিও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা, সব কিছু নিয়েই আলোচনা করেছেন, তবু তিনি প্রধানত এবং প্রথমত কবি। তাঁর কবি-মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল অনুভূতি ও কল্পনার ভেতর দিয়ে সমস্ত ব্যাপারকে দেখা, আর সেই দেখার ঐশ্বর্য অন্যের সাম্নে উদ্ঘাটিত করে দেওয়া। এই জন্যে তাঁর নানামুখী মত ও চিন্তার মধ্যেই দৃষ্টিগত একটি ঐক্যের বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যই হল তাঁর দর্শনের আদি-সূত্র।

রবীন্দ্র-দর্শনের এই আদি-সূত্রটি কি? আগেই বলেছি যে জগৎ, জীব ও পরমার্থ এই তিনের স্বরূপ ব্যাখ্যান এবং এদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয়ই হল সমস্ত দর্শনের উপজীব্য। (অবশ্য সমস্ত আস্তিক্যবাদী দর্শনের এবং রবীন্দ্রনাথ আস্তিক্যবাদীই)। রবীন্দ্রনাথের দর্শনেও এই তিনেরই ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ দেখতে পাই। একে একে এদের কথা বলি।

প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন অখণ্ড প্রাণ-শক্তির মূলাধার রূপে। ক্ষুদ্রতম প্রাণ-কণিকা থেকে আরম্ভ করে, বৃহত্তম জৈবসত্তা পর্যন্ত, সমস্তই সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তির ধারায় উৎসারিত হয়েছে এই আদি জীবন-ভূমি থেকে। প্রকৃতির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর মধ্যে দিয়ে উদ্বেলিত হচ্ছে যে দুর্নিবার প্রাণ-লীলা, যা বীজ থেকে বৃক্ষে, বৃক্ষ থেকে ফুল-ফলে, তা থেকে আবার বীজে অবিশ্রাম

রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে, দিন ও রাত্রির পরিবর্তন, গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীত বসন্তের আবর্তন এই রূপান্তরের পথে আনছে যে নব নব পরিণতির প্রকাশ, একে রবীন্দ্রনাথ একটা মূঢ় শক্তির ক্রিয়া বলে গ্রহণ করেন নি। এর মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন একটি প্রাণময় পরম সত্তার অবস্থিতি, যা নানা খণ্ড-অভিব্যক্তির ভেতরেও এক এবং অখণ্ড। এই যে সৃষ্টিপ্রপঞ্চ, এই যে এর প্রতি মুহূর্তের ভাঙাগড়া, এ আকস্মিক নয়, যেমন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সহসা উদ্ভূত একটা বিচিত্র বস্তু নয়। এর পিছনে রয়েছেন নিত্য ক্রিয়াশীল, নিত্য মননশীল সেই প্রাণময় পরম সত্তা। তাঁরি নির্দেশে চলছে ফিরছে এই জগৎ। নানা রূপে ফুটে উঠছে, ভেঙে পড়ছে, আবার সেই ধ্বংসের ভেতর থেকে জেগে উঠছে নূতন জীবনাঙ্কুর। এর শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ একটি লীলা এবং এই লীলাকে তিনি ভাগবতী লীলা রূপেই গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করেছেন।

জড়বিজ্ঞান যে evolution-কে স্বীকার করে, তাতেও প্রাণ-শক্তির এই অফুরন্ত রূপান্তরকেই স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু তার কেন্দ্রস্থানে রয়েছে মূঢ় কার্য-কারণ সম্বন্ধের খেলা। সেই বিজ্ঞান-সম্মত কাঠামোর ওপরই রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-তত্ত্ব সংস্থিত, কিন্তু একে তিনি তাঁর নিজস্ব ভাব-কল্পনায় অভিষিক্ত করে নূতন একটি মতবাদে পরিণত করে নিয়েছেন। এই মতবাদকে অনেকে বার্গাস প্রচারিত Creative evolution বা সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তির সগোত্রীয় বলে মনে করেছেন। কেউ বা বলেছেন, এর মূল শেলীর কাব্য। অনেকে আবার এর ভেতর উপনিষদের ছায়াও লক্ষ্য করেছেন। বস্তুত এ তিনেরই সঙ্গে রবীন্দ্র-দর্শনের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে একে অনুকৃতি বা অনুসরণ বলা যায় না। প্রকৃতির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে ব্যাপ্ত করে বয়ে চলেছে যে অখণ্ড একটি প্রাণের খেলা, তা নিরুপাধিক কোন বৈদ্যুত-চেতনার খেলা নয়। তা হল চিরসুন্দর, চিরমঙ্গল, চিরধ্রুব এক পরম প্রাণের লীলা, যে লীলা স্থূল রূপে প্রকট এই বিচিত্র জগৎ-ব্যাপারের ভেতর দিয়ে, আবার সূক্ষ্ম রূপে অভিব্যক্ত এর অন্তর্নিহিত সঞ্জীবন শক্তিতে··· হয়ত এ মত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নয়, কিন্তু এই মতকে তিনি যে নূতন ব্যঞ্জনা দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন, তা তাঁরি সৃষ্টি এবং সেই খানেই তাঁর নিজস্বতা।

আমাদের সসীম জীবন ও তার প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ ও জন্ম-

মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ চরমাবস্থা বলে গণ্য করেননি। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে বেষ্টন করে আবর্তিত হচ্ছে যে অসীম প্রাণলীলা, এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিকাশ, এ তাঁর মতে সেই অপার প্রাণ-সমুদ্রের বুকে ফুটে-ওঠা এক-একটা বুদ্‌বুদের মতো। যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই আছে তাদের আত্মস্বতন্ত্র অস্তিত্ব, কিন্তু যেই ভেঙে যাচ্ছে, অমনি তারা বিলীন হয়ে যাচ্ছে সেই বিরাট প্রাণ-স্রোতে। এই জন্যেই যখন তিনি প্রেমসঙ্গীত রচনা করেছেন, যখন এঁকেছেন মৃত্যুর ছবি, বাস্তব জীবনের বেদনা-বঞ্চনা আঘাত-অবমাননাকে যখন ভাষা দিয়েছেন, তখন এদের তিনি নির্বিশেষ সত্য রূপে উপস্থিত করেন নি। এসবের পিছনে রয়েছে যে অম্লান সার্থকতা, অপূর্ব সম্পূর্ণতা, তার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়েই তিনি এই আপেক্ষিক অভিব্যক্তি গুলিকে রূপায়িত করেছেন। তাই আমাদের বৈষয়িক দৃষ্টিতে দেখলে, অনেক সময় মনে হতে পারে যে বাস্তব জীবনকে তিনি তার প্রত্যক্ষ আবেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। অর্থাৎ বাস্তবতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে সব সময় আমরা সহজ মনে মেনে নিতে পারি কিনা সন্দেহ!

কিন্তু বলে রাখা দরকার যে বাস্তব সংসার এবং তার প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, আঘাত-সংঘাত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সজাগ অভিজ্ঞতা এবং স্বচ্ছ সত্য দৃষ্টিরও অভাব ছিল না। চরম সত্য ও পরম ঐক্যের দিক থেকে বিচার করলে এদের স্বরূপ যাই হক, নিজস্ব ভাবে এরা মিথ্যা নয়। মানুষের কাপট্য, স্বার্থপরতা, ইতরতা, ঈর্ষা বা আর যা-কিছু অনাচার সমাজ-জীবনে এনেছে অনৈক্য ও অশান্তি, তিনি তার বিরুদ্ধে উদাত্ত কণ্ঠেই প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। এমন কি বিদ্রোহ ঘোষণাতেও পেছ-পা হন নি। জরা, মৃত্যু, ক্লৈব্য, অক্ষমতা যেখানে জীবনের স্বাভাবিক গতির ও সহজ মুক্তির পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে, সেখানে তিনি দিয়েছেন সাহস ও সহানুভূতির, শান্তি ও সাম্যের অনুপ্রেরণা। বৈদান্তিক নির্লিপ্ততায় সমস্ত পার্থিব ব্যাপারকে মায়া মাত্র বলে উড়িয়ে দেননি তিনি। মানুষের প্রাকৃতিক ও মানবিক দুর্ভাগ্যগুলিকে মানুষের মতোই তিনি গ্রহণ করেছেন এবং এ সবের ঊর্ধ্বে অবস্থিত যে শাশ্বত সত্যের রাজ্য, তার আশ্রয়ভ্রষ্ট হয়ে মানুষ যে কি ভাবে মানুষের হাতে নিপীড়িত হচ্ছে, তা-ও তিনি অকপট আন্তরিকতার সঙ্গেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন

এই প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, কি ভাবে মানুষ সভ্যতার নামে ক্রমাগত তার লালসাকে বাড়িয়ে চলেছে, একের পর এক উপকরণ সৃষ্টি করে এবং সেই সমস্ত উপকরণের দাসত্বে দিনে-দিনে কি ভাবে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে অন্তরের দিক থেকে সে নিঃস্ব হচ্ছে। এই যে অন্যকে চেপে রেখে নিজে বড় হয়ে ওঠবার প্রচেষ্টা এবং তার জন্যে সংসার-জীবনের শালীনতা ও শ্রী নষ্ট করা, সমাজে অনৈক্য, অশান্তি ও অত্যাচারকে স্বাগত করে আনা, এ তাঁর মতে তথাকথিত আধুনিক সভ্যতারই প্রতিক্রিয়া। এ বস্তুর সঞ্চয়ে স্ফীত, এতে নেই অন্তরের ঐশ্বর্য, তাই একে তিনি বর্জন করতে বলেছেন। বলেছেন, আবার সেই ভাব-সমৃদ্ধ অতীতের জীবনাদর্শকে জাগিয়ে তুলতে, যাতে থাকবে না উপকরণের বাহুল্য, যা বিস্তার করবে না অশিষ্ট লোভের অনতিক্রমনীয় নাগ-পাশ। মানুষ তার যন্ত্রবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবে, মুক্তি পাবে কু-অভ্যাস ও কদাচারের দাসত্ব থেকে এবং তার ভেতরকার অমৃতত্ব, বিশ্ব-প্রকৃতির বিচিত্র প্রাণ-লীলার সঙ্গে তার নিত্য ক্রিয়াশীল যোগসূত্রটি আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এই হল তাঁর দর্শনের সার কথা। এই কথা অনেকের কাছে হয়ত অপ্রগতিশীল মনে হবে। জীবনের বাস্তব পরিণতিকে অস্বীকার করে, রবীন্দ্রনাথ তাকে রোমান্টিক একটা স্বর্ণযুগের পটভূমিতে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন বলেও হয়ত অনেকে মনে করবেন।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এটাই সব চেয়ে বড় বিস্ময়ের কথা যে বস্তু-বিজ্ঞানের কল্যাণপ্রদ অগ্রগতিকেও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ এবং স্বীকার করেছিলেন, আত্মা এবং আধ্যাত্মিকতার সমর্থক হয়েও।

—২—

ধর্ম

পারিবারিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাবে বাল্য থেকেই তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদের প্রবর্তন। তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্যেই উপনিষদের প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বিশ্বমৈত্রী, তাঁর সৌন্দর্য-দৃষ্টি, তাঁর আনন্দবাদ, সবই এসেছিল উপনিষদ থেকে। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র উপনিষদিক বা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদেই তাঁর মননধারা আবদ্ধ রাখেন নি। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের এবং বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্মের প্রভাবও তাঁর উপর পর্যাপ্ত ভাবেই পড়েছিল। উত্তর ভারতীয় সন্তদের এবং বঙ্গীয় বাউলদের প্রভাবও অল্প পড়েনি।

তাঁর কাব্যভাবের গান ও কবিতাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় বৈষ্ণব গীতি-কবিতার ছাপ। সেই পূর্বরাগ, অনুরাগ, ভাব সম্মেলন বাসকসজ্জা, 'মিলন, বিরহ,' আর যা কিছু বৈষ্ণবী ভাব-কল্পনায় স্বীকৃত, তা তাঁর কাব্যে নবরূপে প্রতিভাত হয়েছে। ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে রুদ্রকে, সৃজনের মধ্যে দিয়ে শক্তিকে তিনি বার বার উপলব্ধি করেছেন। বাণীরূপে, সারদারূপে, লক্ষ্মীরূপে, মাতৃত্বের বিভিন্ন রূপকেও তিনি স্বীকার করেছেন নানা জায়গায়। বৌদ্ধধর্মের নীতি-বিশুদ্ধি, খৃষ্টধর্মের আত্মসমর্পণও তাঁতে পূর্ণ মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছে। শুধু ইসলামের কোন প্রত্যক্ষ ছায়া তাঁতে পাওয়া যায় না, যদিও প্রেমকাব্যে সুফীদের সঙ্গে মাঝে তাঁর ভাবসাদৃশ্য পাওয়া যায়, যা হয়ত আকস্মিক।

এ থেকে কথা এই দাঁড়ায় যে ব্রাহ্ম রূপে কবির যে পরিচয়, সে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়। তাঁর ভাব-জীবন ও চিন্তাধারায় সর্ব-ধর্মসমন্বয়ের একটি অপূর্ব পরিণতিই লক্ষ্য করা যায়। শান্তিনিকেতন পর্যায়ের ধর্ম-ব্যাখ্যানে বা নৈবেদ্যের কতক কবিতায়, বা কতকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতে অবশ্য তিনি ব্রাহ্মধর্মকেই সজাগ ভাবে প্রচার করেছেন। বাক্য-মনের অগোচর যে পরমার্থ জগৎ ও জীবের ভেতর অদৃশ্য চেতনাকারে বিদ্যমান থেকে, নব নব রূপে অভিব্যক্ত হয়ে

চলেছেন, তিনি কখনো রুদ্র, কখনো কান্ত, কখনো আনন্দময় পরম পূর্ণতা, কখনো প্রাণময় পরম সার্থকতা, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারকে পরিব্যাপ্ত করেই রয়েছেন তিনি, তিনিই স্থূল রূপে এই জগৎ-প্রপঞ্চ, আবার দিব্য রূপে এর আত্মা, এ কথা তিনি বহুবারই বহু প্রকারে বলেছেন।

কিন্তু এই পরম সত্তাকে নির্বিশেষে নিরুপাধিক করে রবীন্দ্রনাথ কখনো গ্রহণ করেন নি, এঁকে ব্যক্ত করার জন্যে পদে পদেই নিয়েছেন প্রতীকের আশ্রয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চলে এসেছেন সনাতন ধর্মের এলাকায়। অরণ্যের মধ্যে যে প্রাণ-শক্তি, তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন অরণ্যলক্ষ্মী রূপে। সৌন্দর্যের মধ্যে যে অনির্বচনীয়তা, তাকে তিনি এঁকেছেন সুন্দরের দূতরূপে, মিলনোৎসুক প্রেমিকরূপে। মৃত্যুর মধ্যে, ধ্বংসের মধ্যে যে ভয়ঙ্করতা, তাকে তিনি অনুভব করেছেন নৃত্য-উন্মাদ নটরাজ রূপে। এই যে প্রতীকাশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গী, একে পৌত্তলিকতাই বলা যাবে। এমন কি, বিধিবদ্ধ হিন্দুধর্মের পরিচিত প্রতীক গুলিকেও তিনি অগ্রাহ্য করেননি। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিই :

অন্নপূর্ণা মা আমার নিয়েছ বিশ্বের ভার
সুখে আছে সর্বচরাচর।
মোরে তুমি হে ভিখারী মা'র কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।

কিংবা :

পথে পথে বাঁচ আলিম্পনের রেখা,
পাখার কাঁপনে গগনে গগনে
উচ্ছ্বসি উঠে দিক-প্রাঙ্গনে
বহ্নিচক্র রেখা,
প্রথম পরম বাণী—
বীণা হাতে বীণাপাণি।

কিংবা :

এসো গো শারদ লক্ষ্মী তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে।

এসো ধৌত শ্যামল
আলো ঝলমল
বন গিরি পর্ব্বতে।
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির ঢালা।

কিংবা :

প্রলয় নাচন নাচলে যখন
আপন ভুলে,
হে নটরাজ, নটরাজ,
জটার বাঁধন পড়ল খুলে।

জাহ্নবী তার মুক্তধারা,
উন্মাদিনী দিশেহারা,
সঙ্গীতে তার তরঙ্গ দোল
উঠল দুলে!

এই কবিতাংশ গুলির ভেতর দিয়ে যে কবি-দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাই, তা ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকের দৃষ্টি নয়, তা লীলাবাদী পৌত্তলিকের দৃষ্টি এবং এ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সহজাত। জন্মভূমিকে তিনি দেখেছেন অন্নপূর্ণা রূপে :

চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা
পূণ্য পীযূষ স্তন্যবাহিনী।

ঘনান্ধকার অমারাত্রিকে তিনি দেখেছেন রক্ত-বীজ বধে নিরত উন্মাদিনী কালিকা রূপে :

আঁধার কুন্তল তোরে মহাশূন্য জুড়িয়া,
প্রলয়ের কালো ঝড়ে বেড়াইছে উড়িয়া!

তাঁর এই পৌত্তলিকতা সব চেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে প্রেমকাব্যে, যেখানে সমগ্র পটভূমি অধিকার করে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গ। বৈষ্ণবী মধুর ভাবের সেই কবিতগুলিকে অবশ্য খৃষ্টীয় প্রেমকাব্যের প্রেরণা সঞ্জাত বলেও ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু বহু স্থানে কবি সরাসরি কৃষ্ণ-কাহিনীর

অবতারণা করেই সেই সন্দেহের নিরসন করে দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সম্ভবত তা অনাবশ্যক।

এ থেকে এ কথা অসংকোচেই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিক হিন্দু ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বলা যেতে পারে, তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন বা মরমী ছিলেন, বা খৃষ্টান ছিলেন। এমন কি, প্রকৃতির মধ্যে প্রাণশক্তি আরোপ করে এবং সৃষ্টি-মূলক অভিব্যক্তির আলোয় জীবন রহস্যের ব্যাখ্যা করে তিনি যে আর একটি দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে তাঁকে নিরীশ্বরবাদী বলাও কঠিন নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতো এমন কবির চিত্তে নানা সময়ে নানা সংস্কৃতির প্রভাব এসেছে, অনেক সময় যার একের সঙ্গে অন্যের মিলের চেয়ে গরমিলই বেশী। কিন্তু অনুভূতির গভীরে সব কিছু জড়িয়ে অপূর্ব একটা সমন্বয় হয়েছিল তাঁর। সেই সমন্বয়ই হল তাঁর ধর্মতত্ত্বের গোড়ার কথা।

কিন্তু ধর্মমত এক জিনিষ, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ আর এক জিনিষ। এই প্রয়োগের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে সমাজ জীবন এবং তা থেকেই এসেছে রকমারি শ্রেণীবিভাগ। ধর্মের এই প্রত্যক্ষ ব্যবহারগত অংশ যেটা, সাধারণের কাছে তাই ধর্ম বলে গৃহীত। সে দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন এবং অভিমত কী ছিল, সেটা এখানে যাচাই করা দরকার। আমরা আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতাবাদের সমর্থক ছিলেন। কাজেই মানুষে-মানুষে ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক ভেদকে তিনি স্বীকার করতেন না। মন্দির, মসজিদ, গির্জা, মূর্তি, ফলক, বই, সব কিছুর সার্থকতাই তিনি স্বীকার করতেন। মানুষের নৈতিক বিশুদ্ধি ও চারিত্রিক উন্নয়নের জন্য এদের উপযোগিতাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুমোদনও করতেন। কিন্তু তাঁর মত ছিল যে এই সমস্ত জিনিষ হল লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপলক্ষ্য মাত্র। এদেরকেই যেন চরম বা পরম বলে মনে না করা হয়। দুর্ভাগ্য বশত বাস্তব জীবনে আমরা তাই করি। তাই পান-ভোজন, আদান-প্রদান, ছোঁয়া-নাড়া আর যা-কিছু সামাজিক ব্যাপার, তার মধ্যে আমরা ধর্মকে টেনে আনি এবং এদের আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান গুলো নিয়ে অশোভন হানাহানি করে মরি। রবীন্দ্রনাথের মতে এ ধর্ম নয়। মানুষের যা ধর্ম, তা হল মহৎ, তা হল কল্যাণপ্রদ, তা হল সর্বমানবের মধ্যে একত্ব

স্থাপনের উপায়স্বরূপ। সমস্ত উপধর্মই জন্মেছে সেই আদি ও অকৃত্রিম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। কিন্তু বিবেচনাহীন মূঢ়তা ও কুসংস্কারের উৎপাতে তা ক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছে কতকগুলি সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত স্বার্থ স্বরূপ এবং তারি প্রভাবে সমাজ-জীবন হয়েছে বিভক্ত ও বিপর্যস্ত। এ জন্যে তিনি যত আঘাত করেছেন খৃষ্টানকে, তত আঘাতই করেছেন হিন্দু-মুসলমানকে। এই জন্যেই তাঁর ধর্মমতটা ঠিক কি ছিল, তার বিচারে অনেকে ভুল করেন।

= ৩ =

রাজনীতি

রবীন্দ্রনাথ কোনদিন প্রত্যক্ষ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে পলিটিক্সের চর্চা করেন নি। সমাজ-জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণের উপায় হিসাবেই তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন রাজনীতিকে। তাই তাঁর রাজনীতিতে আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ নেই, বরং হিংস্র জাতীয়তাবাদের বিরোধী রূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি। তিনি চেয়েছিলেন, দেশের লোক জাতিধর্ম নির্বিশেষে সুশিক্ষা লাভ করবে, ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি-শিল্পে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমমর্যাদায় শক্তিযুক্ত হবে। আর এই সমষ্টিগত সমুন্নতির জন্যেই তিনি চেয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা।

এই সর্বাঙ্গীণ সার্থক কল্যাণের পথে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন দুটো প্রচণ্ড বাধা: এক বিদেশী শাসন ও তার অনুগামী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভুত্ব, আর অপ্রগতিশীল প্রাচীনপন্থা ও তার পৃষ্ঠপোষক আচার-অনুষ্ঠান। তাই তিনি এ দুটোর বিরুদ্ধেই লেখনী ধরেছিলেন। পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, তাদের সাহস, সত্যনিষ্ঠা, উদ্যম ও উদ্ভাবনীশক্তিকেও তিনি অনুকরণীয় বলে স্বীকার করতেন। তাই বৈদেশিক সংস্পর্শকে তিনি অবাঞ্ছনীয় মনে করতেন না কোন দিন। বরং এ-দেশের অনড় একগুঁয়ে রক্ষণশীলতাকে ও-দেশের প্রাণবন্ত সংস্কৃতির স্পর্শে জাগিয়ে তোলারই তিনি সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বে দেশের পক্ষে বৈদেশিক শাসনের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং সে বিরোধিতার প্রধান কারণ, এই শাসনের সঙ্গে দেশবাসীর যোগ নেই। এ-দেশের শক্তি, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির তা পরিপোষক নয়। অর্থাৎ তিনি জাতি-দ্বেষ সম্পন্ন ছিলেন না বা অন্য দেশ ও জাতির ক্ষয়কে স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণের নিয়ামক ভাবতেন না। সর্বমানবের ভাবিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে একটি বিশ্ব মানবগোষ্ঠী গঠনই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের লক্ষ্য। যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাসন ও নিপীড়নের দ্বারা বিভিন্ন জাতিকে পরাভূত ও বিভিন্ন দেশকে কবলিত করে, সেই

ধ্বংসস্তূপের ওপর আপন জাতির গৌরব সৌধ গড়ে তোলার ভয়াবহ আদর্শকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন।

তাঁর এই ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের সাম্রাজ্য-লিপ্সা থেকে উৎসারিত যুদ্ধ দেখে। ভারত সম্পর্কেও তিনি সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র মতামত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই বিরোধিতাকে অন্ধ দেশপ্রেম মনে করলে ভুল করা হবে। মানুষের মানসিক দাসত্বের প্রতিফলন বলে তিনি বিদেশী শাসনকে ঠিক ততটাই আঘাত করেছেন, যতটা আঘাত করেছেন তাঁর স্বদেশী সমাজ ব্যবস্থাকে। এ দেশের স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি ও কারুকর্ম ধ্বংস হয়েছে যে কারণে, আর যে কারণে লুপ্ত হয়েছে মানুষের চরিত্র, মর্যাদা ও মনুষ্যত্ব, তার কোনটাই অবান্তর মনে করেন নি তিনি।

যে সমাজ ধর্মগত জাতি-বিভাগ প্রবর্তন করে জাতির অখণ্ডতা নষ্ট করেছে এবং একই সম্প্রদায়ের ভেতর রকমারি শ্রেণী নির্দেশ করে, কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবশিষ্টদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ করেছে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ব্যবস্থার সংস্কার না করে, অতীতের দাসত্বকে দিয়েছে প্রাধান্য এবং তারি সুযোগে ধর্মের নামে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, বহু অনাচার কদাচার ও অন্যায়কে অনুমোদন করেছে, তিনি সমান নিষ্ঠুর হাতে তাকে শাসন করেছেন। শুধু শাসন নয়, সত্য পথেরও সন্ধান দিয়েছেন তাকে। তাই তাঁর রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে, সমাজনীতির কথাও প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে।

এই জায়গায় তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনার মোট কথা আরো দু একটি বলে রাখা দরকার। এ-দেশের জীবনকেন্দ্র প্রধানতঃ পল্লীতে নিবদ্ধ। পল্লীর চাষবাস, গৃহশিল্প ও ছোট-ব্যবসার ওপর ভর দিয়েই সমস্ত দেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু নাগরিক জীবনের ক্রমস্ফীতির এবং বুদ্ধিমান ও সমৃদ্ধ মানুষদের দলে দলে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার ফলে পল্লীর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। এর ওপর আছে মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, আরো রকমারি উৎপাত, যার ধাক্কায় পল্লীর প্রাণশক্তি আজ কণ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। এদিকে শহরেও জনতা বৃদ্ধির সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করে শ্রমশিল্পের বিস্তার হয়নি। ফলে সেখানেও দেখা দিয়েছে ব্যাপক বেকার সমস্যা, অবিবাহ এবং আরো নানা

সঙ্কট। কাজেই কি গ্রামে আর কি নগরে, সর্বত্র আজ দেশবাসীর দুর্দশা চরমে উঠেছে।

এই অবস্থার প্রতীকারে রবীন্দ্রনাথ পল্লীকেই পুনর্গঠিত করে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নদীনিয়ন্ত্রণ করে, বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ও সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিধানের যুগোপযোগী সংস্থা গঠন করে, সর্বোপরি ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে নব নব উৎপাদন-যন্ত্র স্থাপন করে, পল্লী-জীবনকে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। তাতে সহরের প্রয়োজনাতীত জনতা হ্রাস পাবে, গ্রামেরও ক্ষয়িষ্ণু জীবনী-শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লীগঠনকে তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনায় প্রধান স্থান দিয়েছিলেন এবং শিক্ষিত সাধারণের সঙ্গে গণ-সাধারণের সংযোগ স্থাপনের দ্বারা এই পরিকল্পনাকে কাজে খাটাবারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কৃষি ও কারিগরী বিদ্যা শেখানো, পল্লী সংগঠন এবং হাতে-কলমে লোকশিক্ষা বিতরণের যে সমস্ত আয়োজন হয়েছে, তাতে এই পরিকল্পনাকে যথাসম্ভব রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

সাম্প্রদায়িক অনৈক্য আমাদের এ-কালীন রাজনীতির একটি বৃহৎ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সমাধানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মননশীলতা নিয়োগ করেছিলেন। উভয় পক্ষের সহনশীলতা ও উদার বুদ্ধিই যে এর সমাধানের একমাত্র উপায়, তা সর্বজন বিদিত। কিন্তু কি করলে সেই সহনশীলতা জন মনে সঞ্চারিত করা যেতে পারে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পরস্পর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ই হল তার একমাত্র উপায়। হিন্দুর সংস্কৃতি যখন মুসলমান উপলব্ধি করবেন, আর মুসলমানের সংস্কৃতি হিন্দু হৃদয়ঙ্গম করবেন, তখন দেখবেন যে ব্যবহারিক আচার-অনুষ্ঠানে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যাই থাকুক, সব ধর্মেরই প্রতিপাদ্য এক, গন্তব্য এক। পরস্পরের মধ্যে অপরিচয়ের দরুণ এই ঐক্য-সূত্রটি আমরা ধরতে পারি না, তাই বহিরঙ্গিক পার্থক্যগুলো বড় করে তুলে অযথা বিবাদে প্রবৃত্ত হই। এজন্যে দরকার অনুদার ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব পরিহার করে, নিজের নিজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মনীতির মূলতত্ত্ব গুলি অপরাপের সম্প্রদায়ের সামনে মেলে ধরা। দেশের শিক্ষায়তনে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক আন্দোলনে, সর্বত্র রয়েছে এই অনুদারতা। তার ওপর বিদেশী রাজশক্তির উদ্দীপনা রয়েছে এর পিছনে। তাই প্রতি পদে পদে

দেশে অশান্তি ধূমায়িত হচ্ছে। দেশবাসীর ধর্মগত পরিচয়কে পারিবারিক জীবনে এবং রাজনীতিক পরিচয়কে সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, এ উপদ্রব আপনি তিরোহিত হবে। কিন্তু সেজন্তে বিবেচনার পুঁজি নিয়ে অগ্রণী হতে হবে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিকেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনীতিক রচনাবলীর বহু স্থানে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন এবং তা সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন এই ভাবে।

= ৮ =

সমাজ

দেশের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার কবি আমূল সংস্কার চেয়েছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে উচ্চ-নীচে ভাগ করা সামাজিক কাঠামো তিনি স্বীকার করতেন না। প্রাচীন কালের অবস্থা ও প্রয়োজনের অনুকূলে গঠিত বিধি-বিধানের দাসত্ব করা এবং যুগোচিত পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে, সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান সংশোধন করে না নেওয়ার মনোভাবকে তিনি নির্মম আঘাত করেছেন বার বার। যে সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের জন্যে মূল্য দেয়নি, দিয়েছে জন্মের জন্যে এবং শিক্ষা দীক্ষায় স্বভাবে-সংস্কারে জাতি-ধর্ম ও গোষ্ঠী-নির্বিশেষে সকলের বড় হয়ে ওঠার পথ যা অবারিত করে দেয়নি, বরং জাতিভেদের, কৌলীন্যের, বর্ণাশ্রমিক আভিজাত্যের বেড়াজাল বিছিয়ে সে-পথকে দুরতিক্রম্য করে রেখেছে, তা তিনি মনে করতেন, আমাদের রাষ্ট্রগত পরাধীনতার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতিকর।

ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ থেকে তিনি এ সংস্কারের প্রেরণা পেয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং মননশীলতারও প্রত্যক্ষ প্রবর্তন ছিল। জাতিভেদকে তিনি আমাদের সামাজিক সংহতি লাভের পথে সব চেয়ে বড় শত্রু বলে বুঝতেন এবং এর বিরুদ্ধে শুধু লেখনী ধারণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, প্রত্যক্ষ ভাবেও এর সংস্কারে অগ্রণী হয়েছিলেন। তথাকথিত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পান-ভোজন ও পাণিগ্রহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন হলে, একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই পারস্পরিক ভেদ অপসারিত হয়ে যাবে, একে অন্যের স্বার্থ ও সম্ভ্রম রক্ষার বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠবেন, এ-ই ছিল তাঁর ধারণা। তাই বিশ্বভারতী আশ্রমে তিনি বিভিন্ন দেশ ও জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একত্র পান-ভোজনের প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। পারিবারিক জীবনেও তিনি একাধিক অসবর্ণ বিবাহ স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি এমনি একটি উদার ও প্রগতিশীল আদর্শের সমর্থক ছিলেন, যা সকলকে উৎসাহিত করেছে।

বলা বাহুল্য মত পোষণ বা প্রচার করা এক জিনিষ, তাকে কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা আর এক জিনিষ। আমাদের দেশে সংস্কারের প্রয়াস যা হয়েছে, সবই হয়েছে প্রধানত এবং প্রথমত কাগজে-কলমে। তাই বিধবা বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ যুক্তি-তর্ক বা আইনের দিক থেকে স্বীকৃত হয়েও, আজো সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হতে পারেনি। মত হিসাবে আমরা এসবের উপযোগিতা স্বীকার করি, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে এসব অনুষ্ঠান যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গেই বর্জন করে চলি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো স্বাধীনচেতা মানুষ কি এই আত্ম-প্রতারণা করতে পারেন? তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। নিজে তিনি রন্ধন ও খাদ্য পরিবেষণের জন্য অন্ত্যজ, এমন কি, অহিন্দু ভৃত্য পর্যন্ত রেখেছিলেন অনেকবার। ধর্মের নামে, শাস্ত্রের নামে, যুগের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে কোন সুদূর অতীতে যে সমস্ত আইন-কানুন তৈরি হয়েছিল, অন্ধভাবে তার আনুগত্য করা যে-দেশের রীতি, সে-দেশে এই দুঃসাহস বড় কম জিনিষ নয়। কিন্তু এইটুকুই রবীন্দ্রনাথের সমাজ-দৃষ্টির সমগ্র পরিচয় নয়।

আমাদের পুরাণো সমাজ-ব্যবস্থায় নারীকে নানা দিক থেকে রাখা হয়েছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। তাঁর শিক্ষাকে যথোচিত ভাবে স্বীকার করা হয়নি। তাঁর স্বাধীনতা, সামাজিক সম্মান, সর্বোপরি তাঁর মানবিক অধিকার ছিল অন্তঃপুরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ। অভিভাবক নির্ধারিত স্বামীকে অপ্রতিবাদে গ্রহণ এবং তাঁর সংসারের দায়িত্ব প্রতিপালন ও সন্তান ধারণই ছিল নারীর একমাত্র কর্তব্য। এর বাইরে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল একমাত্র অধিকার, বৃদ্ধ হলে তীর্থ-ভ্রমণে বের হবার, নয়ত গুরু-গোঁসাইয়ের কাছে ধর্মব্যাখ্যান শোনার। এ জীবন যে মানুষের পক্ষে অনভিপ্রেত, তা পর্যন্ত কারো মনে হয়নি। বরং অনেকে এর ভেতর প্রাচ্য দেশ সুলভ সমাজ-কৌলীন্যেরই পরিচয় পেয়েছিলেন। নারীর এই শোচনীয় দুর্দশার প্রতীকারে প্রথম অবহিত হয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজ। তাঁরাই নারীর শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নাবালক বয়সে বিবাহ দেওয়া এবং যথাসময়ের বহু আগেই সংসারের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে তাঁকে চিরকালের মতো পঙ্গু করে ফেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তা গ্রহণ করেননি। এমন কি, এই প্রচেষ্টাকে তাঁরা ব্যভিচার বলেই প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথই

সাহিত্যের মাধ্যমে বোঝালেন যে নারী পুরুষের যোগ্য সহচরী হবার অধিকারিণী। তাঁকে সেই রকম শিক্ষা দিলে, সম্মান দিলে, তিনি যে সমাজ-জীবনের উন্নয়নে কত বড় অংশ নিতে পারেন, তা তাঁর রচনার ভেতর দিয়েই দেশ প্রথম বুঝতে শিখল।

তিনি বোঝালেন যে মাতৃ রূপে, পত্নী রূপে, বান্ধবী রূপে তাঁর যেমন পুরুষের প্রতি কর্তব্য আছে, পুত্র রূপে, স্বামী রূপে, সজ্জন-রূপে, পুরুষেরও তাঁর প্রতি আছে তেমনি কর্তব্য। আমাদের পুরুষ সমাজ নির্লজ্জ স্বার্থপরতার সঙ্গে নিজেদের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেন, কিন্তু অন্যের প্রাপ্য সম্বন্ধে সুবিবেচনা করেন না। এর ফলও ফলে মারাত্মক রূপেই। নারী শিক্ষায় দীক্ষায়, আচারে সংস্কারে পরিপূর্ণতা লাভ করেন না। তথাকথিত অন্তঃপুরিক কর্তব্যও (সন্তান পালন, স্বাস্থ্য বিধান, মিতব্যয়িতা, শান্তিপূর্ণ গৃহ-গঠন, কোনটাই) তাই তাঁর দ্বারা সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না। সমাজ জীবনের অর্ধাঙ্গ হলেন নারী। সে-অঙ্গ জড়তা ও কুসংস্কারের ভারে হয়ে রয়েছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তাই এ সমাজ মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়াতে পারল না কোন দিন। নারীর অনগ্রসর দুরবস্থাই তাকে টেনে নীচেয় নামাচ্ছে।

তিনি বললেন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্ম-সাধনায় পুরুষ নারীর চেয়ে স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ নন, নারীকে এসবের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলেই, এ রাজ্যে পুরুষের একচেটিয়া অধিকার কায়েম রয়েছে। নারীকে পথ ছেড়ে দিয়ে দেখা দরকার, তাঁরা পুরুষের সঙ্গে সমভাবে পা ফেলে চলতে পারেন কিনা। এই মতবাদকে রূপ দেবার জন্যই তিনি নারী ও পুরুষের সহ শিক্ষা সমর্থন করেছিলেন এবং পতি-নির্বাচন যেমন, অবাঞ্ছিত বিবাহ বন্ধন ছেদন তেমনি পুরুষের মতো নারীরও সর্বাত্মক স্বাধীনতা তিনি অনুমোদন করেছিলেন।

অনগ্রসর সমাজে যাঁদের জন্ম এবং সেই কারণেই যাঁরা লেখাপড়া শিখতে বা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে আসতে পারেন নি, তাঁদের সুযোগ-সুবিধা দিলে, তাঁরা যে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর চেয়ে কম যান না এবং নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দিলে, তাঁরাও যে কোন ক্ষেত্রেই পিছনে পড়ে থাকেন না, এ আজ বাস্তবে পরীক্ষিত হয়েছে। ধীরে হলেও সমাজে এই আদর্শ আজ প্রতিষ্ঠিত হতেও চলেছে। বলা দরকার যে এই দৃষ্টি-বিবর্তনের পিছনে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ নগণ্য নয়।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বা সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রগতিশীল এবং সংস্কারপন্থী ছিলেন বলেই, তিনি যা-কিছু প্রাচীন, তার ধ্বংস কামনা করতেন না। শিক্ষার ব্যাপারে তিনি অগ্রগামী জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে যাবতীয় গ্রহণীয় বস্তু আহরণের পক্ষপাতী হলেও, এদেশের যা মহৎ, সত্য, যা কল্যাণপ্রদ, তাকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতেন। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের জন্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পাঠ্যতালিকা প্রবর্তন করলেও প্রাচীন আদর্শে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন এবং তার মাধ্যমে উপকরণহীন আত্মজ্ঞানলব্ধ জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কার্যত সফল তিনি হন নি হয়ত, কিন্তু তাঁর লক্ষ্যটি আমাদের ভুল করলে চলবে না। সমাজ ব্যাপারেও তিনি অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ এবং নারীর অগ্রগতি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেন একথা স্বীকার করতেন যে অবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই নাগরিক হবেন না। অনেককে হতে হবে কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এবং সেই সাথেও থাকতে হবে সমাজ-লোকের ভারসাম্য রক্ষা। সমস্ত নারীই রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মানুশীলন করবেন না, অনেককেই হতে হবে সাধারণ সংসারের গৃহিণী এবং সন্তান ধারণ ও পালনের দায়িত্ব নিতে হবে। তবে সকলেরই এঁদের প্রত্যেককেই মানুষ হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা লাভ করতে হবে। অর্থাৎ সমাজ-জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন তিনি চাইতেন না। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ সংস্কারক এবং তাঁর মতে একেবারে নূতন সমাজ গড়ে তুলতে হলে কি হবে উপায়, সে সম্বন্ধেও তিনি নীরব ছিলেন না।

= ৫ =

শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ নিজে স্কুল-কলেজের বাঁধা-বরাদ্দ পাঠ্য পড়ে পরীক্ষা পাশ করেননি। এ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মনে অণুমাত্র শ্রদ্ধাও ছিল না। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে সমস্ত মানুষকেই একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে মানুষ করার চেষ্টা হয়। ধরে নেওয়া হয় যে মানসিক গঠনে মোটামুটি সমস্ত মানুষই এক, তাই একই পদ্ধতিতে, একই আদর্শে, সকলকে লাইনবন্দী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ছাপ দিয়ে দেওয়াই হল এই শিক্ষার চরম লক্ষ্য। কিন্তু সব মানুষই ত এক নয়! প্রত্যেকের মনন-ধারা স্বতন্ত্র, আহরণের পদ্ধতিও স্বতন্ত্র, কাজেই প্রচলিত ব্যবস্থায় পরীক্ষা পাশ অনেকে করলেও, শিক্ষালাভ করে খুব কম লোকই। তাছাড়া যে পাঠ্যতালিকা আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার ভেতর মনের ঐশ্বর্য ও চিন্তার স্বকীয়তা বৃদ্ধির উপযোগী জিনিষও কি খুব বেশী থাকে? কতকগুলো প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় তথ্য একত্র করে শিক্ষার্থীর মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরখ করে দেখা, সে ঠিক ঠিক আহৃত বিষয়গুলি আবৃত্তি করে যেতে পারে কিনা… এই ত এ শিক্ষার শেষ কথা।

রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ছক বাঁধা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি এবং দেশের ভাবী নর-নারীর পক্ষেও একে অসার্থক বলেই মনে করেছিলেন। তাঁর নিজের শিক্ষালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে হল এঁর প্রতিবাদে অগ্রসর হওয়া এবং নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী আদর্শে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাপনা করা। সেই জন্যে তিনি সর্বাগ্রে শিক্ষা থেকে ডিগ্রার লোভকে বিতাড়িত করে, তার স্থানে আনতে চাইলেন, চিন্তার আনন্দ, অনুভূতির স্বচ্ছতা ও আত্মপ্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য। নীরস নিরুজ্জ্বল পাঠ্য বিষয়গুলির সঙ্গে তিনি যুক্ত করলেন নৃত্য, গীত ও চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি কলাবিদ্যাকে এবং পাঠ্য বিষয়ের ভেতর দিয়ে শিক্ষাথী যা আহরণ করবেন, সৃষ্টির ভেতর দিয়ে তাকে প্রকাশ করাকেই তিনি প্রচার করলেন সব চেয়ে বড় শিক্ষা বলে। এই জন্যে তিনি সব চেয়ে বড় করে দেখালেন

প্রকৃতির মধ্যে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করার আদর্শকে। খোলা মাঠে, উন্মুক্ত আকাশের তলায়, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে নিত্য-নিয়ত প্রকৃতির রাজ্যে চলছে যে বিচিত্র ভাঙাগড়া, তার ফুল-ফল কীট-পতঙ্গ ও জীব-জন্তুর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে যে নিত্যনূতন বৈচিত্র্য, তা থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে, একান্তভাবে বিষয়াত্মক শিক্ষা লাভ মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবণতার বিরোধী বলেই তাঁর ধারণা। আর ভাবী পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, একান্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেড়া অতিক্রম করার জন্যে অধ্যয়নেরও তিনি কোন সার্থকতা দেখতে পাননি। তিনি মনে করতেন, বাইরের জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে সুষ্ঠু একটি যোগসূত্র স্থাপন করে, নিত্য নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করা এবং এই ভাবে মানুষের মনে চিন্তা, কল্পনা, অনুভূতি ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষাই সমস্ত মননশীলতার চালক-শক্তি স্বরূপ। যার মনে দেখবার ও দর্শনীয় বিষয়কে উপভোগ করার, বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করে বোঝবার ও বোঝাবার শক্তি এসেছে, তথ্যের অভাব তার মনকে কোনদিন বাধা দিতে পারে না। তথ্য সে আপনি আহরণ করে নিতে পারে। এমন কি, স্বল্প তথ্যের পুঁজি নিয়েও সংস্কৃতির মর্ম সে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে।

আসলে শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্পর্ক কী? অর্থাৎ গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান আমরা পড়ি কেন? কেন ভাষা শিখি, সাহিত্য পড়ি? জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোথায় এদের প্রয়োজন, শিক্ষার্থীকে তা বুঝতে না দিয়ে, স্কুল-কলেজে প্রত্যক্ষ জীবন থেকে বিচ্যুত শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে আমরা করে তুলি কতক গুলি নীরস তথ্যের সমষ্টি এবং সেখানেই আমাদের শিক্ষাদান প্রণালীর সাংঘাতিক ত্রুটি। জীবনের সঙ্গে শিক্ষণীয় প্রসঙ্গের সম্পর্ক লক্ষ্য করলে, স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি দিয়েই শিক্ষার্থী তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তখনই তা তার চিন্তা ও মননশীলতার গভীরে স্থায়ী আসন লাভ করে। তার সুযোগ না থাকলে, হৃদয়ঙ্গম করার আশা ছেড়ে দিয়ে তাকে শুধু মুখস্থ করার ওপর জোর দিতে হয়। এই ভাবেই এসেছে, আমাদের দেশে অর্থ পুস্তক, শর্ট-কাট ইত্যাদি এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সমুদয় পর্বকেই নির্বিচারে করেছে পরীক্ষা পাশের সোপানে পরিণত।

রবীন্দ্রনাথ এই কৃত্রিম শিক্ষাদান ও গ্রহণের ব্যতিক্রম ঘটালেন তাঁর

প্রতিষ্ঠানে। আগেই বলেছি, তিনি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে যে অধ্যয়ন, তার সমর্থক ছিলেন না। সেই সঙ্গেই দেখিয়েছি যে মনের সহজ আনন্দ ও স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে প্রাত্যহিক অনুভূতিগুলির ভেতর দিয়ে কল্পনা ও মননশীলতার প্রসার ঘটনাকেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন সত্যকার শিক্ষা বলে। সেই জন্যে তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় কলা-বিদ্যাই নিয়েছে মুখ্যস্থান, আর তত্ত্ববিদ্যা হয়েছে তার সহকারী। কলা-বিদ্যার সঙ্গে মানুষের যে যোগ, তা হল আনন্দের যোগ। এই আনন্দই হচ্ছে সমস্ত আহরণের আদি উপায়, যাকে আমাদের কেতাবী শিক্ষা সম্পূর্ণ রূপে ছেঁটে বাদ দিয়েছে। সেই জন্যেই আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের মনের সঙ্গে সহজ আনন্দে একাকার হয়ে যেতে পারে না। পরীক্ষা পাশের পরই সুরু হয় আমাদের জীবিকা সংগ্রহের পালা এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে আমাদের অবলম্বিত বৃত্তির সঙ্গে আমাদের আহৃত বিদ্যার কোনই সংস্রব নেই। সে বিদ্যা অনুশীলন ও উপলব্ধির অভাবে কখন মন থেকে স্খলিত হয়ে গেছে! কিন্তু যদি আমাদের শিক্ষাকে আমাদের অন্তরের রসে রসিয়ে নিতে পারতাম, তাহলে আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে দিয়ে অন্তঃপ্রবাহী ধারার মতো তা বয়ে চলত। এই বনিয়াদ গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ প্রণয়ন করেছিলেন তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা। সেই জন্যে ত থেকে তিনি সাম্প্রতিক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং খোলা মাঠে ছেলে ও মেয়ে একত্রে খেল-ধুলা গান-গল্প আমোদ-প্রমোদের ভেতর দিয়ে যাতে অনায়াসে সংস্কৃতি ও সভ্যতার, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রাণসম্পদে ঋদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, তার অনুযায়ী রকমারি বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। অবশ্য যাতে ভাব ও অনুভূতির রাজ্যে একান্ত ভাবে নির্বাসিত হয়ে শিক্ষার্থীরা বাস্তব বিমুখ হয়ে না ওঠে, সেজন্যে শান্তিনিকেতন ভাব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি স্থাপন করলেন শ্রীনিকেতনের শিল্প-বিদ্যালয়ও।

বিভিন্ন শ্রম-শিল্পের সাহায্যে হাতে-কলমে জীবিকার্জন শিক্ষা দেওয়া ভিন্ন বিশুদ্ধ কেতাবী শিক্ষায় সুফলের চেয়ে কুফল হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই বিচক্ষণ কবি বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে ভাবমূলক শিক্ষার বাহন রূপে স্থাপন করে, জাতির সামনে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ একটি নূতন শিক্ষাদর্শ স্থাপন করেছিলেন। দেশে-বিদেশে আজ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে চলেছে রকমারি পরীক্ষা-

নিরীক্ষা। রবীন্দ্রনাথের দানও সে দিক থেকে নানা দেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু যুগ-ধর্মে এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে প্রধানত অর্থকরী এবং অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে ডিগ্রীই হল যোগ্যতা নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি। কাজেই এদেশের বেশীর ভাগ গৃহস্থই তাঁদের ছেলে-মেয়েদের ডিগ্রীহীন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ইচ্ছুক বা সাহসী হলেন না। সেই জন্যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস-বাঁধা পাঠ্য পড়ানো এবং তার পরিচায়ক ডিগ্রী অর্জন করানোকেই সাগ্রহে আঁকড়ে রইলেন, আর রবীন্দ্রনাথকে চালাতে হল তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রধানত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে, যাদের অনেককেই চাকুরীর দ্বারা অন্ন আহরণ করতে হবে না। কাজে কাজেই প্রথম শ্রেণীর এমন মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র তিনি পেলেন না, যাদের উপর তাঁর আদর্শ প্রয়োগ করে তিনি সত্যকার সাফল্য পেতে পারেন। তাই জনগণের রুচি ও অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে, শেষকালে তাঁকে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতির সঙ্গেই স্বীকার করে নিতে হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থিত সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্য পড়ানো এবং পরীক্ষা দেওয়ানোও। কিন্তু অন্তরের সঙ্গে তিনি শেষদিন পর্যন্ত জিনিষটা অনুমোদন করেননি। তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তির পর বিশ্বভারতী পূর্ণায়তন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে এবং অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার তফাতের পরিমাণ কমিয়ে ফেলার দিকেই বর্তমান কর্তৃপক্ষ সমধিক মনোযোগী হয়েছেন দেখা যাচ্ছে।

= ৬ =

সাহিত্য

সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধির বাহন মনে করতেন না, বা সাময়িক চিত্ত-বিনোদনই তার প্রধান লক্ষ্য বলে স্বীকার করতেন না। তিনি মনে করতেন, সাহিত্য মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্তের সৃষ্টি, তা মানুষের সর্বোত্তম অনুভূতির প্রকাশ। তাই তার অবলম্বন হল সৌন্দর্য, সত্য, আনন্দ, তা কোন বিশেষ দেশের সঙ্কীর্ণ সীমায় বা বিশেষ সময়ের নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের পক্ষে যা সত্য, সেই শাশ্বত সত্যের ওপরই সাহিত্যের স্থিতি। কোন বিশেষ দেশ ও বিশেষ জাতির ধর্ম, রাজনীতি বা সমাজকে আশ্রয় করে যদিও তার জন্ম, তবু তার লক্ষ্য নির্বিশেষ ভাবে সমস্ত মানুষ। তাই তাকে প্রচার, প্রপাগ্যাণ্ডা বা উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম করে তোলা চলে না। করলে তার দাম হয় সাম্প্রতিক এবং সমসাময়িক সমাজের মনোরঞ্জন বা প্রয়োজন সাধন করেই একদিন তা অন্তর্হিত হয়ে যায় মানুষের ইতিহাস থেকে। বিশ্ব-সাহিত্যের স্থায়ী কীর্তি যে গুলি, তা চিরদিন বেঁচে আছে তাদের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্যের জোরে এবং সে সত্য সমস্ত মানুষের কাছে সমান অর্থবান।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এ অভিমত সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে সুপরিচিত আদর্শবাদেরই পুনরুক্তি। এই মত অনুসারে মানুষের মনোধর্ম হল একটি অপরিবর্তনীয় জিনিষ। যুগে যুগে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন হয়, জীবন-যাত্রার আদর্শ বদলায়, নানা নূতন উদ্ভাবন ও আবিষ্কৃতির ফলে। কিন্তু হৃদয়ের যে সমস্ত বৃত্তির জন্যে মানুষ মানুষ, তা সর্বকালেই থাকে এক। এইজন্যে যা সুন্দর, যা মহৎ, যা বিচিত্র, যা আনন্দ-বেদনায় চিরঅম্লান, তার কোনদিন পরিবর্তন নেই। যুগে যুগে বদলায় তার নির্মোক, কিন্তু সমস্ত বহিরুপাদানের আড়ালে অবস্থিত যে প্রাণবস্তু, তা থাকে চির-অবিকৃত। আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহ, জন্ম-মৃত্যুকে মানুষ চিরদিন দেখেছে একই চোখে। বিশ্বের শোভা-সৌন্দর্য, শক্তি-সমৃদ্ধি মানুষকে চিরদিনই ভাবিয়েছে

এক রকম করে। জননীর স্নেহ, প্রিয়ার প্রণয়, প্রকৃতির আশীর্বাদ, মানুষ গ্রহণ করেছে চিরদিনই এক রকম অনুরাগে। এই জন্যেই বাল্মীকি-ব্যাস, হোমর-এস্কিলাস, হাফেজ-কালিদাস চিরদিনের কবি, সমস্ত মানুষের কবি। অর্থাৎ—

Each new age hath a story as old as the Sun's.

এই আদর্শবাদের সমর্থক রূপেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য থেকে তথাকথিত বাস্তবতার দাবী নাকচ করার পক্ষপাতী ছিলেন। এর মানে এই নয় যে তিনি তাঁর সাহিত্যিক আদর্শ সংস্থাপিত করেছিলেন হাওয়ার ওপর। তিনি বাস্তবকে স্বীকার করতেন ভিত্তি হিসাবে, কিন্তু বাস্তবের ওপর বিচিত্র কল্পনার দ্যুতি পাত করে, তাকে তিনি বস্তু-সীমার ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। তাঁর মতে বাস্তবের স্থান হল রসসৃষ্টির পশ্চাৎপটে, পুরোভাগে যা ফুটে উঠবে, সে হল রচয়িতার মানস-রূপ। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে মূলনীতি তাঁর নানা সময়ের সমালোচনা নিবন্ধে স্থান পেয়েছে, তা ধরে বিচার করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই আমরা।

কিন্তু মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্যাখ্যা করে এই মতবাদকে যাঁরা সমর্থন করেন না, তাঁরা বলেন, মানুষের মন একটা আট-ঘাট বাঁধা মূল জিনিষ নয়। তা হল কতকগুলি বৃত্তি ও সংস্কারের সমষ্টি এবং সে সব সংস্কারের জন্ম বাস্তবের সঙ্গে সংশ্রব থেকে। বাস্তবে নূতন নূতন উদ্ভাবন ও আবিষ্কৃতি যতই জীবন যাপনের আদর্শ ও পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনে, ততই (তার ওপর নির্ভরশীল) মনোবৃত্তির প্রকৃতি ও পদ্ধতি অলক্ষ্য বদলাতে থাকে। সভ্যতার আদিতে প্রকৃতিকে মানুষ যে চোখে দেখেছিল, আজকের বিজ্ঞান-বুদ্ধি সমৃদ্ধ মানুষও তাকে সেই চোখেই দেখে না। জীবন-রহস্যের বিভিন্ন দিককে পুরাণো মানুষ যে ভাবে বুঝেছিল, দর্শন ও মননের উন্নততম স্তরে এসে আজো মানুষ তাই বোঝে না। এমন কি, এঁরা বলেন যে দয়া-মায়া, প্রেম-বিরহ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তিকে আমরা শাশ্বত বলে মনে করি, সে-ও অপরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার ভেতর পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ হয়ে থাকার ফল। যদি এই সমাজ-বিধান পাল্টে ফেলা যায় এবং নূতন করে শৈশব থেকে মানুষকে নূতন সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে গড়ে তোলা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এ জিনিষ-গুলোও বাইরে থেকে আরোপিত। এই জন্যেই এঁরা তথাকথিত কল্পনাবাদী

সাহিত্যের মহিমা স্বীকার করেন না, বা সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি সেই অনুসারে বেঁধে দেওয়ারও সমর্থন করেন না।

এঁরা বলেন, সাহিত্য হল বাস্তব আবেষ্টনী থেকে আহৃত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা গুলির সুষ্ঠু বিন্যাস, আর তার উদ্দেশ্য হল মানুষকে তার জীবন ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজাগ করে তোলা এবং তাকে চিন্তা ও মননের ভেতর দিয়ে নূতনতর মহত্তর সৃষ্টির পথে অনুপ্রাণিত করা। সে সৃষ্টি এঁদের মতে বস্তু-সংসারের চতুঃসীমাতেই আবদ্ধ। এর বাইরে বিদেহী কোন কল্প-লোককে এঁরা স্বীকার করেন না। সৌন্দর্য, প্রশান্তি ও বিশ্বকল্যাণের নামে বস্তুকে এড়িয়ে, লোকত্তর রসসৃষ্টির প্রয়াসকে এঁরা তাই অসার্থক মনে করেন। এঁরা বলেন, পরশ্রমজীবী বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা, সৌন্দর্যবাদ প্রভৃতির সাহায্যেই তার অধিকার কায়েম রাখার চেষ্টা হয়েছে। আদর্শবাদী সাহিত্য সেই কায়েমী স্বার্থেরই একটা বৃহৎ অস্ত্র বলে এঁদের বিশ্বাস। এঁরা তাই মনে করেন যে যে-বিবর্তনের ধারায় সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আদি ও মধ্যযুগের ভেতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে, তা মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মতো সাহিত্যকেও নূতন করে গড়ে তোলার প্রেরণা দিয়েছে। সে হল গণসাহিত্য রচনার প্রেরণা। অর্থাৎ একালের সাহিত্য নিছক রসসৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত থাকবে না, তাকে হতে হবে অন্যান্য উৎপাদনমূলক শ্রমের সামিল এবং সেই জন্যেই তাকে করতে হবে বাস্তবের আনুগত্য। অর্থাৎ প্রতিদিনের জীবনে নেমে আসতে হবে।

বলা অনাবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথ এই মত স্বীকার করতেন না। তিনি বলেছেন তত্ত্ব, তথ্য, মত, মন্তব্য, যাই কেন না আসুক সাহিত্যে, তা হল গৌণ। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হল রসসৃষ্টি এবং সে-রসের স্থিতি বাস্তবের ওপর হলেও, তার গতি বাস্তবাতীতের দিকে। কাজেই সাহিত্য সম্পর্কে কোন সে-কাল এ-কালের প্রশ্ন উঠতে পারে না। ওর আদর্শ চিরদিনকার। গণসাহিত্য বা শ্রেণী সাহিত্য বা আর যে কোন রকম জাতি-বিভাগের ছকেই সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হক, সাহিত্য এক অখণ্ড বস্তু, তার এলাকাও দিগন্ত বিস্তৃত। কাজেই শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা সামনে নিয়ে যা লেখা হয়, শুধু তা-ই সাহিত্য নয়, শ্রেণী-স্বার্থের সমর্থন করেও উচ্চাঙ্গের

সাহিত্য হতে পারে। এতকাল হয়েছেও তাই। বরং তথাকথিত গণসাহিত্যই এখনো তার প্রাণশক্তির পরীক্ষায় ষোল-আনা জয়যুক্ত হয়নি। তিনি বলেন, পলিমৃত্তিকা কোন স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন করতে পারে না। অর্থাৎ কেবল মাত্র শ্রমজীবীই যুগ-সংস্কৃতির সর্বাত্মক প্রতিভূ হয়ে উঠতে পারে না।

বলা বাহুল্য এটা তর্কের বিষয় এবং এ তর্কের দু-কথায় মীমাংসা হওয়া কঠিন। তবে কবির একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্যে যুগে যুগে আদর্শে, অবলম্বনে, দৃষ্টিভঙ্গীতে যতই কেন না পরিবর্তন আসুক, একটা জায়গা আছে, যেখানে সে চিরন্তন এবং সে জায়গাটা বস্তু নয়, ভাব।

= ৭ =

শিল্প-কলা *

সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার, এক কথায় সমগ্র ভাবে শিল্পের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত বোধহয় আরো একটু বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।

সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ মতবাদের বাহন বলে স্বীকার করতেন না, কোন সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যম হিসাবে তার ব্যবহারেরও তিনি সমর্থক ছিলেন না, একথা আগেই বলেছি। তাঁর মতে যদিও বাস্তবই হল সাহিত্যের আদি-ভূমি, তবু প্রাত্যহিক বাস্তবকে অতিক্রম করে চিরন্তন সত্য ও সৌন্দর্যের কোঠায় উন্নীত হওয়াই সাহিত্যের ধর্ম। অর্থাৎ বাস্তবের দুঃখ-বেদনা, আঘাত-অবমাননা, ব্যর্থতা-বঞ্চনা, অসঙ্গতি-অনৈক্য সাহিত্যের আসরে আসবে, কিন্তু রসের ঐশ্বর্যে, কল্পনার সমৃদ্ধিতে, অলঙ্করণের চাতুর্যে তা প্রাত্যহিকতার সীমা ছাপিয়ে উঠতে না পারলে, সাহিত্যের প্রীতিভোজে তারা কখনই জলাচরণীয় হয়ে উঠবে না। যা সুন্দর, যা শান্ত, যা আনন্দঘন, তাই হল তাঁর মতে সাহিত্যের আদর্শ, উপকরণ তার যাই হক না কেন।

আগেই দেখিয়েছি যে তাঁর মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে-কাল এ-কাল বলে কিছু নেই। যুগে যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যবহারিক চেহারায় পরিবর্তন হয়, জীবন-যাপনের প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে ওলট পালট হয়, কিন্তু মানুষের মনোবৃত্তির মৌলিক সূত্রগুলি অবিকৃতই থাকে। তাই প্রাচীন যুগে, মধ্যযুগে, আধুনিক যুগে মানুষের মনন ক্রিয়ার প্রকৃতি একই রয়ে গেছে। "সৌন্দর্যবোধ, শুভবুদ্ধি, আসঙ্গ লিপ্সা, আর যা-কিছু বোধ জৈব বৃত্তির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তার কিছুই বদল হয়নি। ওরা শাশ্বত, সেই জন্যেই সত্য ও সুন্দর। একখানি চিঠিতে তিনি কৌতুক করে বলেছেন, 'আমরা দেখিয়েছি দুকূল দুলিয়ে বকুল বনে যাওয়ার প্রলোভন। অনুনয় করেছি অলক্তরঞ্জিত মঞ্জীরশিঞ্জিত পদে অনুপ্রাস-মুখর ত্রিপদীছন্দের তালে তালে চলতে। কালধর্মে ফ্যাসন বদলেছে। তোমরা আজ আমন্ত্রণ করো পার্কে, পরে আসতে বলো স্লিপার,

নয়ত হিল-তোলা জুতো এবং পত্তির মধ্যে তোমরা আনতে চাও ক্ষিপ্রতা। কিন্তু আসল পরিবর্তনটা কোথায়? উদ্দেশ্য সেই একই। তা সে-কাল এ-কাল সব কালের বড় আদালতেই পেয়েছে আপনার স্বীকারনামা।'

এই দৃষ্টিভঙ্গীর দরুণই সাহিত্যকে তিনি সাম্প্রতিক রাজনীতি ও সমাজ-কল্যাণের হাতিয়ার মাত্র মনে করতেন না, বা দক্ষিণ-বাম কোন বিশেষ মার্গের দাসত্বে সাহিত্যকে নিয়োজিত করারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে সাহিত্য হচ্ছে মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট অনুভূতি গুলির প্রকাশ, সে-অনুভূতি যে পথেরই হক না কেন এবং সে-প্রকাশকে তিনি অলঙ্করণের আভিজাত্যে অভিষিক্ত করে নেওয়ারই সমর্থক ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'মত জিনিষটা হচ্ছে সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবদেহের অন্তর্গত কঙ্কালের মতো। ওটা ভেতরে থেকে সাহিত্যকে জোগাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি। বাইরে প্রকাশ পাবে তার বিচিত্র দেহসৌষ্ঠব, তার লাবণ্য। কিন্তু অঙ্গ-সজ্জাকে আজ মনে করা হচ্ছে অনাবশ্যক, মনে করা হচ্ছে অসার্থক। নিছক কাজের কথা বলাই হয়েছে হাল আমলের লক্ষ্য, আর সে-কথা হচ্ছে দরিদ্রের উন্নয়নের কথা। দারিদ্র্য আছে, তার উন্নয়নের দাবীও থাকবে সাহিত্যে। কিন্তু তা ছাড়া আর কিছুই কি থাকবে না? সৃষ্টি-চক্রে শুধু পঙ্কটাই গণ্য হবে সত্যি বলে, আর পঙ্কজটি হয়ে যাবে মিথ্যা? শিল্পীকে এই জন্যেই হতে হবে সহজ। কোন বিশেষ মতবাদের কাছে যদি তিনি দাসখৎ লিখে দিয়ে বসেন, তাহলে পক্ষপাতের কুয়াসায় তাঁর সত্য দৃষ্টি হবে বাধাপ্রাপ্ত, তাঁর সাহিত্যও হবে সত্যভ্রষ্ট। এই জন্যেই সাহিত্যের যা সত্য, তা কোন বিশেষ আমলের রাজনৈতিক প্রপাগ্যাণ্ডার লেজুড় ধরে চলতে পারবে না।'

বলা বাহুল্য এখানে তিনি লক্ষ্য হিসাবে নিয়েছেন আধুনিক বামপন্থী আন্দোলনকে এবং এ আন্দোলনকে তিনি সাহিত্যের দিক থেকে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন। তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন একখানি চিঠিতে, 'হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হল যে এতদিন যা সুন্দর বলে, মহৎ বলে, সার্বজনিক বলে ধরা হয়ে এসেছে, তা গর্হিত। কেন না তার পিছনে রয়েছে বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রশ্রয়। যারা কায়িক শ্রম করে এবং সেই শ্রমের লভ্যাংশ যারা ভোগ করে, তাদের মধ্যে চিরদিন চলে এসেছে যে বিরোধ, তাকে রাজনীতির পোশাক পরিয়ে আজ সাহিত্যের আসরে ডেকে আনা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এই

বিরোধের নিষ্পত্তিই হল আধুনিক সাহিত্যের চরম লক্ষ্য। এর বাইরে আর যা-কিছু রইল, যেহেতু তা কায়িক শ্রমে যারা জীবিকাহরণ করে, তাদের প্রয়োজনের বা আয়ত্তের বাইরে, সেই জন্যেই তার উচ্ছেদ প্রয়োজন। বেশ কথা, তা হলে সংস্কৃতি থাকবার দরকার নেই, শিল্প-সাহিত্যই বা থাকবে কোন গরজে ?

কবির শেষ কয় বৎসরের প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে এই কথাটা বার বারই নানা আকারে ঘুরে এসেছে। বলা অনাবশ্যক যে সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর যা অভিমত, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে তা চমৎকার ভাবেই রূপায়িত হয়েছে এবং তার মহিমাও সবাই পূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও মননধারার মৌলিক অপরিবর্তনীয়তাকে (যার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই মতবাদ) ইদানীন্তন কালের সমালোচকরা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন আসে জীবন-যাপনের মান এবং উপকরণ বদলালে এবং সেই পরিবর্তন অজ্ঞাতসারেই আমাদের সংস্কার ও ধারণার রাজ্যে ওলট পালট ঘটায়। তবু যে আমরা ভূতপূর্ব সংস্কার ও মতবাদের জের টেনে চলি, সে শুধু সমাজ-সংস্থানের আদি-কাঠামোটা আজো বদলানো যায়নি বলেই। যদি এই প্রাক-ব্যবস্থিত সমাজ ও তার আনুষঙ্গিক রীতি-পদ্ধতিগুলি আমূল ঢেলে সাজা যায়, তাহলে তার আশ্রয়চ্যুত হয়ে সমগ্র সমাজ-চেতনাই বদলে যাবে। সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখানো হয়। পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, আর্ট নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করেছেন এবং তাতে আশাতীত সাফল্যও লাভ করেছেন। আমাদের সাহিত্য থেকেও যদি শ্রেণীস্বার্থ বা তার পরিপোষক রোমান্টিক আদর্শবাদকে কোনদিন বিতাড়িত করা হয়, তাহলে তাতে ভয়ের কিছু নেই হয়ত। কিন্তু যে সমাজ-ব্যবস্থার মাতৃস্তন্য থেকে জন্মাবে সেই নূতন সাহিত্য বোধ, তার আবহাওয়া কোথায় ? সমাজে চলেছে এখনো মধ্যযুগ। ধর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সর্বত্র চলছে তারি দাপট। তাকে বদলাতে হলে চাই রাশিয়ার বা চীনেরই মতো বিপ্লব। কিন্তু সে-বিপ্লব দানা বাঁধবে কৌলিক ও ভৌমিক একাধিকার ভেঙে তার স্থানে ব্যাপক শ্রম-শিল্পের প্রসার এবং শ্রমিক সংহতি সম্ভবপর হলে। মাঝখানকার ধাপগুলি টপকে শেষ ধাপে পা নেবার চেষ্টা করছি আমরা, তাই আমাদের বামপন্থী আন্দোলন আজো ঠিক জীবন থেকে উৎসারিত

হয়নি। সেদিক থেকে বামপন্থী সাহিত্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ একেবারে অমূলক, এমন কথা বলা যায় না।

সঙ্গীত ও চিত্র-কলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব। গানে সুরের আসন যে উঁচু রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করতেন, কিন্তু কথাকে তাই বলে সুরের বাহন মাত্র মনে করতেন না তিনি। সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে গানের কথা আত্ম-স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে উপভোগ্য নয়, এমন গান রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনদিন লেখেননি। তাঁর সঙ্গীত গাইলে গান, পড়লে কবিতা। অর্থাৎ গান ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাণধর্মী, সুর তাঁর মতে প্রাণ বস্তুর পরিপোষক, যদিও কথাই সেই প্রাণের প্রকৃত ধারক ও বাহক। তাই নিছক সুরের আলাপকে তিনি নির্জ্জোল কণ্ঠকুস্তি মনে করতেন। বাল্যে যদুভট্টের এবং পরিণত বয়সে রাধিকা প্রসাদের সাহচর্য করলেও, বনিয়াদী ক্ল্যাসিক পন্থার সঙ্গে তাঁর অন্তরের মিল ছিল না। নিজে তিনি ক্ল্যাসিক্যাল সুরের গান বেশী লেখেননি, পক্ষান্তরে কীর্তন, ভাটিয়াল, বাউল প্রভৃতি গ্রাম বাংলা সুরকেই দিয়েছেন প্রাধান্য। তথাকথিত হিন্দুস্থানী গান সম্বন্ধে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট এবং সে মতামত নিয়ে তর্কও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তাঁর স্বরচিত গান নিয়ে যাঁরা বিচার করবেন, তাঁরা সহজেই সে তর্কের সমাধানে পৌঁছবেন।

হ্যাভেল, ওকাকুরা ও অবনীন্দ্রনাথের মিলিত নেতৃত্বে এদেশে যখন চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন হয়, রবীন্দ্রনাথেরও তাতে প্রধান একটি ভূমিকা ছিল। প্রাচ্য শিল্প রীতির ব্যাখ্যান সূত্রে তিনি অবনীন্দ্র নন্দলালের শিল্প-পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন প্রচুর। কিন্তু নিজে তিনি যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন (সংখ্যায় তা প্রায় দেড় হাজার), তাতে একেবারে ইউরোপীয় অতি-বাস্তবিক (Sur-realistic) অঙ্কণেরই গোত্রসাদৃশ্য দেখি। মাতিস ও পিকাসোর কতক ছবির সঙ্গে তাঁর ছবিগুলি সহজেই মিশিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য পিকাসোর অঙ্কণ রীতির পিছনে ছিল তাঁর নিজস্ব একটি দার্শনিক মত, আর রবীন্দ্রনাথ স্বভাবত চিত্রশিল্পী ছিলেন না বলে, এজন্যে তাঁর ছিল মৃদু একটা কৈফিয়ৎ।

চিত্রাঙ্কণকে তিনি বিধিবদ্ধ অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করেননি, তাই অঙ্কণের যা গ্রামার, তা ছিল তাঁর অজ্ঞাত। ভেতরকার সৃজনী মনের

তাগিদেই তিনি তুলি চালনা করেছেন। তা নিজের খেয়ালেই সৃষ্টি করে গেছে নানা 'রূপ', যা কখনো হয়েছে বাস্তবের প্রতিরূপ, কখনো বা তাঁর মনের। কেতাবী মতে ছবির পরিপ্রেক্ষিত, আঙ্গিক সংস্থান ও বর্ণ-বিন্যাসের কারিকুরি নিয়ে বিচার করলে তাই তাঁর সব ছবি হয়ত রসোত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে না। কিন্তু ছবির প্রাণ-বস্তু যা, তা তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতেই পাওয়া যাবে।

নিজের ছবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'একটা কিছু বলতে চাই নিশ্চয় ছবির মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সেই একটা কিছু তোমার পরিচিত বস্তু বা বিষয়ই হতে হবে, একথা মানি না। রবীন্দ্রনাথের এই কথাই পিকাসোপন্থীরাও বলেছেন। তাঁরা বলেন, সাহিত্যে বা শিল্পে আমরা ভাব প্রকাশ করি যে ভাষায়, সে ভাষা অভ্যস্ত বলেই তার অসম্পূর্ণতা আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু মনের প্রকৃত প্রতিরূপ অঙ্কণে এরা বড়ই অপটু বাহন। মনের অবচেতন পর্দায় কোন জিনিষই পরস্পর-সম্বদ্ধ হয়ে নেই, সবই আছে একে অন্যের সঙ্গে তাল-গোল পাকিয়ে। তাই বাইরের একটু কোন রঙ্গতে বা উদ্দীপনায় মনের ভেতর যখন কোন ভাব রূপ পরিগ্রহ করে, তখন তা সমগ্র ও সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ চেহারা নিয়ে গড়ে ওঠে না, অনেক কিছু খণ্ড-চিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে তা হয়ে ওঠে একটা অখণ্ড অসংলগ্নত। আর্টে তাই মনের যে রূপটি প্রকাশ পায়, তা খাঁটি জিনিষ নয়। বাইরে থেকে তৈরী করা অভ্যাসের আনুগত্য করতে করতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি বলেই, এর কৃত্রিমতা আমরা ধরতে পারি না।

এঁরা বলেন, খাঁটি জাতের আর্ট সৃষ্টি করতে হলে এই কৃত্রিমতার হাত এড়াতেই হবে, অবচেতনাকে রূপ দিতে হবে শিল্পের মধ্যে। এজরা পাউণ্ড, কাম্মিংস প্রমুখ কবিরা এবং পিকাসো, মাতিস প্রমুখ চিত্রশিল্পীরা তাঁদের রচনায় এই মতবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের সৃষ্টিতে যে দুর্বোধ্যতা দেখা যায়, তা নাকি এই জন্যেই। সাহিত্যে এই অবচেতনার অভ্যুদয়কে রবীন্দ্রনাথ আদৌ সমর্থন করেননি। বাংলা দেশে এই দিক থেকে যে আন্দোলন হয়েছে, তিনি তাকে নিন্দাই করেছেন। কিন্তু চিত্রাঙ্কণে তিনি নিজেই এই পথাবলম্বী। তাঁর ছবিগুলি অবচেতনারই প্রতিফলন, তাই বাইরে তাদের সঙ্গতি বা সুষমা সব সময় খোলা চোখে ধরা পড়ে না।

চতুর্থ স্তবক

রবীন্দ্র চর্চা

যাঁরা লোকোত্তর মণীষার অধিকারী, যাঁরা চিরন্তন শিল্পের স্রষ্টা, তাঁদের সম্বন্ধে মানুষের কথা কোন দিন ফুরায় না। প্রতি যুগ তার নূতন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টি-কোণ থেকে করে তাঁদের ওপর নূতন আলোক-পাত। তাই যত দিন যাচ্ছে, ততই দান্তে সেক্সপীয়ার মলেয়ার ও গ্যেটেকে মানুষ নূতন করে আবিষ্কার করছেন। রবীন্দ্রনাথও তেমনি নব নব রূপে উদ্‌ঘাটিত হবেন সংস্কৃতির ইতিহাসে। কারণ তিনিও ঐ অমর গোষ্ঠীর একজন।

কিন্তু সে জন্যে সময় দরকার। বেশ একটু দীর্ঘ সময়ই হয়ত। যাঁরা তাঁকে সমসাময়িক রূপে দেখার ও জানার সুযোগ পেয়েছিলেন, যাঁদের ভাগ্য হয়েছিল তাঁর সান্নিধ্যে আসার এবং তাঁর মুখে তাঁর জীবন, মনন ও শিল্প-কর্মের নানা দিকের কথা শোনার, তাঁরা পরবর্তী কালের জীবনীকার ও সমালোচকদের জন্য প্রামাণ্য ও প্রয়োজনীয় মাল-মশলা অবশ্যই রেখে যেতে পারেন অনেক। কিন্তু নিজেরা তাঁরা কিছুতেই পারেন না রবীন্দ্র-জীবন ও প্রতিভার সামগ্রিক হিসাব-নিকাশ করে যেতে। কেন বলছি।

কোন মহৎ মানুষের সমসাময়িক হওয়ায় সৌভাগ্য যেমন আছে, তেমনি আছে কিছু দুর্ভাগ্যও। প্রধান দুর্ভাগ্য হল, সমসাময়িকের নিজস্ব রুচি, চিন্তা ও আদর্শের পক্ষপাত তাঁকে যুগ-প্রধান সম্বন্ধে ষোল-আনা শ্রদ্ধাশীল বিচারক হতে দেয় না। এই যেমন এক দিক, তেমনি আছে আর এক দিক এবং সে হল ভক্তি-বিহ্বল আত্মবিস্মৃতি এবং তা-ও অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় সত্য বিচারের। ফলে হয় বাঁকা চোখে দেখা ও বেঁকে চোখে বলা, নয় নির্বিচার মত্ততায় করতালি বাজানো, এর যে-কোনটাতে পর্যবসিত হয় সমসাময়িকের বিচার।

সময়ের ব্যবধানে যখন ব্যক্তি-সম্পর্কের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যায় সমাজ থেকে তখনি আসে খাঁটি হিসাবের দিন। অনেক এক-দিনের খাঁটি জহরৎ সেদিন মাটি বলে চেনা যায়। এক-দিনের অনেক ধিকৃত ইতিহাসের আবার হয় মহৎ মূল্য নূতন করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। সেদিন থাকে না লাভালাভ বা খাতির-অখাতিরের প্রশ্ন, থাকে না কোন রকম ভয়-ভাবনাও।

সত্যিকার রবীন্দ্রোপলব্ধি সম্ভব হবে সেই রকম কোন অনাগত দিনেই। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক আমাদের কি নেই কোনই কর্তব্য? অবশ্যই আছে। তাঁর কর্ম ও চিন্তার সমস্ত দিকের দলিল-দস্তাবেজ, তারিখ-তথ্য ও মাল-মশলা জাতির হেফাজতে জমা করে যেতে হবে এবং তাঁকে আমরা ঠিক কেমনটি দেখেছিলাম, কি রকম বুঝেছিলাম, তার স্বাক্ষরও রেখে যেতে হবে। এগুলিই করবে পথ-নির্দেশকের কাজ, ভাবী দিনের পথচারীদের জন্য।

আমাদের আজকের রবীন্দ্র-চর্চা প্রকৃত পক্ষে এর বেশী কিছু নয়। আমরা যা-কিছু লিখেছি ও বলেছি, যা লিখছি ও বলছি তাঁর সম্বন্ধে, তার মধ্যে দিয়ে আসলে আমরা প্রণতি জানাচ্ছি সেই পুরুষোত্তমকে, যিনি আমাদের চোখে আলো দিয়ে গেছেন, মুখে দিয়ে গেছেন ভাষা, আর সমগ্র জীবনে দিয়ে গেছেন একটি প্রত্যয়, যা পরমার্থ স্বরূপ।

মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক কালের লেখক-তালিকায় ছিলেন সর্বপ্রধান স্থানে এবং সে শুধু এদেশে নয়, বলতে গেলে সব দেশেই। রাশিয়ায় গোর্কি, ফ্রান্সে আনাতোল ফ্রাঁস, রলাঁ, জার্মানীতে মান, বৃটেনে বার্নার্ড শ, য়েটস, এই রকম দু-চার জন ছাড়া তাঁর সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে, এমন নাম সেদিন খুব বেশী ছিল না দুনিয়ায়। বরং অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রধান মানুষ যাঁরা, যেমন আইনষ্টাইন, ফ্রয়েড, বার্গসঁ, ক্রোচে, রাসেল, তাঁদের সঙ্গেও যুক্ত ভাবে অহরহ উঠত রবীন্দ্রনাথের নাম। প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ একাই ছিলেন একটা যুগ এবং সুদীর্ঘকাল তিনিই ছিলেন সে-যুগের মুখ্য নায়ক।

= ১ =

রবীন্দ্র-মনের দার্শনিক ভিত্তি

চলতি অর্থে যাকে দর্শন বলে, তা একটা বিধিবদ্ধ শাস্ত্র এবং তার ব্যাপারী যাঁরা, তাঁরাই অভিহিত হন দার্শনিক নামে। কিন্তু দর্শনের য মর্ম-বস্তু, তা নিহিত থাকে যে-কোন মননশীল মানুষের চিন্তার মধ্যেই। সে হিসাবে তাঁদের দার্শনিক বললে অন্যায় বা অসঙ্গত হয় না মোটেই।

জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞানী, কিন্তু বিজ্ঞানের বাঁধা সড়ক ধরে চলতে চলতে তিনি জগত ও জীবনের গভীর অন্তর্লোকে এসে হাজির হয়েছেন যেখানে, সেখানে তিনি দার্শনিক। এই অর্থে দার্শনিক টয়েনবীও, যিনি ইতিহাসের পদচিহ্ন ধরে চলতে চলতে, মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদি-উৎসে এসে উপনীত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকেও আমরা দার্শনিক বলি এই অর্থেই। জগত ও জীবনের মর্ম-লোককে স্পর্শ করেছেন তিনি, চলতি ঐতিহ্যের আলোক সম্পাত করে নয়, আপন মননশীলতার আলোয় সব কিছুকে উদ্ভাসিত করে এবং এই মৌলিকতাই হল দার্শনিকতা, আর পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই এই অর্থে দার্শনিক।

কিন্তু বিপদ হল রবীন্দ্র-দর্শনের নিষ্কর্ষ আহরণ করা এবং তাকে একটি সুসংহত তত্ত্ববস্তু রূপে দাঁড় করানো নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ কি? জাতীয়তাবাদী, না আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও বিশ্বমানবতা বাদী? তিনি আস্তিক, না নাস্তিক? আস্তিক হলে বাক্য-মনের অগোচর চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসক, না ব্যক্তি-প্রতীকে রূপায়িত লৌকিক দেব-দেবীর উপাসক? তিনি সরল, আড়ম্বরহীন, বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞান দীপ্ত প্রাচীন তপোবন-সংস্কৃতির সমর্থক, না বিজ্ঞান-ভূয়িষ্ঠ গতি ও উৎপাদন-সমৃদ্ধ আধুনিকতার অনুগামী?

বলে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রবৎ বিশাল সাহিত্যে সব কিছুরই নিদর্শন মিলবে। এমন অনেক গান, কবিতা ও প্রবন্ধ দেখানো যাবে, যা নিছক জাতীয়তা বাদের প্রাণরসে পুষ্ট। আবার এমন রচনাও তাঁর সংখ্যায় কম নয়, যাতে জাতীয়তাকে তিনি অনভিপ্রেত, এমন কি, বিপজ্জনক প্রতিপন্ন

করেছেন, প্রচার করেছেন আন্তর্জাতিকতার মাহাত্ম্য। এমন অনেক গান, কবিতা ও তত্ত্বব্যাখ্যা মূলক নিবন্ধ পাওয়া যাবে, যা থেকে তাঁকে একটি অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের আচার্য রূপে দাঁড় করানো কঠিন নয়। আবার এমন রচনাও প্রচুর মিলবে, যা দেখিয়ে তাঁকে ভক্তিবাদী হিন্দুরূপে বিচার করলে দোষের হয় না। তাঁকে নিরীশ্বরবাদী জড় নিসর্গ-শক্তির উপাসক প্রমাণিত করার মতো রচনাও খুঁজলে খুব অল্প পাওয়া যাবে না। তথাকথিত তত্ত্বজ্ঞান সমুজ্জ্বল তপোবন-সভ্যতার অনুকূল লেখা পাওয়া যাবে ভূরি ভূরি। আবার বিজ্ঞান প্রভাবিত গতিশীল ও প্রচুরতা-প্রদীপ্ত এই যুগধর্মের সমর্থনেও তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করা যাবে চেষ্টা করলেই পর্যাপ্ত সংখ্যায়।

তাহলেই দাঁড়াল, রবীন্দ্র দর্শন বলতে কি বুঝব? কোন খানে তার প্রাণগত ঐক্য, কি ভাবে সমন্বয় স্থাপন করা যাবে এই আপাত-বিরোধী মত, পথ ও দৃষ্টিভঙ্গী গুলির মধ্যে? যদি সত্যিই প্রতিষ্ঠিত না করা যায় এই ভগ্নাংশগুলির মধ্যে কোন প্রাণবন্ত যোগসূত্র, সব গুলোকেই যদি বিভিন্ন সময় ও পরিবেশে সঞ্জাত বিচ্ছিন্ন ভাব-ধারার অভিব্যক্তি বলে নিতে হয়, তাহলে যে মহত্ত্ব আমরা আরোপ করি রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার উপর, তা কি সত্য বা সমর্থনীয় বলে প্রমাণিত হবে? বলা বাহুল্য, এই জায়গায় রবীন্দ্র-চর্চা আমাদের এখনো নিতান্ত দুর্বল ও অসম্পূর্ণ রয়েছে। আমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে তাঁর সাহিত্যের নানা বিভাগ নিয়ে, তাঁর জীবন ও কর্মের নানা অংশ নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু অখণ্ড মানুষটিকে তাঁর পূর্বাপর পরিণতির আলোয় ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারি নি। পারি নি, কারণ তার প্রয়োজনই উদিত হয়নি আমাদের মনে।

এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত রকম খণ্ডিত, বিকৃত বা ঐকদেশিক মত একই সঙ্গে প্রকাশমান হতে দেখা যায়। কেউ তাঁকে বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ প্রচারিত নব্য হিন্দু জাতীয়তা বাদের অপরতম প্রধান পুরোহিত বলে বোঝান। কেউ আবার তাঁকে রলাঁ, মান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিকতাবাদীর সঙ্গে একাসনে বসান। কেউ তাঁকে দেবেন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রনাথের ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্ম আচার্য, কেউ বৈষ্ণবী যুগলারাধনার ভাবে ভাবিত প্রেমের কবি বলে বোঝান এবং বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ প্রাগাধুনিক ব্রাহ্ম-বৈষ্ণবদের সমপদবী ভুক্ত করেন। কেউ তাঁকে অতীত

পুনরুজ্জীবনবাদী ওরিয়েন্টালিষ্ট রূপে দাঁড় করিয়ে ঋষি সংজ্ঞা দেন। কেউ আবার বুদ্ধি-বিমুক্তির প্রধান নায়ক রূপে রামমোহন বিদ্যাসাগরের পরই সাম্প্রতিক জাতীয় ইতিহাসের মহত্তম স্রষ্টা বলে অভিহিত করেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী বা সংশয়বাদী প্রমাণের লক্ষণীয় কোন চেষ্টা এ পর্যন্ত হয়নি এবং তা না হওয়ার কারণ, এ রকম চেষ্টা এ দেশে ধিক্‌ত ও দণ্ডিত হবার ভয় আছে। তবে হলে হত পারত তা-ও।

সুতরাং সেই আগের প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথকে তাহলে আমরা কি ভাবে নোব? কি বলে বুঝব তাঁকে? যাঁরা তাঁর গান গেয়ে, নাটক অভিনয় করে, কিংবা তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়ে আনন্দ পান, যাঁরা তাঁর প্রবন্ধ পড়ে উপকৃত হন, তাঁদের কাছে এ প্রশ্ন হয়ত অনাবশ্যক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা সত্যি সত্যি চিনতে চান এবং আমাদের জীবন ও মননের গভীরে তাঁর দানের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বা তাৎপর্য কি, তা বুঝতে চান, তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, অপরিহার্য। এদিকটা ঠিক মতো না বুঝে, রবীন্দ্র চর্চা অন্ধের হাতী দেখার মতো মর্মান্তিক এবং সে ব্যাপারই হচ্ছে এখন পর্যন্ত।

মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যখন কিশোর কবি, তখন এদেশে প্রথম হয় হিন্দুমেলার উদ্যোগ এবং রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের প্রভাবে ঠাকুর ভ্রাতৃবৃন্দ তার সঙ্গে যুক্ত হন ঘনিষ্ঠ ভাবে। এরপর গড়ে ওঠে জাতীয় কংগ্রেস এবং তা স্পর্শ করে লোক-চিত্তকে। এ দুইয়েরই প্রভাব পড়েছে রবীন্দ্র-মানসিকতার ওপর। তারপর বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে এল স্বদেশী আন্দোলন এবং তাতে অন্যতম প্রধান নেতা হয়েই দেখা দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র সাহিত্যের জাতীয়তাবাদী অধ্যায়ের জন্ম এখানে। এরপর যখন স্বদেশী আন্দোলন রক্তাক্ত হিংসায় রূপান্তরিত হল, পিছিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তখনি সংঘাতশীল হিংস্র জাতীয়তার বিরোধী হতে সুরু করলেন তিনি। এরই পরবর্তী পরিণতি হল তাঁর আন্তর্জাতিকতা, যা ১৯১৩ সালের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর থেকে ধীরে ধীরে পুষ্ট ও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ১৯৩১ সালে সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণের পরবর্তী দশ বছরে তাঁর এই ভাব রাজ্যের আন্তর্জাতিকতা আবার যে নূতন পথে মোড় ফিরেছে, তা-ও সমান প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ জাতীয়তা থেকে আন্তর্জাতিকতা এবং তা থেকে বিশ্বমানবিকতায় বিবর্তন তাঁর ছেদহীন একটি ঐতিহাসিক ক্রমানুবন্ধে বাঁধা।

এর সব গুলি ধাপ পরের পর মিলিয়ে গেলেই, আমরা পাব রবীন্দ্র-মনের একটি অবিচ্ছিন্ন সচলতার ইতিবৃত্ত এবং তার মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন।

অধ্যাত্ম তত্ত্ব বা জীবন-দর্শনের বিচারেও এই রকম পারম্পর্যের তত্ত্ব বা কার্য-কারণ সূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে। আদি ব্রাহ্মসমাজের স্থাপয়িতা ও আচার্য পিতা দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই তাঁকে উপনিষদের অর্থাৎ তথাকথিত ব্রাহ্ম মতবাদের প্রেরণা দিয়েছিলেন। ধর্মের তত্ত্বাংশ বনাম ফলিতাংশ নিয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধ হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ব্রাহ্ম রূপেই এবং পরমহংস যখন ব্রাহ্মদের আক্রমণের বিষয়ীভূত হন, তখনো আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে দেখি ব্রাহ্ম রূপেই। কিন্তু তখনো বোধহয় কবির ধর্মমত কোন প্রত্যয়ের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এরপর শান্তিনিকেতন স্থাপন, পত্নী ও পুত্র-কন্যার লোকান্তর, সাংসারিক জীবনের বিচিত্র বিপর্যয়, স্বদেশী আন্দোলনের অনভিপ্রেত পরিণতি, নানা বাস্তব কারণই জাগিয়ে তুলল তাঁর মনে প্রবল একটি তত্ত্বজিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে ছিল তাঁর কৈশোরে পাওয়া উপনিষদের প্রভাব, যৌবনে পড়া সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব, মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া বৌদ্ধ জীবন-দর্শন এবং বাউল-মরমিয়াদের কাছ থেকে পাওয়া প্রেম ভক্তি দর্শনের প্রভাব। এ সবের মিলিত রসায়নেই ধর্মমতের নানা বিচিত্র দিকের গভীর অভিব্যক্তি হয়েছে তাঁর এ সময়ের গদ্য-পদ্য রচনায়। ব্রহ্মসঙ্গীতে ও গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের গানে তাঁর ব্রাহ্ম-বৈষ্ণব মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় ফুটেছে বেদোপনিষদ সংস্কৃতির অনুগামিতা। শিক্ষা ও জীবনচর্যা বিষয়ক রচনাবলীতে এসেছে বুদ্ধের নীতি-বিশুদ্ধি ও লোক-মঙ্গল বাদের প্রতিধ্বনি এবং জীবনের মহদর্থ ব্যাখ্যানে তিনি নিয়েছেন সন্ত-বাউল মতের নির্দেশনা।

কাজেই এক দিকে তিনি অরূপ অসীমের সন্ধানী, অন্য দিকে প্রেমময় কান্তের সঙ্গে মিলনোৎসুক। এক দিকে রুদ্রকে অন্নপূর্ণাকে লক্ষ্মী ও বীণাপাণিকে চিত্র-প্রতীকরূপে ব্যবহার করছেন তিনি বার বার নিসর্গ-লীলার নানা অবস্থান্তরকে রূপ দেবার জন্যে, অন্য দিকে আবার জগত ও জীবনের অন্তর্লীন

অনির্বচনীয় পরমের প্রেরণাকে ব্যাখ্যা করছেন তিনি অনেকটা তত্ত্বদর্শী অদ্বৈতবাদী রূপেই। তাঁর মনের এই দ্বৈত-স্বরূপটি ব্যাপ্ত থেকেছে অনেক দিন তার গীতি-কবিতায় এবং এখান থেকেই ধীরে ধীরে বার্গসঁর Elan Vital বা দিব্য চেতনার উপলব্ধি জেগেছে তাঁর। এরপর পরমাণু-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে পৌঁছে শেষ জীবনে প্রায় অনিবার্য ভাবেই বস্তু থেকে স্বত-উৎসারিত প্রাণময় বিশ্ব-সৃষ্টির তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন তিনি। অর্থাৎ তিনি হয়েছেন কতকটা নিরীশ্বর প্রাকৃতিক শক্তির ব্যাখ্যাতা এবং তাঁর জীবনের শেষ দুই দশকের রচনাগুলি এদিক থেকেই অনুধাবনযোগ্য।

এই ভাবে কবির সমাজ-বোধ, ইতিহাস-বোধ ও শিল্প-বোধ নিয়েও পূর্বাপর বিচার করে এবং তার দার্শনিক ক্রমানুবন্ধ দাঁড় করানো যেতে পারে। একে একে বিচিত্র দিকের এই ক্রম-বিকাশের ধারাগুলি আবিষ্কৃত হলে, তখনই সেগুলি পরস্পর যুক্ত করে, রবীন্দ্র-মানসিকতা এবং তার দার্শনিক ভিত্তির স্বরূপটি উদ্ঘাটন সম্ভব হবে। সে-কাজে হয়ত আজই সফলতা লাভ করা যাবে না, কারণ সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য রবীন্দ্র-জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তন্ন তন্ন করে পড়া এবং তা থেকে তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করে, এই গবেষণার কাঠামো খাড়া করা যত বড় পরিশ্রমের কাজ, তা করার লোক আমাদের সমাজে বেশী নেই। এক দিকে নৃত্যগীতের আতিশয্য, অন্য দিকে ফাঁকা বক্তৃতার আড়ম্বর, এ দুইয়ের মধ্যে ধূমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন আসল রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁকে বোঝা ও বোঝানোর মহৎ কাজে আজো অগ্রণী হন নি এমন মানুষরা, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে থেকেই তুলে ধরার সার্থক সামর্থ্য রাখেন।

= ২ =

পূর্বাচার্যরা ও রবীন্দ্রনাথ

জার্মাণ পণ্ডিত শ্লেগেল বলেছেন, বিশিষ্ট স্রষ্টা যাঁরা, তাঁদের প্রতিভা বিচারের ক্ষেত্রে 'অন্যের প্রভাব' কথাটা তার আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা সঙ্গত হয় না। নানা দিক-দেশ ও জাতির চিন্তা এবং আদর্শ তাঁদের মননশীলতার বুনিয়াদ গঠন করে, একথা ঠিকই। কিন্তু আপন প্রতিভার রহস্যলোকে তাঁরা এই সমস্ত বাহ্যপাদানকে এমন ভাবে ভেঙেচুরে নূতন করে গড়ে নেন যে তা তাঁদের অধিকারে এসে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষে পরিণত হয়। তখন আদি-উপাদানের সঙ্গে তার সম্পর্ক-সূত্রটি খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

কথাটা তিনি বলেছেন সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে। সেক্সপীয়ারের বেশীর ভাগ বিখ্যাত নাটকই যে তাঁর পূর্বে প্রচলিত থিয়েটারী নাটকের কাঠামো অনুসরণে লেখা, এ সবাই জানেন। সেক্সপীয়ার শুধু পুরানো নাটকের আখ্যানাংশই গ্রহণ করেননি, তার চরিত্র এবং সংলাপও বহু স্থানে অব্যাহত রেখেছেন। এ ছাড়া প্লুটার্কের জীবনী মালা এবং হলিনসেডের ক্রনিকেল থেকেও তিনি বহু জিনিষ হু-বহু গ্রহণ করেছেন। করেছেন বোকেচিওর কাহিনী থেকে। তা সত্ত্বেও কবি হিসাবে, স্রষ্টা হিসাবে, সেক্সপীয়ারের মৌলিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলতে পারেন কি কেউ? মিল্টনও ওলন্দাজ কবি বণ্ডেলের লুসিফার নামক কাব্যকাহিনীর অনুসরণে লিখেছিলেন তাঁর 'প্যারাডাইস লষ্ট'। ঈশ্বরের সঙ্গে শয়তানের যুদ্ধ এবং শয়তান চরিত্রের দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্ব তিনি আহরণ করেছিলেন ঐ গ্রন্থ থেকেই। তবু মিল্টনের মৌলিকতা নিয়েও কোন প্রশ্ন ওঠেনি কোনদিন।

রবীন্দ্রনাথের ওপর পূর্বসূরীদের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভে এই ভূমিকা টুকুর প্রয়োজন এইজন্যে যে রবীন্দ্রনাথও যেখান থেকেই বা যা থেকেই প্রভাবিত হন, সব কিছুকেই স্বকীয় প্রতিভার অনুরঞ্জনে রসান্বিত করে তিনি নিজের করে নিয়েছেন, কোনক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভায় পরানুকরণের ছায়াপাত

হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। তবু চলতি সমালোচনার জগতে প্রভাবের প্রসঙ্গটি অনুল্লেখযোগ্য বা অনালোচনীয় নয়, এই কারণে যে তার সূত্র ধরেই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণের কাজ অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে আসে। মনে রাখতে হবে, স্রষ্টা যত বড়ই হন, তাঁর সৃষ্টি স্বয়ম্ভু নয়। তার শিকড় জাতীয় সংস্কৃতির প্রাণ-মৃত্তিকাতে নিবদ্ধ থাকে। সে-মৃত্তিকার পরিচয় না মিললে, প্রতিভার পরিচয়ও সম্যক উপলব্ধি করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যে তাঁর পিতার সাহচর্য থেকে উপনিষদের মর্ম-পরিচয় লাভ করেছিলেন, এটা সকলেরই জানা আছে এবং তাঁর সারা জীবনের রচনাতেই যে আনন্দবাদ, যে অনন্তবাদ, যে বিশ্বমৈত্রী বাদ পরিস্ফুট হয়েছে, তার মূল হল উপনিষদ, এ কথাও নিশ্চয় প্রমাণ করতে হবে না। এ ছাড়া যে নির্মুক্ত বৈরাগ্য ও সার্বভৌম করুণার যে উদার মানবাত্মবাদের প্রচারক রূপে তিনি প্রসিদ্ধ, তা তিনি আহরণ করেছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে, এ ও সম্ভবত অনেককেই বলে দিতে হবে না। তাঁর মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ 'বুদ্ধকথা' নামক প্রসিদ্ধ বই লেখেন এবং রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্রবে অনেক দিন থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে যে বৌদ্ধ জীবন-দর্শনে তাঁর দীক্ষা হয় সত্যেন্দ্রনাথের কাছেই। আর যে সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়া, প্রতিদান কামনাহীন অকৈতব প্রেমের বাণী তাঁর গানে রূপ পেয়েছে, তা যে তিনি পেয়েছেন বাংলার বৈষ্ণব কবিদের ও উত্তর ভারতীয় সন্তদের কাছ থেকে, এ ত বলাই অনাবশ্যক। কৈশোরে লিখিত 'ভানুসিংহের পদাবলী' থেকে সুরু করে, মধ্য বয়সের 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' পর্যন্ত, সর্বত্র তাঁর প্রেম-সঙ্গীতে বৈষ্ণববাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাংলার বাউল ও উদাসী সম্প্রদায়ের প্রভাবও এই সূত্রে কম লক্ষণীয় নয় তাঁর রচনায়। জগত ও জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যানে যে মরমিয়া তত্ত্বকে তিনি তুলে ধরেছেন, তার উৎস হল এই বাউল সংস্কৃতি।

জীবনকে ও মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এক অফুরন্ত প্রাণ-রহস্যের লীলা রূপে। প্রকৃতিকে দেখেছেন এই প্রাণ-বস্তুর আধারীভূত এক অনন্ত শক্তি রূপে। প্রেমকে দেখেছেন সীমার বন্ধন থেকে অসীমে যাওয়ার সেতুরূপে। সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু, মিলন-বিরহকে দেখেছেন এক অখণ্ড লীলা-সমুদ্রে ফুটে ওঠা বিচিত্র ভাব বুদ্বুদ রূপে। এই যে বিরামবিহীন, অম্লান, অফুরান লীলা, একে

ব্যাপ্ত করে তাঁর মানস-দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে এক অনির্বচনীয় লীলাময়ের রূপ, যিনি কখনো অরূপ, অনন্ত, কখনো সান্ত ও স্বরূপে প্রকাশ! জীবের জীবন ও মরণকে বেষ্টন করে অনাদি কাল থেকে চলেছে তাঁরই খেলা! এই দৃষ্টিভঙ্গী ও তত্ত্ববোধ তিনি অবশ্যই পেয়েছেন উপনিষদ ও বৈষ্ণব দর্শন থেকে, তবু তাকে অতিক্রম করে তাঁর জীবনদর্শন যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানেই যে তাঁর কবি-দার্শনিক প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা, সে বিষয়ে নিশ্চয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত প্রাণ-ধর্মী ও অতীন্দ্রিয় রসানুভূতির ব্যাখ্যাতা হলেও, বাস্তব জীবন এবং বস্তু-সংসারকেও তিনি একেবারে উপেক্ষা করেননি। জগত ও জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য, সমস্ত বৈষম্যকেও তিনি সমভাবেই লক্ষ্য করেছেন এবং সমস্ত আঘাত-সংঘাত ও সমুদয় বিরোধের মধ্যেই তিনি সন্ধান করেছেন একটি সার্থক সমাধানের, যা সব অপূর্ণতা, সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি দূর করে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার সহায়ক। এই থেকেই এসেছে তাঁর বিশ্বমৈত্রীবাদ, এসেছে বাসনবিতৃষ্ণ আনন্দময় বৈরাগ্যবাদ। বিশ্বের সব মানুষকে তিনি আহ্বান করেছেন আপন ভাবের নীড়ে এবং নিজেকেও ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন বিশ্বমানবের মাঝখানে। রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারেও নির্বিশেষ মানবতার এবং সাম্যমতের আদর্শ তিনি আহরণ করেছেন হিন্দু-সংস্কারের প্রাণলোক থেকেই। আবার প্রাচ্য জীবন দর্শনের বাস্তব-বিমুখ মায়াবাদকে পরাজিত করে তাঁর নিজস্ব জীবনবাদও প্রতিফলিত হয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই। উপনিষদ ও বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে এখানে মিলেছে সাম্যবাদী বৌদ্ধ দর্শন, যা বস্তুকে অস্বীকার করে না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী যখন প্রথম ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছায়, তখন ইউরোপ তাঁর এই নূতন জীবন-দর্শনের সুষমায় মুগ্ধ হয়েছিল। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করেছিলেন প্রাচ্য-সাধনার অগ্রপুরোহিত রূপে এবং তাঁর বাণীর মধ্যে মানব-মুক্তির নিগূঢ় সত্য নির্দেশ নিহিত আছে বলে মনে করেছিলেন। এর কারণ সুস্পষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব থেকে বিজ্ঞানের ত্বরিত উন্নতির ফলে ইউরোপের জীবন-যাত্রায় এক দিকে যেমন ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য জমে উঠছিল, অন্য দিকে তেমনি তার অন্তরের সম্পদ, তার পুরানো খৃষ্টীয় প্রেমধর্ম, তার সহজ প্রত্যয়

ও অনাড়ম্বর জীবন-বোধ ক্ষয়িত হয়ে একটা ভোগমুখী উত্তেজনা ও অসুস্থতার বাড়াবাড়ি সুরু হচ্ছিল। সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য প্রসারণের গৃধ্নু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউরোপ হারিয়ে ফেলছিল জীবনের শান্তি ও শ্রেয়মান। এমন দিনে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তাঁদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয় একটা নূতন কল্যাণ ও শান্তির অনাবিষ্কৃত দুনিয়ার রুদ্ধ দ্বার। ফলে কবি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মর্যাদাই সেদিন বেশী স্বীকৃতি লাভ করে প্রতীচ্য জগতে।

আমাদের দেশেও এর পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ আচার্য পদবী ভূষিত হন। কেননা ইউরোপের চোখ দিয়েই তখনো আমরা সব কিছুকে, এমন কি, ভারতবর্ষকেও দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। একথা বলছি এইজন্যে যে যে-সময় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যে প্রাচ্যবাণীর প্রধান উদ্গাতা বলে সম্মানিত হন, তার ঠিক আগেই দেশের সনাতনী সমাজ তাঁর লেখায় বিলাতিয়ানার প্রভাব অত্যধিক বলে ধুয়ো তোলেন এবং তাঁর কবিতা, গান ও গল্পগুলিকে নিষ্ঠুর সমালোচনার শাণিত ছুরিকায় কেটে ছিন্নভিন্ন করতে থাকেন। দেশের জ্ঞানী গুণী ও রসিক সমাজে তাঁর অনুরাগী সেদিনও অনেক ছিলেন, তার আগেও ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বৃহৎ একটি গোষ্ঠী যে এই প্রতিকূলভাব আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, এতেই প্রমাণ হয় যে রবীন্দ্র রচনার অন্তর্নিহিত প্রাচ্য প্রাণ-বস্তুটা সেদিন ঠিক ঠিক ধরা পড়েনি। ধরা পড়ল ইউরোপীয় স্বীকৃতির, বিশেষতঃ নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর। দুঃখের কথা হলেও এটা সত্যি কথা, এ স্বীকার করতেই হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথারও অবতারণা করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আমরা প্রাচ্য সংস্কৃতির দাবীটা সর্বাগ্রগণ্য মনে করলেও, রবীন্দ্রনাথ কি ষোল-আনাই প্রাচ্য সংস্কৃতির সৃষ্টি? লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে, পাশ্চাত্যের হিংস্র স্বাজাত্যবাদ ও তার বস্তুমুখী ইহ-সর্বস্বতাকে রবীন্দ্রনাথ কঠিন ভাষায় আক্রমণ করলেও, তার বৈজ্ঞানিক মনীষাকে, তার পৌরুষদীপ্ত সজীব প্রাণধর্মকে কোনদিন অস্বীকার করেননি তিনি। এই জন্যেই তাঁর রচনায় প্রতীচ্য বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ থেকে বার্গসঁর পরম-প্রাণবাদ পর্যন্ত যেমন সুস্পষ্ট ছায়া ফেলেছে, তেমনি প্রতীচ্য সাহিত্যের জাগ্রত জৈব-কামনার ও দুর্বার প্রকৃতি-প্রেমের বাণীও অনুরণিত হয়েছে। উপনিষদ, বৈষ্ণব কবিতা,

বাউল গানের মতো তাঁর রচনায় তাই ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সার, মিল, বার্গস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, সুইনবার্ণকেও অহরহই দেখতে পাওয়া যায়। 'অহল্যা', 'বসুন্ধরা', 'মানস সুন্দরী', 'উর্বশী', চিত্রাঙ্গদা' থেকে সুরু করে 'বলাকা', ও 'মহুয়া'র বিখ্যাত কবিতা গুলি পর্যন্ত, রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি স্তরেই প্রতীচ্য দর্শন ও প্রতীচ্য জীবন-বাণীর রূপায়নও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের চোখে সমান ভাবেই ধরা পড়বে। বরং এমন কথাও অনেকের মনে হবে যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলেই, তাঁর হাত দিয়ে প্রাচ্য জীবন-বাণী নূতন ভাষায়, নূতন আঙ্গিকে মূর্তি পরিগ্রহ করতে পেরেছিল। কারণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, দুইয়ের সমন্বয় হয়েছে বলেই, তাঁর বাণী এত পূর্ণ এবং প্রাণবন্ত রূপে এ-কালের মনকে আকর্ষণ করতে পেরেছে। বিশুদ্ধ ওরিয়েন্টালিষ্ট হলে, রবীন্দ্রনাথ এমন সর্বজনগ্রাহ্য হতেন কিনা, তা নিয়ে নিশ্চয় তর্কের অবকাশ আছে।

কাজেই তাঁর প্রথম আমলের সমসাময়িকেরা যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে, ভাষায় ও জীবন-দর্শনে বৈদেশিকতার চিহ্ন দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর রচনাকে আজ আমরা যে চোখে দেখি, সেই ভাবে তার প্রতিটি বর্ণকে যে প্রাচ্য ভাব-ধারায় নিষিক্ত বলে মনে করতে পারেন নি, এজন্যে তাঁদের দোষও দিতে পারি না, অরসিক বা অতত্ত্বজ্ঞও বলতে পারি না। তাঁরা একটা বহিরুপাদানের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার স্বরূপটা বুঝে উঠতে পারেননি। 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিসর্জন', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা', 'অচলায়তন', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতির বিষয়-বস্তু নিয়ে এবং তার ভেতর দিয়ে প্রচারিত মতবাদ নিয়ে এক দিন কি পরিমাণ কলহ ও কোলাহল হয়েছে, তা বাল্যবয়সে আমি নিজেই লক্ষ্য করেছি। এর আগের অধ্যায়ে গেছে তাঁর প্রেম-কবিতার দেহাত্মবাদ নিয়ে, তাঁর শব্দ-গঠনের বিদেশী ঢং নিয়ে, ইউরোপীয় ধারায় মূক প্রকৃতিতে মানবিক সত্তা আরোপ করে তার উদ্দেশে আবেগ-অনুরাগ প্রকাশ নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ। আসলে এগুলো যে বৈদেশিক প্রভাব সঞ্জাতই, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে কি?

সব শেষে রবীন্দ্রনাথের ভারতেতিহাস ও ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যাখ্যান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেই বক্তব্য শেষ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে দেখেছেন, বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মিলন-রূপে। ইউরোপের উগ্র ও

সভ্যাতশীল জাতীয়তাবাদকে তিনি কোনদিনই শ্রেয় বা সমর্থনীয় মনে করেন নি। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং ইউরোপ-আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতায় এই হিংস্র জাতীয়তার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা স্থান পেয়েছে এবং তার পরিবর্তে বিশ্ব-সমস্যার সমাধান হিসাবে ব্যবস্থিত হয়েছে ভারতীয় মৈত্রী-দর্শনের মূল তত্ত্বটি। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষ কোনদিন রাষ্ট্র গৌরব, দিগ্বিজয়, সাম্রাজ্য-বিস্তার বা ঐহিক সমৃদ্ধি লাভকে বড় করে দেখেনি। তাই অন্যের সম্বন্ধে অপ্রেম, অবিশ্বাস বা বৈরিতা তার চিন্তায় আসন লাভ করেনি। গ্রীক, ইরাণী, হুন, আরব, পারসিক, ইহুদী, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, যে যেখান থেকে এসেছে, ভারতবর্ষ কাকেই পর বলে গণ্য করেনি। সকলকেই গ্রহণ করেছে এবং সকলের সংস্কৃতি থেকে প্রাণ-বস্তু আহরণ করে, স্বকীয় সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করেছে। এই সমন্বয়ের আদর্শ হল রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃত ভারতীয় আদর্শ। এখানেই পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য।

বলা অনাবশ্যক এ কথা ভারতীয় সংস্কৃতির এক দিকের পরিচয় উদ্ঘাটিত করে সার্থক রূপেই এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথের এই জীবন-দর্শনই প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সর্বাধিক আদৃত হয়েছে, তাই এই মতবাদের আলোতেই তাঁর সমস্ত রচনাকে বোঝার এবং বোঝানোর চেষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যে এমন নিদর্শন ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে, যা স্পষ্টতই এই সমন্বয়-দর্শনের আওতায় পড়ে না। বরং এই মতবাদের প্রতিকূল পথে চলেছে, এমন উদাহরণই পাওয়া যাবে তাঁর বিশিষ্টতম কতক গুলি রচনার ভেতর। এর কারণ, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আর একটা দিক আছে, যা রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেননি, কিন্তু যার মর্ম-পরিচয় তাঁর অবিদিত ছিল না। এই দিকের ব্যাখ্যানে তিনি নিয়েছেন সংস্কারকের ভূমিকা এবং সেখানে প্রাচ্যের লোকোত্তরতার পরিবর্তে প্রতীচ্যের বাস্তবতাই তাঁকে বেশী আকর্ষণ করেছে।

যে ভারতবর্ষের শাক্ত-শৈব অধ্যুষিত সুপ্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতা একদিন বৈদিক আর্য-অভিযানে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং সেই সভ্যতার অধিকারী জাতি-গোষ্ঠীগুলি উত্তর থেকে পূবে ও দক্ষিণে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল, আর পলায়নে অশক্তেরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত হয়ে শূদ্র বা দাস-জাতিতে পরিণত হয়েছিল, যে নিগৃহীত শূদ্র জাতির অসন্তোষ একদিন বৌদ্ধ-বিপ্লবের মধ্যে প্রকাশমান হয়ে বেদ, ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমের মূলে কঠিন

আঘাত হেনেছিল, ক্রমে যে বৌদ্ধবাদ সাম্রাজ্যবাদে পর্যবসিত হয়েছিল এবং হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানের ধাক্কায় যার সৌধ ভেঙে পড়েছিল, রাজকীয় আশ্রয়ভ্রষ্ট অন্ত্যজের আবার হিন্দুত্বে প্রত্যাবর্তন করে নিছক বিদ্বেষবশেই অত্যাচারের প্রত্যুত্তর হিসাবে নবাগত ইসলামকে বরণ করেছিল, যে মুসলীম-ভারত হিন্দু ও মুসলমানে অধিকার-বৈষম্যের রীতি প্রবর্তন করে, হিন্দুকে মুণ্ড-শুল্ক দিতে বাধ্য করেছিল এবং যার অনিবার্য ফলস্বরূপ নিগৃহীত হিন্দুর আক্রোশই ইংরেজ রাজত্ব সংস্থাপনের পটভূমি রচনা করেছিল, সে ভারতবর্ষ সমন্বয়, মৈত্রী ও প্রেম-ধর্মকে নিশ্চয় জীবন-নীতি রূপে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেনি। তা করলে, জাতিভেদ, অধিকারভেদ, ব্যক্তি মানুষের নির্বিশেষ মূল্যমানের অস্বীকৃতি, ভারতের সমাজকে এতখানি বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল ও দুর্বলতাগ্রস্ত করত না। এমন ভাবে দফায় দফায় তাকে বৈদেশিক আক্রমণ ও শোষণের লক্ষ্যবস্তুও করে তুলত না।

আসলে কথাকথিত তপোবন সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতার আদি-ভিত্তি নয়। এটি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনার সৃষ্টি এবং প্রতীচ্যের সামনে একটি নূতন জীবন দর্শন মেলে ধরার প্রয়োজনে এটি তাঁর অসাধারণ কল্পনা দিয়ে রচনা করেছিলেন, আর সেই রচনার এক দিকে যেমন তিনি ভারতের পূর্বাচার্যদের অনুগমন করেছিলেন, অন্য দিকে তেমনি পাশ্চাত্যের ফিলানথ্রপি বা বিশ্বমানবতাবাদকেও সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই তাঁর রচনায় যেমন বৈদিক ভারত, বৌদ্ধ ভারত ও কালিদাসের ভারতের ছবি পরিস্ফুট হয়েছে, হয়েছে নানক, চৈতন্য, দাদূ, কবীর, বাবা ও রজ্জবের ভারতের ছবি, তেমনি শতেক শতাব্দী ধরে যে ভারতবর্ষে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হয়েছে, যুক্তির চেয়ে সংস্কার যেখানে প্রাধান্য নিয়েছে, বৈধতার চেয়ে বিধি যেখানে সর্বগ্রাসী প্রভুত্ব অর্জন করেছে, দারিদ্র্য, আশঙ্কা ও আত্ম-চেতনাহীন সেই ভারতবর্ষকেও তিনি সমভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাকে ভেঙে নূতন করে গড়ার আদর্শও দিয়েছেন তিনি। এই জায়গায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর আসন এক-পঙক্তিতে সুচিহ্নিত। স্রষ্টা ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের এই রূপটাকেও যেন গৌণ মনে না করা হয় এবং কেবল মাত্র ভারতের সমন্বয়-সাধনা, মরমিয়াবাদ ও মৈত্রীতত্ত্বের গণ্ডী দিয়ে যেন সেই যুগ-পুরুষের আলোকসামান্য মননশীলতাকে বাঁধার চেষ্টা না হয়। সে

চেষ্টা করেছে প্রতীচ্য, কেননা রবীন্দ্র-দর্শনের সেইটুকুই তাঁদের কাছে অভিনব মনে হয়েছে। আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভূমিতে ভূমিষ্ঠ এবং তাঁরই প্রাণ-বাণীর প্রভাবে উজ্জীবিত হয়েছি, আমাদের রবীন্দ্র-পরিচিতির পরিধি শুধু এটুকু হলে চলবে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রাচ্য সংস্কৃতির নিষ্কর্ষ আহরণ করে, তাকে তিনি প্রতীচ্যের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছেন। তাতে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতীয় দার্শনিক প্রজ্ঞা ও কবি কল্পনার সমস্ত ঐশ্বর্য, অতীত সুধী ও আচার্যদের ভাব-তপস্যার সমস্ত ফল। আবার প্রতীচ্যের বিজ্ঞান ঋদ্ধ বস্তু-চেতনা, তার লোককল্যাণ বোধ, তার শতমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমৃদ্ধিকেও তিনি পত্তন করেছেন এনে ভারতের প্রাণ-মৃত্তিকায়। এই ভাবে প্রাচ্য প্রতীচ্যে তিনি গড়েছেন মহামিলনের সেতু। এই সেতুর দিব্য রূপ হল তাঁর সাহিত্য, আর বাহ্য রূপ হল তাঁর বিশ্বভারতী, যে এখনো পূর্ণতর গঠনের অপেক্ষায় রয়েছে। কাজেই সর্বশেষে আবার সেগেল পণ্ডিতের উক্তি স্মরণ করেই বলি যে রবীন্দ্রনাথের মতো অলৌকিক শক্তিমান অধিকারী সম্বন্ধে অন্যের প্রভাব কথাটা তার আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করা চলে না। তাঁর সৃজনী-শক্তির জীবন-রসায়নে নানা দিক, দেশ, জাতি ও যুগের বাণীই নব রূপে সঞ্জীবিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তবু তুলনামূলক সমালোচনার প্রচলিত মাপকাঠি অনুসরণ ভিন্ন কেতাবারিং ব্যাপারটার পাকে অন্য্বন ভৌলযম নেই, একথা আশাকরি বিচারশীল পাঠকরা স্মরণ রাখবেন।

= ৩ =

শিল্পনায়ক রবীন্দ্রনাথ

শিল্প কথাটি আমাদের ভাষায় একই সঙ্গে যেমন ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি তার একটা নির্দিষ্ট অর্থও রয়েছে। ব্যাপকার্থে জাহাজশিল্প বা চর্মশিল্প ও শিল্প, আবার নির্দিষ্ট অর্থে নৃত্য, গীত, অভিনয় এবং সাহিত্য-শিল্পও শিল্প নামেই অভিহিত হয়। রবীন্দ্র চর্চার ক্ষেত্রে আমরা এই দ্বিতীয় অর্থেই যে শিল্প কথাটির ব্যবহার করব, এ অবশ্য বলাই বাহুল্য। কাজেই কারু ও চারু, কলা-কর্মের এই দুই বিভাগের পারস্পরিক পার্থক্যটুকু আশা করি সকলেই স্মরণ রাখবেন। সেই সঙ্গেই স্মরণ রাখবেন যে কাব্য, গান, নৃত্য, চিত্র, অভিনয়, দৃশ্যত শিল্প-কর্মের বিভিন্ন বিভাগ রূপে গণ্য হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা একই প্রাণধর্মকে প্রকাশ করে বিভিন্ন আঙ্গিকে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে শিল্পস্রষ্টা হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর কবিতা, গান, নাটক, গীতিনাট্য, উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ যে অতুলনীয় সাহিত্য-শিল্পের নিদর্শনরূপে সারা দেশের চিত্ত হরণ করেছে, এ কথা ব্যাখ্যা করে বলার যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনি বিশাল রবীন্দ্র সাহিত্যের কলাবৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করে দেখানোরও হয়ত বিশেষ প্রয়োজন নেই। এ দিকটা রবীন্দ্রানুরাগী রসিকদের আলোচনায় যথাযথ-ভাবেই দেশের সামনে উদ্ঘাটিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর শব্দ-যোজনার কৌশল, তাঁর বাক-বিন্যাসের রীতি, তাঁর উপমা-প্রয়োগের প্রণালী, এক-দিকে সরল, অনাড়ম্বর, ভাবগর্ভ বাক্য রচনায়, অন্য-দিকে অলঙ্কৃত, ধ্বনি-গম্ভীর বাক-ভঙ্গিমার সঙ্গে কার না পরিচয় আছে? আর এই পরিচিতির পিছনে রয়েছেন যে আলোকসামান্য স্রষ্টা, তাঁকেও কে না একান্ত করে ভালোবাসেন? কাজেই শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে-কোন আলোচনাই পুনরুক্তি-স্বরূপ হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু শিল্পনায়ক রবীন্দ্রনাথকেও আমাদের ভালো করে বোঝার এবং বোঝানোর প্রয়োজন আছে। এ কথা সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ শুধু অদ্বিতীয় সাহিত্যস্রষ্টাই ছিলেন না, তিনি বিশিষ্ট গায়ক, অভিনেতা এবং কথকও

ছিলেন। চিত্রকর, নৃত্য-প্রবর্তক ও রুচি রক্ষকও ছিলেন। অর্থাৎ চারুকলার প্রধান বিভাগ যেগুলি, তার প্রত্যেকটাতেই তিনি ছিলেন সহজাত দক্ষতার অধিকারী। এই সর্বতোমুখী শিল্প-প্রতিভা তাঁর শুধু একক সাধনার মধ্যে দিয়েই মূর্ত হয়নি, এর প্রভাব ও প্রেরণা তিনি এমন সার্থক ভাবে সারা দেশে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন যে তাঁকে কেন্দ্র করে নৃত্য-গীত, অঙ্কন ও অভিনয়ের নূতন এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি ধারাই দেশে জন্ম লাভ করেছে। দিকে দিকে সেই নূতন কলা-কৃষ্টিই আজ শতমুখে বিকশিত ও বিবর্তিত হতে চলেছে। এই যে সারা দেশে শিল্পরুচি গঠনের অনুপ্রেরণা ও আদর্শ দেওয়া, এ-ই শিল্পনায়ক রবীন্দ্রনাথের মুখ্য দান। এই জায়গায় আশে পাশে, সামনে পিছনে, তাঁর সমধর্মী আর একজনকেও দেখতে পাই না!

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে আমাদের দেশে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের যে ঐতিহ্য চলিত ছিল, তাতে সম্মান বা স্বীকৃতির বস্তু কম ছিল, একথা কেউ বলবেন না। কিন্তু শাস্ত্রসম্মত রাগসঙ্গীত যা, তার প্রচার আজকের মতোই সেদিনও ছিল নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। আর বিচিত্র ও বহুমুখী লোক সঙ্গীত যা, তা কথাকথিত ভদ্রসমাজে অপাঙক্তেয় বলে গণ্য হত। নিরক্ষর ভিখারী, বৈষ্ণব, বাউল ও চাষী-মাঝির মধ্যেই ছিল তার প্রচলন। রবীন্দ্রনাথই এই দুই ধারার মধ্যে সংযোগ ঘটালেন। সর্বোপরি গানকে সমাজের সকল স্তরে, সর্বজনের মধ্যে সম্মানের আসনেও পতিষ্ঠিত করলেন তিনি। রাগসঙ্গীতের চর্চা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন যদু ভট্ট ও গোঁসাইজীর সাহচর্যে, আর লোক সঙ্গীতের প্রাণরস তিনি আহরণ করেছিলেন শিলাইদহ ও বীরভূমের পল্লী গায়কদের কাছ থেকে। তাঁর সৃজনী-প্রতিভার জীবন রসায়নে রূপান্তরিত ও জন্মান্তরিত করেই, এই দুই ধারার গীত সম্পদ তিনি দু-হাতে পরিবেষণ করে দিলেন দেশের স্বরহীন কণ্ঠে। বাংলা গানের যে মিশ্র-রীতিকে আজ আমরা রবীন্দ্র-রীতি বলি এবং যার প্রসার হয়েছে সারা দেশ জুড়ে, এই ভাবেই হয় তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। আজ তাল-মান সুসম্বদ্ধ রাগসঙ্গীতের সঙ্গেই কীর্তন, বাউল, ভাটিয়াল বা রামপ্রসাদী যে সর্বজনের গীতরুচিতে সম মর্যাদায় স্বীকৃতি পেয়েছে, এ শুধু রবীন্দ্রনাথের কীর্তি। একাধারে গীতকার ও সুরকার রূপে তাঁর এই অসামান্যতা শুধু এ দেশে নয়, সব দেশেই বোধ হয় তুলনারহিত। বাংলা গানে এগারো মাত্রা, বারো মাত্রার

তাল, ঝম্পক তাল ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথেরই দান, আশা করি এ সবাই জানেন।

গানের পর নৃত্য। নৃত্যকর হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিজে দু-এক বারের বেশী পাদ-প্রদীপের সামনে উপস্থিত হননি। কিন্তু নৃত্য-শিল্পকেও তিনিই এ দেশে প্রথম জলাচরণীয় করেছিলেন তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নৃত্য-ধারা তিনি খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করেছিলেন। মণিপুরের রাসনৃত্য, গুজরাটের গরবা, দক্ষিণের কথাকলি ও উত্তর-প্রদেশের কথক, সিংহলের ক্যাণ্ডি—কোমল ও কঠিন, দেহময় ও প্রাণময় বিচিত্র নৃত্য-ভঙ্গিমার সমাবেশে তিনি গড়েছিলেন এক অভিনব নৃত্যশৈলী এবং তাকেই রূপায়িত করিয়েছিলেন বিভিন্ন গীতি-নাট্য ও নৃত্য-নাট্যের মাধ্যমে। এখানেও সেই একই মিশ্রণের আদর্শ। চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকা সবাই দেখেছেন এবং ভাবাত্মক নৃত্যকলার এই অনুপম বিচিত্রতার পরিচয়ও পেয়েছেন আশা করি সেই সঙ্গে।

কিন্তু রবীন্দ্র নৃত্যকলার এইটুকুই শেষ কথা নয়। আগেই বলেছি, নৃত্যকে রবীন্দ্রনাথই এদেশে ভদ্রসমাজে প্রথম গ্রহণীয় করেছিলেন এবং সেটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। আমাদের দেশে নৃত্যকলার প্রচলন ছিল পেশাদার বাইজী সমাজে, ভদ্রলোকদের খুসীর আসরে তাঁরা মুজরা করতে আসতেন, তবলচী ও সারেঙ্গী-ওয়ালা সঙ্গে নিয়ে। এছাড়া বাউল ও বৈষ্ণবদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাচ ছিল, আর এক শ্রেণীর নাচ ছিল লাঠিয়াল পালোয়ানদের মধ্যে, যাকে আমরা বলি রায়বেঁশে। আদিবাসী সাঁওতাল-কোল প্রভৃতির সমাজেও ছিল রকমারি নৃত্যের রেওয়াজ। কিন্তু ভদ্রলোকদেরও যে নাচতে আছে এবং শিল্প-সৃষ্টির এ-ও যে একটা বড় দিক, একথা আমরা ভাবতেই পারতাম না। তা দেশকে ভাবালেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবনাই আজ দেশব্যাপী নৃত্যানুশীলনে মূর্ত হয়েছে।

নৃত্যের মতো অভিনয়কেও রবীন্দ্রনাথই প্রথম জাতে তুলেছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল ও দানিবাবু নাট্য-শিল্পের উজ্জীবনে অগ্রনায়ক রূপে অবশ্যই সসম্মানে স্মরণীয়, কেননা, তাঁরাই এদেশে রঙ্গালয়, নাট্যসাহিত্য ও নাট্যাভিনয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। কিন্তু পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাইরে তাঁরা নাট্যাভিনয়কে সার্বজনীন

ভাবে গ্রহণীয় করে তুলতে পারেননি, অভিনেতৃ-সমাজের সামাজিক মর্যাদাও সংস্থাপিত করতে পারেননি সেই জন্যে। গিরিশচন্দ্র ক্ষোভ করে বলেছেন, 'লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়, নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ'। প্রখ্যাত বিনোদিনী দাসী তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'বহুদিন অভিনয় করিয়াছি, বহু মহৎ ভাবকে অভিনয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছি। হয়ত তাহাতে কাহারো কল্যাণ হইয়াছে, কাহারো দুঃখাত হৃদয়ে সান্ত্বনা আসিয়াছে, কিন্তু কোনদিনও রমণী রূপে অতি ভাগ্যহীনাও যে সম্মানটুকু পায়, আমি তাহা পাই নাই!' বলা বাহুল্য গভীর অন্তর্বেদনারই কথা এসব। কিন্তু সামাজিক মনস্তত্ত্বের অনগ্রসরতাই সেদিন এ বেদনা অনিবার্য করে রেখেছিল শিল্পীদের জন্যে। এই মানসিক দৈন্য বিতাড়নে দরকার ছিল রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিশালী পুরুষের এগিয়ে আসা। ঠাকুরবাড়ীর পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে এবং শান্তিনিকেতনে একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করে, আর দেশের জ্ঞানীগুণী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের তাতে কুশীলবরূপে উপস্থাপিত করে, তিনই দেশের সেই চিত্তদৈন্য ভেঙে দিলেন। শিল্পীকে যে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ শিল্প-স্রষ্টা রূপেই দেখতে ও বিচার করতে হয়, একথা দেশকে বোঝালেন। অবশ্য এই সঙ্গে অভিনয় শিল্পে শালীনতা ও পরিমার্জিত রুচির সমাবেশও তিনিই প্রথম করেন, যা স্বয়ং শিশিরকুমারকেও প্রভাবিত করেছে। দ্বিতীয় পর্যায় বিসর্জন, নটীর পূজা, তপতী, এই তিন নাটকে রবীন্দ্রনাথের শেষ মঞ্চাবতরণ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয় জানেন, নট-প্রতিভায়ও তিনি তুলনাহীন ছিলেন, যদিও নাট্য পরিকল্পনাকার রূপেই দেশ তাঁকে বেশী করে জেনেছে। একটা কথা : গানের ক্ষেত্রে যেমন তিনি রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতকে একত্র মিশিয়েছেন, অভিনয়েও তেমনি যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছেন তিনিই।

নৃত্য, গীত ও অভিনয়, প্রয়োগ-শিল্পের এই তিনটি বিভাগেই রবীন্দ্র নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য কি এবং কোথায়, তার অল্প একটু আভাষ দিলাম। আজ যে ঘরে-ঘরে এত গানের অনুশীলন হয়, আমাদের ছেলে-মেয়েরা যে এত ভালো নাচে, গায়, অভিনয় করে, রাজনৈতিক কারণে খণ্ডিতাঙ্গ এবং অর্থনৈতিক বিপাকে বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও, সারা ভারতে বাংলাদেশ আজো যে শিল্প-সংস্কৃতির সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে, এ শিল্পনায়ক রবীন্দ্রনাথেরই

অমিত সাধনার ফল। শুধু এই তিন বিভাগে নয়, চিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথই আমাদের প্রধান অগ্রনায়ক। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল এবং তাঁদের অগণ্য শিষ্য-শিল্পীই আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার খ্যাতি সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত করেছেন। যে বিশিষ্ট অঙ্কন-রীতিকে আমরা মোটা কথায় বলি প্রাচ্য রীতি, তার স্রষ্টা এঁরাই। কিন্তু স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য নন্দলালের আদি-প্রেরণার উৎস যে রবীন্দ্রনাথ, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না।

হ্যাভেল, কাউণ্ট ওয়াকুরা, ভগিনী নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের মিলিত চেষ্টাতেই একদিন কলকাতায় সরকারী চিত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং তাতে সহ-অধ্যক্ষ রূপে যোগ দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অজন্তা, ইলোরা, এলিফেণ্টা, কাংড়া, রাজপুত-মুঘল, নানা শাখায় বিভক্ত ভারতীয় শিল্প সেদিন ব্রঞ্জে, পাথরে, গিরিগুহায়, মন্দির গাত্রে, অথবা পারিবারিক পট-পাটা ও পুঁথির আড়ালেই উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল। আর দেশে এক শ্রেণীর চিত্রশিল্পী খেলো বিলেতী ছবি, যা বাজারে পাওয়া যেত, তারি অনুকরণে জল-রঙা ও তেল রঙা ছবি বানাতেন ধনী লোকের বাগান-বাড়ী সাজানোর জন্যে। হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথের সক্রিয় চেষ্টাতেই খাঁটি ভারতীয় শিল্পের অনুসন্ধান সুরু হল। অনুসন্ধান থেকে এল অনুসরণ, তাই পযবসিত হল এক নূতন অঙ্কন-রীতির উদ্ভাবনে। প্রতীচ্য শিল্পের নিখুঁত বাস্তবিকতার সঙ্গেই প্রাচ্য শিল্পের গভীর অন্তর্মুখিতার সংযোগ করেছেন এঁরা। এঁদের সৃষ্টিকে তাই বিশুদ্ধ প্রাচ্য রীতির সংজ্ঞা দিয়ে বাঁধলে, বিচার হিসাবে সেটা একপেশে হবে। আসলে চিত্রের প্রাণ-ধর্ম বিচারে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রশ্নটাই অর্থহীন ও অবান্তর এবং এ কথা আমাদের শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথই।

যাই হক, একটা জিনিষ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করার মতো যে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য অঙ্কন-রীতির অন্তঃপ্রেরণা দাতা এবং শান্তিনিকেতন কলা ভবনে এই অঙ্কনাদর্শের প্রবর্তক হিসাবে সুখ্যাত হলেও, চিত্রকর হিসাবে তিনি কিন্তু একেবারেই তথাকথিত প্রাচ্য রীতির অনুসরণ করেননি। বরং পিকাসো, মাতিস, গগাঁ প্রমুখ অতি আধুনিক প্রতীচ্য শিল্পীদের সঙ্গেই তাঁর আঙ্গিক ও আদর্শের সমধর্মিতা বেশী লক্ষ্য করা যায়। ত্রি-বৈথিক, অতি-বাস্তবিক, নানা পদ্ধতির অঙ্কন নিয়ে ইউরোপে আজ প্রভূত পরীক্ষা চলছে, যেমন চলছে কবিতার বিষয় এবং বাচন-ভঙ্গী নিয়েও। এর ঢেউ এদেশেও এসেছে, আর

তার স্বরূপ ও সার্থকতা নিয়ে রসজ্ঞ সমাজে বাদানুবাদও চলছে প্রচুর। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে কোন কথার অবতারণা বর্তমান ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে চিত্র ও কবিতার যে ভাষা এত কাল সার্বভৌম ভাবে স্বীকৃত হয়েছে, পাউণ্ড, কাম্মিংসের কবিতায় এবং পিকাসো, মাতিসের ছবিতে তাকে পরিহার করে নূতন ভাষার সন্ধান করা হয়েছে, যার ফলে তাঁদের বেশীর ভাগ রচনাই এখনো পর্যন্ত অবোধ্য রয়েছে। কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই অবোধ্যতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন। চিত্র সম্পর্কে এ ব্যাপারে তাঁর লিখিত মত পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁর আঁকা ছবিগুলিই তাঁর সমর্থনের স্বাক্ষর বহন করছে।

কবির এই স্ব-বিরোধিতা অনেককে বিস্মিত করেছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনের যে গ্রামার তা কোনদিন শেখেন নি, তাই এক দিকে তাঁর সৃজনী মন চিত্র-রচনার পথে পূর্ণ বেগে অগ্রসর হয়েছে, অন্য দিকে তাঁর অনভ্যস্ত তুলিকা অবিরাম যাত্রাপথে হোঁচট খেয়েছে… এই ভাবে মনের ছবি হাতে ফোটা না-ফোটা, রূপ নেওয়া না-নেওয়ার মধ্যে দিয়েই তাঁর ছবিগুলি এক-একটা 'কিছু' হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই তাতে পরিপ্রেক্ষিতের পরিমিতি, দেহ-সংস্থানের সঙ্গতি সব সময় আশা করা চলে না, সর্বাঙ্গীণ বোধ্যতার নিরিখেও তার বিচার করা চলে না। পিকাসো, মাতিসের মতো কোন বিশেষ মতবাদের অনুগমন করেছিলেন তিনি চিত্রাঙ্কনের ব্যাপারে, এ কথা আমি মনে করি না সেই জন্যেই। অবশ্য এর মানে এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রগুলিকে আমি স্বল্প মূল্যে চিহ্নিত করছি। মহাশিল্পীর খেয়ালে যার জন্ম, তার অনস্বীকার্য শিল্প-ধর্ম যাবে কোথায়? তবু নব্য বাংলা চিত্র-শিল্পের অনুপ্রেরণা দাতা, ব্যাখ্যাতা ও পৃষ্ঠপোষক রূপেই যে তিনি বেশী বড়, এ স্বীকার করতে হবে। চিত্রী রবীন্দ্রনাথকে কেউ কেউ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের উপরে স্থান দিচ্ছেন দেখে, তিনি নিজেই কৌতুক করে শেষের দিকের এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তর্ক উঠেছে ঢাক বড়, না ঢাকা বড়? সবাই বলছে ঢাকাই বড়, কেন না লোকটা সামনে রয়েছে। আসলে আমার ছবিকে আমি বিশেষ সময়ের বিশেষ একটা খেয়াল বলে মনে করি, তাই তার নিন্দা-প্রশংসা কোনটা সম্বন্ধেই আমার আত্যন্তিক মাথাব্যথা নেই!'

সংক্ষেপে শিল্পনায়ক রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার কয়েকটা দিক আলোচনা করলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা এমনি অফুরন্ত যে এত অল্প পরিসরে, এত অল্প সময়ে শুধু পূর্বাভাষই দেওয়া গেল, মূল বিষয়ের বিশদ আলোচনার আর সুযোগ হল না। না হক, মাণিকের খানিকও ভালো, মহৎ কথার আংশিক আলাপও কল্যাণপ্রদ। কিন্তু শিল্পনায়ক রবীন্দ্রনাথ কি শুধু আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলার মধ্যে দিয়েই প্রকাশমান হয়েছেন? না, তিনি প্রকাশমান হয়েছেন সমগ্র ভাবে এ যুগের জীবন ও মনন ধারার ভেতর দিয়েই। আজ আমরা বাংলা দেশের নর-নারীরা যে ভাষায় কথা বলি, সে ভাষা, তার বাগভঙ্গিমা, তার শব্দ-প্রয়োগ প্রণালী, ষোল-আনা তাঁরই সৃষ্টি। যে হরফে আমরা লিখি, তার ছাঁদও প্রধানত তাঁর অনুকরণে গঠিত। আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য-পরিচ্ছদের ও চলন-বলনের প্রত্যেকটি বিভাগেই রাবীন্দ্রিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। এর চেয়েও বড়—আমাদের চোখের দৃষ্টি ও মনের চিন্তাও তাঁরই দর্শন ও মননের রসে আজও সঞ্জীবিত। জগৎকে, জীবনকে, প্রেমকে, প্রকৃতিকে আজ আর নূতনতর চোখে দেখা, নূতনতর রঙে চিত্রিত করা কি খুব সহজ? যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন ও চাইছেন, তাঁদের পরিপূর্ণ ব্যর্থতাই প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে চিরন্তন, সার্বভৌম ও সর্বগামী।

বলা বাহুল্য, এ খুবই স্বাভাবিক। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি উন্নতির যুগেই সে-যুগের দুঃখ-বেদনার, সঙ্কট-সমস্যার, আবার আশা-আকাঙ্ক্ষার এবং কামনা-কল্পনার রূপটি সার্থক রূপে প্রাণ পরিগ্রহ করে কোন-না-কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের মননশীলতার ভেতর দিয়ে। এই রকম মানুষদেরই বলা হয় যুগাচার্য এবং তাঁদের মনন, চিন্তন থেকে সুরু করে প্রাত্যহিক দিন-যাপন পর্যন্ত, সমস্ত কিছুই লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে সমাজ-মনস্তত্ত্বকে আমূল সংস্কৃত ও রূপান্তরিত করে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে এ যুগের মুখ্য যুগাচার্য, তাই তাঁর মেধা ও ব্যক্তিত্ব দুইয়েরই প্রভাব আমাদের জীবন-ধারাকে আমূল ভেঙে গড়েছে। এই জীবনধারা বা 'প্যাটার্ণ অব লাইফ' বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? জীবন-যাপনে শ্রী ও শালীনতা বোধ, উন্নত রুচি ও রসবোধ, ব্যষ্টির প্রতি মমত্ব এবং

সমষ্টির প্রতি দায়িত্ব বোধ, এই নিয়েই ত উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্যমান নির্ধারণ করি আমরা, আর সমগ্র ভাবে একেই ত বলা যাবে একটা জাতির শিল্পরুচি! এই জায়গায় নায়ক ও সংগঠক রূপে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যত বড়, তত বড় ত নয়ই, তার কাছাকাছিও পৌছান না আর কেউ। তাই আমি মনে করি, কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই শিল্পনায়ক রবীন্দ্রনাথকেও আমাদের ভালো করে বোঝা এবং বোঝানোর প্রয়োজন রয়েছে।

সংক্ষেপে শিল্পনায়ক রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার কয়েকটা দিক আলোচনা করলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা এমনি অফুরন্ত যে এত অল্প পরিসরে, এত অল্প সময়ে শুধু পূর্বাভাষই দেওয়া গেল, মূল বিষয়ের বিশদ আলোচনার আর সুযোগ হল না। না হক, মাণিকের খানিকও ভালো, মহৎ কথার আংশিক আলাপও কল্যাণপ্রদ। কিন্তু শিল্পনায়ক রবীন্দ্রনাথ কি শুধু আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলার মধ্যে দিয়েই প্রকাশমান হয়েছেন? না, তিনি প্রকাশমান হয়েছেন সমগ্র ভাবে এ যুগের জীবন ও মনন ধারার ভেতর দিয়েই। আজ আমরা বাংলা দেশের নর-নারীরা যে ভাষায় কথা বলি, সে ভাষা, তার বাগভঙ্গিমা, তার শব্দ-প্রয়োগ প্রণালী, ষোল-আনা তাঁরই সৃষ্টি। যে হরফে আমরা লিখি, তার ছাঁদও প্রধানত তাঁর অনুকরণে গঠিত। আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য-পরিচ্ছদের ও চলন-বলনের প্রত্যেকটি বিভাগেই রাবীন্দ্রিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। এর চেয়েও বড়—আমাদের চোখের দৃষ্টি ও মনের চিন্তাও তাঁরই দর্শন ও মননের রসে আজন্ত সঞ্জীবিত। জগৎকে, জীবনকে, প্রেমকে, প্রকৃতিকে আজ আর নূতনতর চোখে দেখা, নূতনতর রঙে চিত্রিত করা কি খুব সহজ? যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন ও চাইছেন, তাঁদের পরিপূর্ণ ব্যর্থতাই প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে চিরন্তন, সার্বভৌম ও সর্বগামী।

বলা বাহুল্য, এ খুবই স্বাভাবিক। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি উন্নতির যুগেই সে-যুগের দুঃখ-বেদনার, সঙ্কট-সমস্যার, আবার আশা-আকাঙ্ক্ষার এবং কামনা-কল্পনার রূপটি সার্থক রূপে প্রাণ পরিগ্রহ করে কোন-না-কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের মননশীলতার ভেতর দিয়ে। এই রকম মানুষদেরই বলা হয় যুগাচার্য এবং তাঁদের মনন, চিন্তন থেকে সুরু করে প্রাত্যহিক দিন-যাপন পর্যন্ত, সমস্ত কিছুই লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে সমাজ-মনস্তত্ত্বকে আমূল সংস্কৃত ও রূপান্তরিত করে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে এ যুগের মুখ্য যুগাচার্য, তাই তাঁর মেধা ও ব্যক্তিত্ব দুইয়েরই প্রভাব আমাদের জীবন-ধারাকে আমূল ভেঙে গড়েছে। এই জীবনধারা বা 'প্যাটার্ণ অব লাইফ' বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? জীবন-যাপনে শ্রী ও শালীনতা বোধ, উন্নত রুচি ও রসবোধ, ব্যষ্টির প্রতি মমত্ব এবং

সমষ্টির প্রতি দায়িত্ব বোধ, এই নিয়েই ত উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্যমান নির্ধারণ করি আমরা, আর সমগ্র ভাবে একেই ত বলা যাবে একটা জাতির শিল্পরুচি! এই জায়গায় নায়ক ও সংগঠক রূপে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যত বড়, তত বড় ত নয়ই, তার কাছাকাছিও পৌছান না আর কেউ। তাই আমি মনে করি, কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই শিল্পনায়ক রবীন্দ্রনাথকেও আমাদের ভালো করে বোঝা এবং বোঝানোর প্রয়োজন রয়েছে।

— ৪ —

রবীন্দ্র মানসিকতার দ্বৈত-রূপ

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাধারণত দুই শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়, এক দল অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা চর্চা ও জীবন-নীতির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে, তাকে বর্তমান কালের উপযোগী ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত করেন, আর একদল অতীতকে বাতিল করে, বর্তমানের ভুল-ভ্রান্তি ও গ্লানি-কলুষ গুলিকে সমধিক গুরুত্ব দেন এবং ত্রুটি-বিমুক্ত ভাবী দিনের আদর্শ সকলের সামনে তুলে ধরেন। দুই বিভাগেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাশীলদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, তাই বিশ্বাস-প্রবণ সাধারণ মানুষরা বিভ্রান্ত হন — কোনটি শ্রেয় পথ, কোনটি নির্ভুল মত, তা স্থির করতে না পেরে তারা দুই চরম প্রান্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাবুডুবু খান। একদল নির্বিচার বশ্যতায় অতীতকে আঁকড়ে ধরেন, অতীতের পুনরাবির্ভাবকেই বর্তমানের পক্ষে কল্যাণকর বলে ভাবেন, আর একদল অধিকতর ব্যগ্রতায় অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে কোন ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল হন।

সাধারণ মানুষকে অবশ্য এজন্যে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাঁরা নিজস্ব অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে সমর্থ নন। তাঁরা চলেন লেখক, নায়ক ও প্রচারকদের নির্দেশ শিরোধার্য করে। কাজেই লোকনায়কদের মধ্যে যদি মত, পথ ও আদর্শ নিয়ে থাকে পরস্পর-বিরোধিতা, তাহলে তাঁদের পক্ষে দিশেহারা হওয়া ছাড়া উপায় কি? এই জন্যেই দেখা যাচ্ছে, দেশবাসীর বৃহৎ একাংশ যখন শোষণহীন সুস্থ নূতন সমাজ গড়ার জন্যে বর্তমানের বিশৃঙ্খল ভাঙার সংগ্রাম করছেন, আর একাংশ ঠিক তখনি বর্তমানকে জীইয়ে রেখে, তারি ভূমিকার ওপর পুরাতনকে পুনরুজ্জীবিত করার সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছেন। দু-পক্ষই দোহাই দিচ্ছেন দেশ-বিদেশের বিজ্ঞ মনীষীদের। কেন না উভয় তরফেই আছেন বহু শ্রেষ্ঠ ও সম্মানভাজন নেতা। ফলে সমাজ-মানস হয়েছে দ্বিধা-বিভক্ত এবং যদিও কল্যাণ উভয়েরই কাম্য, তবু কল্যাণের উপায় নিয়ে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড বিরোধ। এ বিরোধ শুধু এ

দেশে নয়, সারা জগতেই। আজকের যুগাদর্শই পরস্পর-বিরুদ্ধতার আবর্তে পাক খাচ্ছে।

এমন দিনে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনিবার্য ভাবেই চিন্তাশীলদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছে। এক পক্ষ তাঁকে চিত্রিত করছেন শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী রূপে এবং বলছেন, ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাধনা, ভারতীয় জীবন-বোধ ও মননশীলতা তাঁর মধ্যে দিয়ে সর্বোত্তম রূপে প্রকাশমান হয়েছে। আর এক পক্ষ বলছেন, না, ভারতীয়তা অতিক্রম করে তিনি বিশুদ্ধ আন্তর্জাতিকতাকে আমাদের মনের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভৌগোলিক জাতীয়তার ঊর্ধ্বে যে সর্ব-মানবিক ঐক্য রয়েছে, তাকে তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন এবং এজন্যেই অনড় রক্ষণশীলতা ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে তিনি জীবন ভোর সংগ্রাম করেছেন। অর্থাৎ তিনি অতীতবাদী নন, ষোল-আনা ভবিষ্যবাদী।

বলা বাহুল্য, দু-পক্ষের বক্তব্যেই কিছু কিছু সত্য আছে। কেন না রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে যেমন শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী, তেমনি বিশুদ্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদীও এবং উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর মননশীলতার এমন কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, যা তাঁর আগের কোন বাঙালী সাহিত্য স্রষ্টার রচনার ভেতর পাওয়া যাবে না। সত্যিই তিনি ভারতবর্ষের জীবন-বোধ ও চিন্তন-প্রণালীর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা মাথায় করে রাখার মতো। আবার বিশ্ব মানবিকতার যে আদর্শটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন, তা-ও সাদরে মেনে নেবার মতো। ভারতের মৈত্রীদর্শন, তার সমন্বয় পন্থা, যা বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও বাউল সাধনার মধ্যে দিয়ে বয়ে এসেছে, তাকে রবীন্দ্রনাথই সমগ্র আকারে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। ভারতীয় সাধনার এই সমন্বয় তীর্থে তিনিই প্রথম বিশ্ব-মানবের মিলন কামনা করেছেন।

এদিক থেকে তাঁর চেয়ে বড় জাতীয়তাবাদী কে? কিন্তু এই মৈত্রীবাদ বনাম সমন্বয়বাদই তাঁকে আবার ভারতীয়তার তথা জাতীয়তার গণ্ডীর বাইরে নিয়ে গেছে। বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক একাধিকার লাভের নেশায় প্রমত্ত জাতিগুলি যে উগ্র জাতীয়তাবাদের ধাক্কায় গোটা পৃথিবী তোলপাড় করছে, তাকে তিনি নিষ্ঠুর কশাঘাত করেছেন বার বার তাঁর কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে ও বক্তৃতায়। ফ্যাসিষ্ট ইতালী, নাৎসী জার্মানী এবং এশিয়া গ্রাসকামী জাপানের হিংস্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভীক লেখনীর অভিযান

সুবিদিত। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে স্বাধীনতার জন্যে এদেশে যে হিংসা ও সন্ত্রাসের দীর্ঘ নাটক অভিনীত হয়েছে, তিনি তাকেও কঠিন হাতেই আঘাত করেছেন। শোষণহীন সমাজের সুস্থ সমৃদ্ধির মধ্যে নূতন মানুষ গড়ার যে সাধনা রাশিয়ায় রূপ পেয়েছে, তাকে তিনি সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছেন, এ কথারও পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু যে রক্তাক্ত বিপ্লব ও বস্তুমুখী জীবন-দর্শন এই সিদ্ধির মধ্যে মূর্ত হয়েছে, তাকে তিনি কোনমতেই সমর্থন করেননি।

তাহলেই প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কি—বিপ্লবী, না সংস্কারবাদী? বাস্তবের অন্যায়, অনাচার, অব্যবস্থাকে তিনি বাস্তবতা-সম্মত পথে ভেঙে নূতন করে গড়ার পক্ষপাতী, না ভাবের পথে চিন্তার পথে সমষ্টি-মানবের মানসিক বিবর্তন ঘটিয়ে তিনি নূতন বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা করতে চেয়েছেন? কারণ দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবের যেগুলি কারণ, সেগুলিকে তিনি অকারণ বলে মনে করেন নি কোনদিনই, কিন্তু বিপ্লবের যা পথ, তা থেকে তাঁর মন চিরদিনই পিছিয়ে এসেছে, যেহেতু তা সাময়িক ক্ষয়, ক্ষতি ও ভাঙনকে চেষ্টা করলেও এড়াতে পারে না। বরং সেই এড়ানোর প্রয়াসকে প্রতিকূলগামিতা বলে পরিহাস করতেই নির্দেশ দেয়।

এইখানে মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ আসলে ছিলেন কবি এবং তাঁর কবি-সত্তার বনিয়াদ গঠিত হয়েছিল মধ্যযুগীয় ভারতের ভাব-সাধনা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মানবতা বাদের মাল-মশলা দিয়ে। তাই তাঁর মননশীলতায় এক দিকে যেমন দেখা যায় উপনিষদ, বৌদ্ধ সাহিত্য, উত্তর ভারতীয় সন্ত-সাধক এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রভাব, অন্য দিকে তেমনি দেখা যায় শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, গ্যেটে প্রমুখ পাশ্চাত্য কবিদের এবং স্পিনোজা, কাণ্ট, লেসিং প্রভৃতি দার্শনিকের প্রভাব। তাই তিনি একই সঙ্গে মানবতাবাদী, আধ্যাত্ম-বাদী, বৈরাগ্যবাদী, আবার প্রজ্ঞাবাদী, সদাচারবাদী এবং সংস্কারবাদীও। তাঁর মনন ধারার এই মিশ্র-গঠনটি না বুঝলে, তাঁর রাজনীতি, জীবন-নীতি, কোনটারই স্বরূপ ঠিক ঠিক বোঝা যাবে না।

এই যে মিশ্র-মানসিকতা, এ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই সংস্কৃতির সম্মিলিত দানে গড়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানেও একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ-রস আহরণ করেছিলেন, তা কোন ভারত? ঐতিহাসিক ভারত নয় নিশ্চয়! যে ভারতবর্ষে আর্য

অভিযাত্রীদের হাতে সমৃদ্ধতর প্রাগার্য সভ্যতা উৎখাত হয়েছিল এবং এক দিনের শৈব-শাক্ত সভ্যতায় অধিষ্ঠিত মানুষেরা অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, ভূমি-দাসে পরিণত হয়েছিলেন, যাঁদের বেদ-বিরোধী অসন্তোষ বৌদ্ধ ও জৈন বিপ্লবের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল, কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করের প্রতি-বৈপ্লবিক অভিযানে যে সংগঠন অতর্কিতে চূর্ণ হয়েছিল এবং অসন্তুষ্ট শূদ্রের মনোবেদনা নবাগত ইসলামকে আলিঙ্গন করে প্রতিশোধের উপায় খুঁজেছিল, সে-ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের ভাবের ভারতবর্ষ নয়। সে-ভারতবর্ষে ঐক্য, সমৃদ্ধি বা সর্বাত্মক মৈত্রী ছিল না। ছিল শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্গে অধিকার-বঞ্চিতের সঙ্ঘাত, ছিল ভাঙন ও উপপ্লবের দীর্ঘ ধারা এবং বারবার তা সমাজ-সংস্কৃতির বাতাবরণ উল্টে পাল্টে দিয়েছে।

ভারতেতিহাসের সেই প্রত্যক্ষ রূপটি রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বল মননশীল এক কল্পিত তপোবন-সংস্কৃতির রং ঢেলে নূতন ভাবে চিত্রিত করেছেন। তাই যে অংশে মৈত্রী ও সমন্বয়ের আদর্শ ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হয়েছে, সেই অংশটুকুই শুধু তাঁর স্বীকৃতি পেয়েছে। যে অনৈক্য, অসাম্য ও অসমন্বয় থেকে এই সব শুভ প্রচেষ্টার জন্ম, তা তাঁর মনোযোগ থেকে স্খলিত হয়ে গেছে। এই জন্যেই রবীন্দ্র দর্শনের এই দিকটি তাঁর অনুপম কবি-কল্পনার আশ্চর্য নিদর্শন হয়েও, ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা হিসাবে একপেশে এবং অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব আহরণ, তথা রবীন্দ্র মানসের গঠন ব্যাপারেও এই ঐকদেশিকতাই দেখা যাবে। এক দিকে হেগেল ও হেগেলীয় বস্তুবাদ, অন্য দিকে ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সার, মিল ও হাক্সলে প্রবর্তিত নব্য বিজ্ঞানবাদ যে ইউরোপীয় মনীষার জন্মান্তর ঘটিয়েছিল, যা থেকে মার্ক্স এবং ফ্রয়েডের আবির্ভাব, রবীন্দ্রনাথ তাকে অনুধাবন করেছিলেন, কিন্তু অনুসরণ করেন নি। রোমান্টিক পুনরুজ্জীবনের কবিরা এবং সেই আমলের মানবতাবাদীরাই থেকেছেন তাঁর মননশীলতায় ব্যাপ্ত হয়ে, কারণ ভারতীয় মরমিয়াবাদ বনাম মানবতা বাদের সঙ্গে এই ধারার সহধর্মিতা আছে। বাস্তব ইউরোপ, বৈজ্ঞানিক ইউরোপ বা রাজনৈতিক ইউরোপ তাঁকে আকৃষ্ট করেনি, বরং উত্যক্তই করেছে পদে পদে। বার বার তাই ইউরোপীয় যন্ত্রগর্বী সভ্যতা এবং বস্তুমুখী জীবনাদর্শকে তিনি কঠিন সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন। করে হতাশও হয়েছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মনোধর্মই বাস্তবতা বিরোধী। দার্শনিক হিসাবে

তিনি ভাববাদী, কবি হিসাবে মানবতা বাদী, সেই কারণেই অ-বিপ্লবী, যদিও প্রতিক্রিয়াবাদী নন কোন সময়ই। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের দেশে প্রগতির সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও তার পৃষ্ঠপোষণা প্রাপ্ত ভারতীয় ধনিক, বণিক এবং তথাকথিত সরকারী মহলের অকল্যাণকর একাধিকারকে তাঁর চেয়ে বেশী আঘাত আর কে করেছেন? যে বংশ-কৌলীন্য, কাঞ্চন-কৌলীন্য, বিদ্যা-কৌলীন্যের কৃত্রিম বেড়া তুলে দিয়ে, দেশের কৃষক, কারিগর ও সাধারণ মানুষকে এদেশে মনুষ্যত্বের প্রীতিভোজে অপাঙক্তেয় করে রাখা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তাঁর চেয়ে উচ্চতর কণ্ঠে আর কে প্রতিবাদ করেছেন? শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার রাজ্যে সব মানুষের অধিকার-সাম্য তাঁর আগে আর কে এমন স্পষ্ট ভাষায় দাবী করেছেন? পরেও বা আর কার নাম করা যায়?

এক হাতে যেমন তিনি সমাজ-জীবন থেকে অন্ধ অভ্যাসের আগাছা উৎপাটন করেছেন, অন্যায় আচরণের বিষদাঁত উন্মূলন করেছেন, আর এক হাতে তেমনি প্রক্ষেপ করেছেন নূতন সৃষ্টির বীজ। দিয়েছেন সুস্থ সুন্দর জীবন-যাপনের নির্দেশনা। এনেছেন আগত জীবন্ত মানব কল্যাণের অনুপ্রেরণা। তুলে ধরেছেন নূতন আদর্শ ও মূল্যমান। আমাদের যা ভালো, তাকে তিনি বয়ে নিয়ে গেছেন দূর দূরান্তে। নানা দিক দেশের আলো নিয়ে এসেছেন আবার আমাদের ঘরে। এত কাজ তিনি এক হাতে করেছেন এবং করেছেন সাহিত্য-সাধনার বেদীতে দাঁড়িয়েই, এ অবাক হবার কথা বৈকি!

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি বলতে চাঁচ-ছোলা পলিটিক্সের কথা ওঠানো সঙ্গত নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ কোন দলের বা স্কুলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিল্পী, ছিলেন স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই রূপ পেয়েছে তাঁর জীবন দর্শন, যাতে জগতের কথা, জীবনের কথা, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির কথা পরস্পরের পরিপূরক রূপে স্থান পেয়েছে। এর কোনটাকে কোনটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় কিনা এবং যাওয়া সমীচীন কিনা, সে প্রশ্ন যাঁরা তুলবেন, তাঁদের সঙ্গে আমার তর্ক নেই। আমি শুধু প্রাথমিক কয়েকটা কথাই বললাম, যা ঠিক রাজনীতি হয়ত নয়, কিন্তু রবীন্দ্র-রাজনীতির ভূমিকা হিসাবে যার নিশ্চয় কিছুটা সার্থকতা এবং স্বীকৃতি আছে।

= ৫ =

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-কাব্য

প্রাচীন বাংলায় পদ্যই ছিল সাহিত্য রচনার একমাত্র বাহন। তখনকার কবি-সাহিত্যিকরা এক দিকে যেমন গান ও গীতি-কাব্য লিখেছেন, অন্য দিকে তেমনি পদ্যের কাঠামোতেই জীবনচরিত, তত্ত্ববিচার ও পৌরাণিক এবং সামাজিক আখ্যায়িকা রচনা করেছেন। গদ্য রচনা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এবং তখনই গদ্যের মাধ্যমে শুরু হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করা, আবার উপন্যাস, নাটক ও রসাত্মক নিবন্ধ রচনা করা। গদ্য লেখা এবং গদ্য সাহিত্যকে নানা মুখে পরিব্যাপ্ত করা, দুই-ই সম্ভব হয়েছে দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই তাই শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের নব যুগারম্ভ। এই নূতন যুগের দুটি শ্রেষ্ঠ দান হল উপন্যাস আর নাটক, যা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ছিল না। উপন্যাসের কথা থাক, নাটকের প্রসঙ্গই একটু আলোচনা করি।

প্রথম আমলের বাঙালা নাট্যকাররা সবাই গদ্যকেই নিয়েছিলেন নাটক রচনার মাধ্যম হিসাবে। কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে উচ্চ ভাব ও আদর্শ মূলক নাটক তারা লেখেন চলতি ক্রিয়াপদ এবং সর্বনাম সম্বলিত সাধু ভাষায়, আর সমসাময়িক সমাজের কোন সমস্যা নিয়ে কৌতুক নাট্য বা প্রহসন তাঁরা লেখেন সর্বজন-ব্যবহৃত গ্রাম্য ভাষায়। প্রথম আমলের নাট্যকার যাঁরা, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, সকলেই এই দুই ধারাকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেন। রামনারায়ণের 'রুক্মিনী হরণ', মধুসূদনের 'পদ্মাবতী', 'শর্মিষ্ঠা', দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী', 'কমলে কামিনী' প্রথম ধারার ও যথাক্রমে 'কুলীনকুল সর্বস্ব', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'সধবার একাদশী', 'অলীক প্রকাশ' দ্বিতীয় ধারার স্মরণীয় নিদর্শন। এই দুই ধারাতেই বাংলা নাট্যসাহিত্য দীর্ঘ দিন অচলপ্রতিষ্ঠ ছিল, যদিও মধুসূদন অনুভব করেছিলেন যে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের বাকধারায় ওজস্বিতা সঞ্চার করতে হলে পদ্যের ব্যবহার চাই। প্রাথমিক

পরীক্ষা হিসাবে পদ্মাবতী নাটকে কলির মুখে অসম অমিত্রাক্ষর বসিয়েও ছিলেন তিনি। কিন্তু এই ধারার পরীক্ষা অধিকতর সফলতার সঙ্গে করলেন তাঁর পর গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'পাণ্ডব গৌরব', 'জনা' প্রভৃতি নাটকে। নাটকের বাকবিন্যাসে অসম অমিত্রাক্ষরের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে তাই 'গৈরিশ ছন্দ' নামে চলে।

গিরিশচন্দ্রের ধারাটিই তারপর ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হতে থাকে এবং 'সীতা' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল, 'ভীষ্ম' নাটকে ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ, 'যাজ্ঞসেনী' নাটকে অমৃতলাল এই ধারাকেই একান্ত ভাবে অনুসরণ করেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে এঁদের সমসাময়িক হলেও, রবীন্দ্রনাথ নাটকে অসম অমিত্রাক্ষরের ব্যবহার করেন নি কোন দিন। 'রাজা ও রাণী', 'চিত্রাঙ্গদা' 'বিসর্জন' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটকেই হক, আর 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস', 'বিদায় অভিশাপ' প্রভৃতি নাট্য-কবিতাতেই হক, তিনি পূর্ণপর্বের অমিত্রাক্ষর অথবা পয়ারাত্মক অমিত্রাক্ষরকেই সুষ্ঠু বাহন বলে মনে করেছেন। তাঁর এই পদ্ধতি অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালও অনুসরণ করেছেন 'পাষাণী' নাটকে এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের 'লৌহ কারাগার'ও এই আদর্শের একখানি উৎকৃষ্ট নাটক। কিন্তু এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এমন স্বপ্রকাশ যে তাঁকেই এই আঙ্গিকের প্রবর্তক এবং আজ পর্যন্ত এক মাত্র মুখ্য লেখক বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এই ধারা গ্রহণ যে নিতান্তই আকস্মিক বা অকারণ নয়, এ অবশ্য বলাই বাহুল্য। পূর্বোল্লিখিত রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথ নাট্যাকারে উপস্থাপিত করলেও, এরা যে আসলে কাব্য এবং এদের অনুপেক্ষণীয় কাব্য ধর্মই যে মঞ্চনাট্য হিসাবে এদের বেশীর ভাগের অসাফল্যের কারণ, এ বিচারশীল পাঠকরা অনায়াসে বুঝতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে কাব্য রচনার মনোভাবটি জাগ্রত ছিল বলেই, কবি এদের কাব্য-শরীরের গঠনে অণুমাত্র কারু-কর্মের কার্পণ্য করেন নি। নাটক হল মঞ্চনির্ভর। তার বিষয়-বস্তু চোখের সামনে ঘটে, কাজেই পাত্র-পাত্রীর সংলাপ তাতে যথাসম্ভব স্বভাবধর্মী হওয়া চাই। কথোপকথনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে নাটক তাই ষোল-আনা অস্বীকার করতে পারে না। তাই কখনো পূর্ণ, কখনো অর্ধ-বাক্যের অসমমাত্রিক ব্যবস্থাপনাই দৃশ্য-নাট্যের পক্ষে বেশী উপযোগী। কিন্তু কাব্য-নাট্য হল প্রধানত অধ্যয়ন-নির্ভর। তাতে কাব্যের প্রাণ-ধর্ম ও দেহ-ধর্ম

দুটিই তাই সমানভাবে থাকা দরকার। দীর্ঘ, অলঙ্কৃত ও রসার্দ্র ভাষণ যা কাব্যের লক্ষণ, নাট্য-কাব্যেরও লক্ষণ তাই, যদিও তা লেখা হয় বিভিন্ন নর-নারীর কথা-বার্তা এবং উত্তর প্রত্যুত্তরের ভঙ্গীতে। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-কাব্য গুলি এইজন্যেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রচলিত ধারাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেনি।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগে নাট্য-কাব্য কোনদিন লেখা হয় নি। পরেও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'শবরীর প্রতীক্ষা' এবং মোহিতলাল মজুমদারের 'মৃত্যু ও নচিকেতা' এবং 'মহব্বৎ ও নুরজাহান' ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আমার চোখে পড়ে নি। মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' মহীয়সী নায়িকাদের ব্যক্তি-চরিত্র, তাঁদের সঙ্ঘাতময় জীবনদ্বন্দ্ব ছত্রে ছত্রে ফুটেছে ঠিকই, কিন্তু বীরাঙ্গনার প্রতিটি পত্রই হল একক উক্তি। কোন-না-কোন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তা লেখা হয়েছে। কাজেই এ থেকে রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, এমন কথা বলতে পারি না, যদিও 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ', 'বিদায় অভিশাপ' প্রভৃতিতে 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী', 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী', 'সোমের প্রতি তারা' প্রভৃতি পত্র-কবিতার কিছুটা সুরের, এমন কি ভঙ্গীর অনুরনণও নিশ্চয় অনেকে লক্ষ্য করেছেন।

ইংরেজী সাহিত্যে নাট্য কবিতার একটি স্থান বহু কাল থেকে সুচিহ্নিত হয়ে আছে। সেক্সপীয়ার ও সেক্সপীয়ার সম-সাময়িকদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। তাঁদের রচনাবলী প্রধানত কাব্য-ধর্মী না নাট্য-ধর্মী, তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু মিল্টনের 'স্যামসন এগোণিষ্টেস' যে বিশুদ্ধ নাট্য-কাব্য, তাতে আর সন্দেহ নেই। শেলীর 'প্রমিথিয়ুস আন বাউণ্ড', 'চেঞ্চি', কীটসের 'অটো দি গ্রেট', বাইরণের 'ম্যানফ্রেড', টেনিসনের 'হ্যারল্ড', 'বেকেট', ব্রাউনিঙের 'পিপ্পা পাসেস', সুইনবার্ণের 'অ্যাটল্যান্টা অন ক্যালিডন', ম্যাথু আর্নল্ডের 'ইলেকট্রা' ইত্যাদিও বিচিত্র রীতি ও আঙ্গিকের অনুপম নাট্য-কাব্য হিসাবেই রসিক সমাজে আদৃত। এর মধ্যে স্যামসন ও ইলেকট্রা সম্পূর্ণ-রূপে গ্রীক ট্র্যাজেডীর আদর্শে লেখা। 'ম্যানফ্রেড' 'অটো দি গ্রেট', 'হ্যারল্ড' ইত্যাদি সেক্সপীরীয় ঢঙে লেখা হলেও, নাটক হিসাবে প্রায় ব্যর্থ, অন্তঃ কাব্য-বহির্নাটক জাতের রচনা হিসাবেই এগুলি উল্লেখযোগ্য। অবশিষ্টগুলি সবই গীতপ্রধান নাট্য-কাব্য, মিল্টনের 'কোমস' থেকেই চলেছে

এর দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য কবিতাবলীর মূল প্রেরণা যে ইংরেজী সাহিত্যের এই প্রখ্যাত কবিদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন, এ আশা করি আর বলতে হবে না। অবশ্য আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের মতো স্রষ্টার ক্ষেত্রে 'প্রভাব' কথাটা খুব সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার্য, কারণ মেটারলিঙ্ক এবং ইয়েটস থেকেই তিনি রূপক নাট্য রচনার প্রেরণা পান, আর ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের কাছ থেকেই নাট্য-কাব্য রচনার আদর্শ পান, আপন সৃজনী প্রতিভার বিরাট ঐশ্বর্যে তিনি সমস্ত প্রভাবকে সবলে উত্তীর্ণ হয়েই, আপন মৌলিকত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্য কাব্য 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) তাঁর বাল্য রচনা। প্রথম যৌবনে তিনি লেখেন 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪) এবং 'কাহিনী সংগ্রহের অন্তর্গত 'গান্ধারীর আবেদন,' 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ, 'নরক বাস, 'সতী ও লক্ষ্মীর পরীক্ষা' এ সময়ের রচনা (১৯০০)। এ ছাড়া 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কাল মৃগয়া', 'মায়ার খেলা এবং 'তাসের দেশ', 'চণ্ডালিকা' ইত্যাদি আছে, যদিও এগুলি নাট্য পদবাচ্য হলেও, আসলে নৃত্য ও গীতাশ্রয়ী রচনা, সেই কারণেই কাব্য নাট্য বা নাট্য-কাব্যের আলোচনায় তাদের কথা উঠবে না।

এর মধ্যে বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা এবং 'বিদায় অভিশাপ, এই তিনটি রচনাই সর্বসমাদৃত ও সমধিক প্রসিদ্ধ। অবশিষ্ট-গুলির মধ্যে কর্ণ-কুন্তী সংবাদ ও গান্ধারীর আবেদন এবং অংশতঃ সতীও বহুজনের প্রশংসায় সম্বর্ধিত। রাজা ও রাণী বইটিকে কবি পরে 'তপতী' নাম দিয়ে গদ্য-নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। আর প্রকৃতির প্রতিশোধকে বাল্য প্রয়াস হিসাবে প্রায় বাতিলের কোঠাতেই ফেলেছিলেন। সুতরাং প্রথমোক্ত পাঁচটি রচনার মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। বিসর্জনে এক দিকে পুরোহিত-শক্তি ও অন্য দিকে রাজশক্তির মধ্যে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব নিয়ে যে ক্ষমতাদ্বন্দ্ব ফেনিয়ে উঠেছে, তা অবশ্য নাটকেরই উপকরণ। আবার ক্ষমতার ক্ষুধার সঙ্গে ভালোবাসার সুধার সঙ্ঘাতে যে ভাব-দ্বন্দ্ব সমগ্র আখ্যান-বস্তুকে রসাভিষিক্ত করে তুলেছে, তা কাব্যেরও উপকরণ। তাই কাব্য ও নাটকের অবিরাম আরোহ-অবরোহে বিসর্জন নাট্যের আগাগোড়া বিচিত্র একটি সঙ্কর রস দানা বেঁধে উঠেছে। তবু

বিসর্জনই এই পর্যায়ের একমাত্র রচনা, যাতে নাট্য-ধর্মের চেহারাটা অনেক খানি স্পষ্ট করে দেখা যায়, সে রঘুপতি এবং রাণী উভয়ের চরিত্রেই। চিত্রাঙ্গদা এ হিসাবে একেবারেই কাব্য। তার চরিত্র, ঘটনা, জীবন-দ্বন্দ্ব, সবই কবি-কল্পনার মাধুর্য রসে অভিসিঞ্চিত হয়ে, বস্তু-জগৎ ও বাস্তব নর-নারীর সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। যদিও চিত্রাঙ্গদা তাঁর শেষ আত্ম-পরিচিতির সময় নিজেকে বাস্তবী নারী রূপেই অভিহিত করেছেন, তবু তিনি কত টুকু বাস্তবী ? মদন ও বসন্তের মিলিত চক্রান্তে পৌরুষ ধর্মে দীক্ষিতা চিত্রাঙ্গদা রূপময়ী নারীতে পরিণত হলেন এবং পর্বতপ্রস্থে অজ্ঞাতবাসী অর্জুন তাঁর লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রণয় নিবেদন করলেন। তারপর সেই প্রণয় যখন ভাবী সন্তান রূপে চিত্রাঙ্গদার সত্তায় আসন গ্রহণ করল, তখন অচিরস্থায়ী রূপ-লাবণ্য এবং তারই মতো অচিরস্থায়ী প্রেম ঝরে পড়ল। বেরিয়ে এল অভিজ্ঞ, আত্ম-সচেতন নারীর ব্যক্তিত্ব। এ একটি মনোরম তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বকে অপরূপ কাব্যশ্রীতে অলঙ্কৃত করেই কবি উপস্থাপিত করেছেন। বলা বাহুল্য ঠিকই করেছেন। কাব্য-ধর্ম এর যদি একটুও কম হত, যদি এই ধ্বনি-মুখর, চিত্র-প্রচুর, অলঙ্কার-চতুর কাব্য-রীতি বিষয়-বস্তুর ওপর মায়াবরণ টেনে দিয়ে পাঠককে উর্দ্ধায়িত করে না নিয়ে যেত, তাহলে চিত্রাঙ্গদা আর 'বিদ্যাসুন্দর' কি একই পর্যায়ের রচনা হত না ?

'বিদায় অভিশাপ' আমার মতে রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম নাট্য-কবিতা। দুটি নির্মল তরুণ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রেম লোক-কল্যাণ রূপ মহৎ ব্রতের পাষাণ প্রাচীরে আহত হয়ে অকস্মাৎ একদিন চুরমার হয়ে গেল। এক জন তাতে দিল অভিশাপ, অন্য জন দিল অম্লান কল্যাণ-কামনাদীপ্ত শুভাশীষ। একজন অতীতের সহস্র মধুস্মৃতি উদ্ঘাটিত করে, শোনাতে লাগল বেদনার বুক-ভাঙা করুণ কাহিনী, অন্য জন বৈরাগ্যের নির্মল আকাশে পরিব্যাপ্ত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, তাকে দিতে লাগল সেই বাসনাতিক্রমের নির্দেশ, যা জীবন-পথে মানুষের সব চেয়ে বড় সম্বল ! মহাভারত থেকে আখ্যান-বস্তুর ব্যতিক্রম করেছিলেন কবি, সে যেমন তাঁর অসামান্য রস-বোধের পরিচায়ক, পয়ারাত্মক অমিত্রাক্ষরের কাঠামোতে এমন স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত কাব্য-ধারা পরিবেশণ করতে পেরেছেন তিনি, সে তেমনি তাঁর অদ্বিতীয় লিখন নৈপুণের স্বাক্ষর। মধ্যযুগের ইউরোপীয় মনাষ্টারীতে অধ্যয়ন নিরত স্কলার এবেলার্ড ও তাঁর বান্ধবী ইলেইসের প্রেম কাহিনী

পাশ্চাত্যে বহু বিখ্যাত প্রেমকাব্যকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। মহাভারতোক্ত কচ ও দেবযানির কাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হয়ত তারই মৃদু একটা রেখাপাত করেছিলেন। গান্ধারীর আবেদন ও কর্ণ-কুন্তী সংবাদ দুই-ই নিগৃহীত মাতৃত্বের নিরুদ্ধ বেদনাকে ভাষা দিয়েছে। প্রথমটিতে মনুষ্যত্ব মাতৃত্বকে অতিক্রম করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, দ্বিতীয়টিতে অপরিচয়ের জটিল অন্ধকারে লাঞ্ছিত মাতৃত্ব অশ্রুর দোহাইয়ে অন্যায়ের পথরোধ করতে চাইছে। দুটিই অতুলনীয় ভাবদীপ্ত রচনা এবং বলাই বাহুল্য, সতী ও নরকবাস এত উঁচু তালের সৃষ্টি নয়। তবু সতীর মধ্যে তীক্ষ্ণ তরবারির খেলার মতো কথোপকথনের ঔজ্জ্বল্য এবং নরকবাসের পরিকল্পনার অভিনবত্বও একেবারে উপেক্ষনীয় নয়। নাট্যাকারে ছন্দায়িত কৌতুক কাহিনী লক্ষ্মীর পরীক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের রচনা। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে তার বিশিষ্টতাই বা কে অস্বীকার করবেন?

এই হল সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের নাট্য কবিতাবলীর প্রাথমিক পরিচয়। আরো অনেক কথা আছে, যা বলা হল না। অনেক কথা বললাম, যা বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখে। মোটের ওপর সাহিত্যের এই গৌণ একটি বিভাগেও রবীন্দ্রনাথের দান কত এবং সে দানের বৈচিত্র্য কত, তা যদি কিছুটাও বোঝাতে পেরে থাকি, তাহলেই এখনকার মতো আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে করব।

= ৬ =

রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে তিন হাজারের বেশী গান রচনা করেছেন এবং নিজেই তার প্রত্যেকটিতে সুর সংযোজন করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সারা জীবন যাঁরা গান রচনায় কাটিয়েছেন, তাঁদের কারো পুঁজিও বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সমান নয়। অথচ বিস্ময়ের কথা যে গান রচনা রবীন্দ্রনাথের কর্মময় জীবনের একটা গৌণ দিক মাত্র। আরো একটা বিস্ময়, গান রচনা ও সুর-যোজনার দ্বৈত-ভূমিকায় তিনি একই সঙ্গে সম পরিমাণ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

অন্যান্য দেশে যাঁরা গানের কথা রচনা করেন, তাঁরা সব সময় কবি পদবাচ্য হন না। তাঁদের পারিভাষিক নাম হল ভার্ট্‌ওসো। আর যাঁরা সুর রচনা করেন, তাঁদের বলা হয় কম্পোজার। একই ব্যক্তি এ দুই বিভাগে দক্ষ, এমন কোন প্রথম স্তরের নাম প্রতীচ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে এটাই বিশেষত্ব। তানসেন বৈজুবাওরা সদারং প্রমুখ সুরকাররা এবং কবীর দাদু মীরা রজ্জবালি প্রমুখ ভক্তেরা একই সঙ্গে কবি আবার সুরস্রষ্টাও।

উত্তর ভারতেই শুধু এটা দেখা যায় না, যায় দক্ষিণেও। তুকারাম নামদেব ভক্ত নরসী ত্যাগরাজ, সকলেরই ইতিহাস এক। বাংলাতেও জয়দেব চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস রামপ্রসাদ কমলাকান্ত দাশরথি নিধুবাবু রাম বসু এই ঐতিহ্যকে টেনে এনেছেন একেবারে আমাদের আমল পর্যন্ত। এই ঐতিহ্যের সর্বপ্রধান ও সর্বোত্তম অভিব্যক্তি হলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি বঙ্গ-ভারতীর সুরসম্পদ পৌঁছে দিয়েছেন ভুবন-ভারতীর দরবারে।

নিজের সঙ্গীত সত্তার সম্বন্ধে একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, আমার সব চেয়ে অকপট ও আন্তরিক প্রকাশ হয়েছে বোধহয় গানে। গান আমার কাছে আসেনি কোন প্রয়োজনের বরাত নিয়ে। আপন মনের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গানকে রূপ দিয়েছি আমি। বকুল গাছ যেমন অফুরন্ত ফুল বর্ষণ করেও কোনদিন নিঃস্ব হয় না, গানের পসরা আমার সেই রকম। আমার

চরম বিচার হয়ত হবে এক দিন গান দিয়েই। আমি ভুবন-ভারতীর কেনা বাউল।

রবীন্দ্রনাথের গভীরতম ও পরমতম প্রকাশ হয়েছে গানে, একথা তিনি নিজে বলেছেন। বাস্তবিকই রবীন্দ্র সঙ্গীতের ঐশ্বর্য যেমন অফুরন্ত, বৈচিত্র্য তেমনি সীমাহীন। সত্যিই যেন তা বকুল ফুলের মতো অজস্র ও সুরভি-সমৃদ্ধ।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের সাঙ্গীতিক বিচার আমার কাজ নয়। সে চেষ্টাও করব না আমি। আমি শুধু তার স্বরূপ নিধারণের উপযোগী মোটা কথাই বলব কয়েকটা। রবীন্দ্র সঙ্গীত সমগ্র ভাবে প্রবাহিত হয়েছে ত্রিবেণী ধারায়। বাল্যে ও যৌবনে বিশুদ্ধ রাগ-সঙ্গীতের চর্চা করেছিলেন কবি। মধ্য বয়সে কীর্তন বাউল ভাটিয়ালী ও রামপ্রসাদী প্রভৃতি লোকসঙ্গীত অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁকে। আর পরিণত বয়সে তিনি গড়ে তোলেন একটি মিশ্র রীতি, নানা ধারার সমবায়ে যা প্রকাশমান হয়েছে স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি রীতি রূপে।

এই তিনই একত্রে রবীন্দ্র সঙ্গীত রূপে গণনীয়। খাঁটি রাগ-সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে, এমন গানও আছে তাঁর। ষোল-আনা লোকসঙ্গীতের দলে মিশে যায়, এমন গানও আছে। আবার শাস্ত্রসম্মত ব লোকায়ত নয়, এমন গানও আছে এবং অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন, তাঁর দান এই বিভাগেই সব চেয়ে বেশী। আর এই বিভাগের বৈচিত্র্যই সর্বাধিক।

প্রথম দুই বিভাগের চর্চা আজকের দিনে বেশী হয় না বলে, শেষের বিভাগটিই শুধু সাধারণের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীত নামে খ্যাত হয়েছে এবং তে-তলা বটতলা সর্বত্র অনুশীলনও চলছে এই ধারাটিরই। ক্ষতি কিছু নেই এতে, যদি রবীন্দ্র সঙ্গীতের সামগ্রিক পরিচয় এরাই বহন করে না, এই কথাটুকু মনে রেখে অন্য বিভাগ দুটির পুঁজিপাটাও সাধ্যমতো সন্ধান করি আমরা।

মোটের ওপর রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য যে তুলনাহীন, এই কথাই বার বার বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বলতে ইচ্ছা হয়। প্রকৃতির এমন কোন রূপ, মানব-মনের এমন কোন স্বপ্ন, কামনা-বেদনা বা অনুভূতি নেই, যা তাঁর গানে ভাষা না পেয়েছে। শীত গ্রীষ্ম বসন্ত, সকাল বিকাল সন্ধ্যা রাত্রি, জীবন মৃত্যু মিলন বিরহ, সব কিছু যেন এক সঙ্গে অনুরণিত হয়েছে তাঁর

গানে এবং হয়েছে অনুপম রূপে রসে, সুরে তালে। এমন আর হয়েছে কার রচনায়?

আমাদের উচ্চ সঙ্গীতে সুরই সব, তার কথা বা বিষয়-বস্তু হল সুরের চলাচলের পথ। কাজেই তার আসন গৌণ। এই জন্যে দেখা যায়, রাগ সঙ্গীতগুলি কাব্যিক পুঁজির দিক থেকে সবই প্রায় দেউলে। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে অবশ্য ভাব-ব্যঞ্জনার মধুরতা এবং শ্যামা সঙ্গীতের আবেগের আন্তরিকতা আছে, কিন্তু দুইয়েরই ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য পরিমিত। তাছাড়া রচয়িতারা একের পিছে অন্যে চলেছেন, যেন অনেকটা বাঁধা ছকের সড়ক ধরে। এই গতানুগতিকতার মধ্যে মৌলিকতা কত টুকু?

রবীন্দ্রনাথই একমাত্র স্রষ্টা, যাঁর প্রত্যেকটি গান এক-একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফুলের মতো, কারো সঙ্গে কারোর মেলে না! আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করার মতো যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের একেবারে গোড়ার অধ্যায়টি বাদ দিয়ে, আর সবই পড়লে কবিতা, গাইলে গান এবং বলতে বাধা নেই, তাঁর সব চেয়ে নিখুঁত ও নিটোল সৃষ্টি তাঁর গানই, যেখানে দুনিয়ায় তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

নাটকে তাঁর চেয়ে বড় প্রতিভা জন্মেছেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। গল্প-উপন্যাসে ত জন্মেছেনই। আর মননশীল গদ্য প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসাবে বা ভাবানুভূতিময় লিরিক কবি হিসাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। কিন্তু গানে এমন শিল্প-সার্থক শব্দের ও তার সঙ্গে এমন সঙ্গতিময় সুরের মিলন ঘটানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না কোন দেশেই। এই খানে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে সবার বড়।

কিন্তু যে গানের ঐশ্বর্য রেখে গেছেন তিনি আমাদের জন্য, তার অনুশীলনও যাতে যথাযোগ্য ভাবে হয়, সেদিকে হুঁসিয়ার থাকতে হবে আমাদের সকলকেই। তাঁর গানের শব্দ ও সুর দুয়েরই বিশুদ্ধি-রক্ষা হচ্ছে না, এ তিনি নিজে দেখে গেছেন। এজন্যে দুঃখও প্রকাশ করে গেছেন। এই বিশুদ্ধিরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের। আমি বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু শান্তিনিকেতন বাসের দরুণ কানে সুর আছে। তাছাড়া আছে অন্তরে প্রগাঢ়

অনুরাগ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান সম্বন্ধে। তাই ব্যথা লাগে যখন দেখি, প্রাণবন্ত সৃষ্টির প্রেরণা পিছিয়ে পড়েছে এবং পেশার আকর্ষণই আমাদের প্রবল হয়ে উঠছে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে।

অবশ্য সে সম্বন্ধে ভয়ের কিছুই নেই। আজকের এই পেশাদার মানুষরা থাকবেন না, আজকের দিন চলে গেলে। রবীন্দ্র সঙ্গীত থাকবে চির দিন, কালজয়ী অমরত্বে চিহ্নিত হয়ে এবং যুগ থেকে যুগান্তরে প্রবাহিত হয়ে চলবে তা, মহত্তম কবি-কল্পনা ও সুর-সাধনার নিদর্শন রূপে।

=৭=

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে

আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি, আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন প্রকৃত শক্তিধরের ভাগ্যে কদাচিৎ জোটে। বাধা ও বিরোধিতার প্রাচীর লঙ্ঘন করেই তাঁদের অগ্রসর হতে হয় এবং তা করতে হয় বলেই, তাঁদের প্রতিভাও অর্জন করে সেই বলিষ্ঠ গতিবেগ, যার স্ফুরণ হয় না সাধারণের ক্ষেত্রে। এই পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনেও। একেবারে সুরুতেই তিনি যেমন কিছু সংখ্যক জ্ঞানী গুণীর স্বীকৃতি ও সহযোগিতা পেয়েছেন, নিন্দা, বিদ্রূপ এবং প্রতিকূলতাও তেমনি পেয়েছেন, আর সে তরফেও জ্ঞানী-গুণীর সংখ্যা নগণ্য ছিল না। এক দল সেদিনই তাঁর মধ্যে ভাবী রবির অরুণাভাস লক্ষ্য করেছিলেন, আর এক দল তাঁর মধ্যে আশা করার মতো কোন সম্ভাবনীয়তাই দেখেন নি।

আমরা যখন কৈশোর বয়সে সাহিত্য সেবা আরম্ভ করি, দেশের মনোলোকে রবীন্দ্রনাথ তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সর্বক্ষেত্রে তাঁর মত সেদিন প্রামাণ্য বলে গৃহীত। তাঁর রচনাশৈলী সেদিন সাহিত্যিক মাত্রেরই আদর্শ। প্রতি ঘরে তাঁর গান, প্রতি মঞ্চে তাঁর নাটক, সমস্ত স্কুল-কলেজে তাঁর বই পাঠ্য। দেশের জ্ঞান ও কর্মের রাজ্যে সেদিন ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরো অনেকে। প্রত্যেকেই এঁরা ছিলেন এক-এক জন দিকপাল শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু এঁদের সকলকে ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথের শির সেদিন দিগন্ত স্পর্শ করেছে। দেশের বাইরে গোর্কি, রলাঁ, রাসেল, য়েটস, আঁদ্রে জিদ তাঁকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়েছেন। দেশে গান্ধী তাঁকে গুরুদেব বলে স্বীকার করেছেন। দেশে বিদেশে তাঁর বহু রচনার অনুবাদ বেরিয়েছে, বেরিয়েছে তাঁর জীবন ও প্রতিভা নিয়ে অনেক আলোচনা মূলক বই-পুঁথি, প্রবন্ধ-নিবন্ধ। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সার্বভৌম কবি ও দার্শনিক রূপে তিনি সেদিন বিশ্ববিখ্যাত।

কাজেই সঙ্ঘবদ্ধ রবীন্দ্র-বিরোধিতার আবহাওয়া আমরা দেখিনি। যখন তাঁর কবিতার বিরুদ্ধে অবোধ্যতা ও অশ্লীলতার অভিযোগ উঠত, তাঁর উপন্যাস ও নাটকে হত সমাজ-দ্রোহ, হিন্দু-বিদ্বেষ ও সদ্ধর্ম বিরোধিতা আবিষ্কৃত, তাঁর বহু মনোরম রচনার বিকৃত প্যারডি রচিত ও ইতস্তত প্রচারিত হত, তাঁকে বিদ্রূপ ও আক্রমণ করার জন্যে নাটক লিখে রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় করানো হত, সেদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তবে আমাদের প্রথম বয়সেও রবীন্দ্র-বিরোধিতা ছিল। বেগ ও বিস্তার তার কম হলেও, মাঝে মাঝে তা-ও উত্তাল হয়ে উঠত এবং বলতে গেলে তার ধারা চলেছে প্রায় কবির জীবনান্ত পর্যন্তই। কাজেই এক হিসেব সারা জীবনই যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোন-না-কোন আকারে দেশে একটা প্রতিপক্ষ বাহিনী থেকে গিয়েছিল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে।

এই যে প্রতিপক্ষ দলের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কীর্তির ইতিহাসে এরও মূল্য কম নয়। তাছাড়া এঁদের মধ্যে এমন মানুষরা ছিলেন, যাঁদের বাংলা দেশে সম্মানযোগ্য স্থান ও দান আছে এবং সবাই ঈর্ষ্যা, অসূয়া বা মূঢ়তা বশেই রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেন নি। তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধাশীলও ছিলেন না সবাই। এই দিকের ইতিহাস লেখা হয়নি আজো। বর্তমান লেখায় আমিও সে চেষ্টা করছি না। আমি শুধু এই অনুদঘাটিত অধ্যায়টির মূল সূত্রগুলো ধরিয়ে দিতে চাইছি, অধিকতর তথ্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমশীল ও গবেষণানিপুণ কোন নূতন লেখক বা লেখিকা এই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপের প্রেরণা পাবেন বলে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-জীবনের প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। তখন তিনি সন্ধ্যা সঙ্গীতের লেখক রূপে সবে সাহিত্যক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটি বিবাহ সভায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গলায় আপন গলার মালাটি পরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্র সম্পর্ক বেশী দিন প্রীতিপূর্ণ থাকেনি। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বঙ্গদর্শন শেষ করে প্রচার পর্ব সুরু করেছেন। কপোলকুণ্ডলা দুর্গেশনন্দিনী ছেড়ে কোমৎ ও কৃষ্ণ-চরিত্র প্রচারে যেতেছেন এবং আস্তে আস্তে হয়ে উঠছেন রক্ষণশীল সনাতনীদের মুখপাত্র স্বরূপ। এই সময় প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁর অনিবার্য ভাবেই বেধে যায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ফলে ঠাকুর ভ্রাতৃবৃন্দ বনাম বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বেশ কিছু দিন ধরে তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ চলে। বঙ্কিম এ সময় লেখেন 'রবির ছায়া'

এবং অক্ষয় সরকার লেখেন 'ভাই হাততালি'। প্রথমটিতে বলা হয়েছে, রবির দীপ্তি ও প্রতিভা আছে, কিন্তু তাঁর পিছনে দুষ্টগ্রহের ছায়া হল ব্রাহ্ম সমাজ। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে, অন্যান্য ভাইয়ের চেয়ে 'হাততালি ভাই'ই বেশী করে বিগড়ে দিয়েছে যুবক রবীন্দ্রনাথকে, নইলে তাঁর শক্তি ছিল! দুইয়েরই জবাব দিয়েছিলেন কবি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয় সরকার রবীন্দ্র-প্রতিভা অস্বীকার করেন নি। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব বিচার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বঙ্কিম এবং হেমচন্দ্রের জীবনী গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্র রবি-প্রতিভার গুণগান করেছেন মুক্তকণ্ঠে। চন্দ্রনাথ বসু ত তাঁকে পুরুষোত্তম বলেই সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। যদিও অনেকে হয়ত আজ জানেন না যে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'হিং টিং ছট' কবিতাটি তাঁকে লক্ষ্য করেই লেখা। শশধর তর্কচূড়ামণি তথা বঙ্কিমের হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের পক্ষে চন্দ্রনাথ বসু সেদিন হিন্দুধর্মের যে কষ্ট-কল্পিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন, এ তারই জবাব।

কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অবোধ্যতা, অশ্লীলতা ও সমাজ দ্রোহিতার অভিযোগ আনতেন যাঁরা, তাঁরা তাঁর কবি-প্রতিভার মৌলিক গভীরতাই ধরতে পারেন নি। তাঁর বিচিত্র জীবন-বোধ ও ভাব-ভঙ্গীর অভিনবতাও অনুধাবন করতে পারেন নি তাঁরা। হিতবাদী, বঙ্গবাসী ও সাহিত্য পত্রিকাই সেদিন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, টিটকারি ও কুৎসা প্রচার করতেন তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী। হিতবাদী সম্পাদক 'কড়ি ও কোমলের' প্যারডি লিখেছিলেন 'মিঠেকড়া'। বঙ্গবাসী সম্পাদক 'দীর্ঘকেশ কমনীয় কান্তি কোন ব্রাহ্ম কবির' কাহিনী লিখেছিলেন এবং যুবা বয়সে প্রশ্রয় প্রাপ্ত এই কবি কি ভাবে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সর্বনাশে তৎপর হয়েছেন, তার এক আগাগোড়া অলীক কাহিনী প্রচার করেছিলেন। আর সাহিত্য সম্পাদক কলম ধরেছিলেন তাঁর চিত্রাঙ্গদা, নষ্টনীড় ও চোখের বালির অশ্লীলতা আবিষ্কারে।

এঁদের প্রধান মুখপাত্র হয়ে কিছু কাল পরে দেখা দেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং মনে করার কারণ আছে যে তিনি অন্যায় ও অনুচিত আক্রমণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর অভিযোগের সব টুকুই সাহিত্য-কলহ ছিল না। 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক সংগ্রহ পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লেখেন। এতে তিনি তাঁর লিরিক কবিতা গুলির পিছনে ঐশী

শক্তির প্রেরণা আছে বলে দাবী করেন। এতেই ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নীতির মাপকাঠিতে রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল্য বিচার করে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এসব প্রবন্ধের জবাব দেননি রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন বাগচী, যতীন বাগচী, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি রবীন্দ্র-ভক্তেরা দিয়েছিলেন। আর সে জবাবও হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধের মতোই উগ্র, অসহিষ্ণু, অশালীনতা পূর্ণ। এক পক্ষে পূর্বোক্তরা, অন্য পক্ষে ললিত মিত্র, বঙ্কিম মিত্র, বিজয় মজুমদার এবং স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল। বিশ্রী ঝগড়া-ঝাঁটির পালা চলে বেশ কিছুদিন ধরে। তারই শেষ ধাপ হল 'আনন্দবিদায়' নাটক, যাতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-পরিবারের উদ্দেশে কর্দম নিক্ষেপ করে নিজেকেই হেয় করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল।

বঙ্কিম-রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধের মধ্যপর্বে আছে আর একটা অধ্যায়। সে হল পরমহংস-শিষ্যমণ্ডলী বনাম ঠাকুর ভ্রাতৃবৃন্দের, অর্থাৎ আদি ব্রাহ্ম সমাজের মতভেদের অধ্যায়। শোনা যায়, পরমহংস মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানায় যেতেন, নাকি মায়ের বাহন দেখতে। এই গল্পকে বিদ্রূপ করে ভারতীতে প্রকাশিত হল এক প্রবন্ধ 'মায়ের বাহন', যা কারো মতে দ্বিজেন্দ্রনাথের কারো মতে রবীন্দ্রনাথের লেখা। এতে বলা হয়েছে, রামের অভাবে তাঁর খড়ম পূজা করেছিলেন ভরত। কাজেই মায়ের অদর্শনে তাঁর বাহনটাকে পূজা করতে বাধা নেই। কিন্তু আলোচ্য বাহনটা খড়মের মতো নিরাপদ পূজ্য নয়। কাজেই লোহার খাঁচাটা দরকার। অন্ধ ভক্তি ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ছিল এতে। কয়েক জন তৎকালীন পণ্ডিত, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং কিছুসংখ্যক রামকৃষ্ণ-ভক্ত এতে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রবল দ্বন্দ্ব সুরু করেন। এই দ্বন্দ্বের ফলেই কিনা জানি না, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যে কোথাও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বা বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর নিয়ে কিছু লেখেন নি। একটি বার মাত্র উল্লেখ আছে বিবেকানন্দের নামের এবং সে-ও তাঁর একটি প্রবন্ধের একাংশে। আর রামকৃষ্ণ শতবর্ষ উপলক্ষে তিনি লেখেন ক্ষুদ্র একটি সাময়িক কবিতা, যা নিতান্তই শিষ্টাচার মূলক লেখা।

এর পর রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি এবং বিশ্বকবি রূপে তাঁর রূপান্তর। যাঁরা এত দিন একটানা নিন্দা করেছেন, বিদ্রূপ করেছেন, করেছেন তাঁর দোষ-ত্রুটি ও গ্লানি-গলদ আবিষ্কারের চেষ্টা, তাঁরা আস্তে আস্তে পরাভূত ও নতশির হয়ে গেলেন এর পরে। কিন্তু বিরোধিতা বন্ধ হল না তাই বলে।

এবার তা ধরল সংযত, দৃঢ় ও প্রত্যয়নিষ্ঠ সমালোচনার চেহারা এবং যাঁরা এই কাজে কলম ধরলেন, তাঁরা কেউ নগণ্য লোক নন। শশাঙ্কমোহন সেন রবীন্দ্র-দর্শনের তত্ত্ব বিচার করে দেখাতে চাইলেন যে তার ভেতরটা অন্তঃসার-হীন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক নিবন্ধ ও তাত্ত্বিক কবিতাগুলি উপনিষদ ও অদ্বৈত বেদান্তের ভ্যাংচানি মাত্র। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক গুলিকে তিনি তাঁর একগুচ্ছ অসংলগ্ন খাম-খেয়ালের মালা বলে অভিহিত করলেন। যতীন্দ্রমোহন সিংহ দেখালেন, 'বিসর্জনে' রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর শক্তি-পূজাকে বীভৎস রঙে চিত্রিত করেছেন নিজে ব্রাহ্ম বলে। 'অচলায়তনে' হিন্দু সংস্কৃতিকে উন্নতিহীন উদারতাহীন কারাগার রূপে দেখিয়েছেন। 'ঘরে বাইরে'তে পরস্ত্রী হরণ এবং 'চতুরঙ্গে' বিধবার ব্যাভিচারকে মহিমান্বিত করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী, শ্যামা সঙ্গীত ও বাউল গীতির সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের 'অলঙ্কারাতিশয্য এবং আন্তরিকতাহীন বাক্য-সর্বস্বতা' ব্যাখ্যা করলেন। বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আন্দোলন স্বরু করলেন, রবীন্দ্র সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রহীনতার বিরুদ্ধে।

কেউ কেউ বলেন, দেশে এই যে সমালোচনার তুফান উঠল, এর কারণ নাকি আদৌ সাহিত্যিক নয়। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর কবিকে সম্বর্ধিত করতে কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের যে বৃহৎ দলটি, তাঁদের তিনি যোগ্য সমাদরে গ্রহণ ত করেনই নি, বরং রূঢ় প্রত্যাঘাতই হেনেছিলেন দীর্ঘ দিনের আঘাতের উত্তরে। এতেই বিরূপ ও সমালোচনা-মুখর হয়েছিলেন দেশের বিদ্বৎসমাজ। হতে পারে, কারণ স্বয়ং বিপিন পালই এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। আবার না-ও হতে পারে, কারণ শশাঙ্কমোহন সেন শেষ জীবনে কড়া বৈদান্তিক হয়ে পড়েছিলেন, সুসাহিত্যিক হয়েও যতীন্দ্রমোহন ছিলেন আপাদ-মস্তক সনাতনী এবং দীনেশচন্দ্র আজীবনই পল্লী-সাহিত্যের পরমানুরাগী। এ তাঁদের খাঁটি অভিমতও হতে পারে।

কিন্তু এঁদের পাশাপাশি চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তাঁর 'নারায়ণ' পত্রিকা যে রবীন্দ্র-বিরোধিতা সুরু করলেন, তার মতো প্রচণ্ড এঁদের আক্রমণ নয়। চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য হল যে ব্রাহ্মরা খ্রীষ্টান সংস্কৃতির দ্বারা আগাগোড়া প্রভাবিত। বাংলার প্রাণ-ধর্ম যা বৈষ্ণব সাহিত্যে ও শাক্ত সাহিত্যে ফুটেছে, ব্রাহ্মদের

সাহিত্যে তাই তার বালাও নেই। রবীন্দ্রনাথ হলেন ব্রাহ্ম মৌলভী বিশেষ। তাঁর প্রেম-ধর্ম, মানব-ধর্ম, সবই মেকী! এই মেকীত্ব ঢেকেছেন তিনি কৃত্রিম ভাষার ঝুটা কারুকার্য দিয়ে। চিত্তরঞ্জনের পিছু পিছু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতিও লাগলেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই কথাই বিস্তার ও প্রচার করতে। কবি-সাহিত্যিক রূপে তাঁর ব্যর্থতা ত কীর্তিত হতে লাগলই, স্বদেশী আন্দোলন থেকে যখন বিপ্লব ও সন্ত্রাস দেখা দেয়, তখন প্রাণ ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে কি ভাবে তিনি শান্তিনিকেতনে গা-ঢাকা দিয়েছেন, ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহে কি ভাবে পাছ-দোর দিয়ে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, সে সম্বন্ধে সুচিন্তিত গবেষণাও নানা জন ব্যক্ত করতে লাগলেন এঁদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে।

এই পর্যন্ত এলেই মোটামুটি ভাবে আমরা আমাদের আমলে এসে পৌঁছই। তখন কল্লোল, কালি-কলম ও প্রগতির মাধ্যমে নূতন সাহিত্যিকদের আবির্ভাব সূচিত হচ্ছে এবং শনিবারের চিঠি তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে বহুজনের প্রশংসা লাভ করেছে। আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে তখন সবচেয়ে বড় অভিযোগ, তাঁরা যৌনতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন এবং 'সত্যম শিবম ও সুন্দরম' শিল্পের এই ত্রিমুখী আদর্শ মানেন না। জীবন ও সমাজের নোংরা নগ্নতা ও ন্যক্কারজনকতা নিয়েই তাঁদের কারবার। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের ধর্ম' নামে এক প্রবন্ধে এই আধুনিকতাকে আঘাত করলেন। তিনি বললেন, অন্য দেশে হাট জমেছে, তাই সেখানে গোল শোনা যাচ্ছে। এদেশে হাট না থাকুক, হট্টগোল আছে। এই প্রবন্ধ হল ভিমরুলের চাকে ঘা দেওয়ার মতো। নবীন সাহিত্যিকরা প্রতিবাদে অগ্রসর হলেন। স্বয়ং শরৎচন্দ্র এবং নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এসে দাঁড়ালেন তাঁদের পুরোভাগে। কলহ চলল বেশ কিছুদিন এবং মধ্য পথেই অমীমাংসিত থেকে গেল, যদিও রবীন্দ্রনাথ আর একটি প্রবন্ধে জবাব দিয়েছিলেন এই সব বাদ-প্রতিবাদের। সে প্রবন্ধের নাম 'সাহিত্যের নবত্ব'।

নবীন-প্রবীণের এই দ্বন্দ্ব থামার আগেই শনিবারের চিঠিতে মোহিতলাল মজুমদার কোমর বেঁধে অবতীর্ণ হলেন নূতন করে রবীন্দ্র-বিরোধিতার আন্দোলনে। তাঁর অভিযোগ যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের হাতে যে নয়া বাংলা সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, সেই খাঁটি সোনা মাটি হয়েছে

রবীন্দ্রনাথের হাতে। বিশ্বপ্রেম ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ধোঁয়ায় তিনি বাংলার ধর্ম ও সামাজিক সহজতার নীলাকাশ অন্ধকার করেছেন। দিনের পর দিন চলতে লাগল এই মূল অভিযোগকে নানা ভাবে ও নানা ভাষায় বিস্তারিত করা। চরম রবীন্দ্র-বিদূষণ হল কবির সত্তর বৎসরে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত শনিবারের চিঠির বিশেষ সংখ্যায়। নবীনেরা রবীন্দ্রনাথকে ভোগতৃপ্ত অভিজাতদের কবি, বাস্তববিমুখ, দরিদ্রের দৈন্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে অচেতন, এই সব বলেছিলেন। বলেছিলেন, তিনি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার গোষ্ঠীর প্রতিভূ, কেরাণী, স্কুলমাষ্টার ও চাষী-কারিগরদের কেউ না। কিন্তু যে অমর্যাদা তাঁকে এই উপলক্ষে করা হল, তা নবীনেরা কল্পনাও করতে পারেন নি। ঠিক এমনি আক্রমণ চালিয়েছিলেন তাঁর ওপর এ সময় ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ। রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব যে একটা ভেক ছাড়া কিছু না, এই কথা প্রমাণ করার জন্যে মাসের পর মাস তিনি কলম চালিয়েছিলেন 'মাসিক বসুমতীতে'। প্রমাণ করতে পেরেছিলেন কিনা, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন।

এর পর আর দুটো বড় ধাক্কার সম্মুখীন হতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। এক 'চার অধ্যায়' নিয়ে, আর 'বন্দেমাতরম' বনাম 'জনগণ' গান নিয়ে। চার অধ্যায় বইটি তিনি স্যার জন এণ্ডার্সনের অনুরোধে লিখেছেন এবং লিখেছেন বিপ্লবীদের খেলো করার উদ্দেশ্যে এই কথা রটনা হল। সূচনায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের যে উল্লেখ ছিল, সেটাই পুষ্ট করল এই জনরবকে। চারদিক থেকে হৈ-চৈ উঠল দেশে। এ থামতে না থামতেই, সর্বভারতীয় ব্যবহারের জন্যে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের বাংলা অংশ-পরিহারে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন নিয়ে উঠল আর এক কিস্তি হৈ-চৈ। বিরোধীরা বললেন, বন্দেমাতরম জাতির মুক্তিমন্ত্র, তার অঙ্গ-চ্ছেদ অনুমোদন মাতৃ-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ছাড়া কিছু নয়। কেউ কেউ বললেন, আসলে বন্দেমাতরম খেদিয়ে নিজের জনগণ গানটি চালানোই তাঁর উদ্দেশ্য। অধিকতর উৎসাহী কেউ কেউ বললেন, জনগণ গানটি রাজা পঞ্চম জর্জের দরবার উপলক্ষে তাঁরই বন্দনা হিসাবে রচিত।

প্রথম, অর্থাৎ চার অধ্যায়ের বিরুদ্ধ আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। দ্বিতীয় আন্দোলনে ছিলেন অনেকেই। তাঁদের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে রবীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন এই শেষোক্ত অভিযোগের। তাঁর সেই বিখ্যাত চিঠি তখন বিভিন্ন সংবাদপত্রে মুদ্রিত ও

প্রচারিত হয়েছিল। প্রথম আন্দোলনের তিনি জবাব দেন নি, শুধু ব্রহ্মবান্ধবের নামটি উঠিয়ে দিয়েছিলেন চার অধ্যায়ের পরের সংস্করণের ভূমিকা থেকে। এই জায়গায় বলে রাখা দরকার যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ যখন যুবক এবং সুরেশ সমাজপতির সহকারী, তখনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর হয়েছিল বাক-সম্পর্ক, যাতে কবি তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, কাঁচা বাঁশে বাঁশী হয়, কিন্তু লাঠি হয় পাকা বাঁশে! হেমেন্দ্রপ্রসাদ নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন সে কাহিনী।

এই সময় আর একটি আন্দোলনও মৃদু ভাবে চলতে থাকে। সে হল বিশ্বভারতীর নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে মেয়েদের অংশ গ্রহণ নিয়ে রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা। প্রধানত সঞ্জীবনীতেই এই আন্দোলন সুরু হয়, তারপর আস্তে আস্তে ছোটখাটো অনেক কাগজে তা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিশেষ শক্তিসঞ্চয় করতে পারেনি এটা। জনসাধারণ সমর্থন করেন নি বলেই বোধহয়। যাই হক, এই অভিযোগ যাঁরা করেছিলেন, এর প্রতিবাদ করেছিলেন তার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী ব্যক্তিরা এবং হেমেন্দ্র কুমার রায়, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও চারু রায় ছিলেন এই শেষোক্ত দলে।

কিন্তু বৃহত্তম এবং সর্বশেষ বিরোধিতার সম্মুখীন হন কবি তাঁর শেষ রোগশয্যায়। এই আন্দোলন ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতে এবং বামপন্থী রাজনীতিজ্ঞেরা ছিলেন তার পুরোভাগে। এঁদের বক্তব্য হল, উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে মানুষ হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তি, বিশ্ব-কল্যাণ ও মানবাত্মবাদের বাঁধা বুলিতে তাই অভ্যস্ত হয়েছেন তিনি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রযুগে অসম বণ্টনের ধাক্কায় গড়ে উঠেছে যে সর্বহারা সমাজ, তাকে চেনেন না তিনি। জীবনের আঘাত-সঙ্ঘাত থেকে পলায়নপর মন নিয়ে তিনি সরে গেছেন এবং ধোঁয়াটে অরূপ-অসীমের দোহাই দিয়ে বাস্তবকে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং ভাবী দিনের শ্রেণীহীন সমাজে তাঁর কোনই স্থান থাকবে না।

এই আক্রমণের উত্তরে তিনি শেষ শয্যা থেকে লেখা একখানি চিঠিতে বলেছিলেন, "সৃষ্টি পর্যায়ে পঙ্কটাই শুধু সত্যি, পঙ্কজটা মিথ্যা, এ রকম রিয়ালিজমকে স্বীকার করা যায় না। * * * দরিদ্র ও বঞ্চিতের হয়ে আন্দোলন চিরদিন করেছেন কবিরা। কিন্তু তা ভিন্ন কাব্য হবেই না, এমন

আইন বেঁধে দিলে, তা হবে কলা-লক্ষ্মীর উপর জুলুমের মতো। এই জুলুম হিটলার করেছেন, করছেন একদিন রুশরাও। তোমরা কি চাও এই লৌহ ছাঁচ?" বলা বাহুল্য এ কথা বিরুদ্ধবাদীদের জবাব হিসাবে বললেও, নবযুগ ও নূতন জীবন-চেতনাকে তিনি সাদর অভিনন্দন জানাতে ভোলেন নি, সে কবিতাতেও, চিঠি-পত্রেও। তাই যাঁরা তাকে নস্যাৎ করতে অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁরাই আবার রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাঁর পুনর্বসতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অল্পদিন পরেই। অবশ্য কবি তখন লোকান্তরিত।

সারা জীবনে রবীন্দ্রনাথকে যত রকম বিরোধিতা, বৈরিতা, আঘাত, আক্রমণ ও অপ-ভাষণের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, মোটের ওপর এই হল তার সংক্ষিপ্তসার। লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে, সারা জীবনই এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক লোক আন্দোলন করেছেন এবং সে আন্দোলন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অদ্ভুত ও আশ্চর্য রকম স্ব-বিরোধী।

রক্ষণশীলরা তাঁকে বলেছেন, উন্মার্গের প্রশ্রয় দাতা, আবার প্রগতিবাদীরা বলেছেন স্থিতাবস্থার সমর্থক। নীতিবাগীশেরা বলেছেন ভোগাসক্তির আতিশয্য তাঁর রচনায়। বাস্তববাদীরা বলেছেন, দেহাতীত অর্থাৎ অতি-রোমান্টিক কল্পনাময়তাই তার আগাগোড়া। বামপন্থীরা অভিযুক্ত করেছেন তাঁকে শোষণপরায়ণ বুর্জোয়া-সংস্কৃতির সমর্থক বলে। 'উচ্চ' মহল গাবার দোষী করেছেন ভাঙন ও বিপ্লবের প্রেরণা-দাতা বলে। ধার্মিকরা তাঁর মধ্যে পেয়েছেন মেকী দার্শনিকতা ও সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে নিষ্ঠাহীনতা। বৈজ্ঞানিক নিরীশ্বরবাদীরা আবার তাঁকে চিহ্নিত করেছেন মানবাত্মবাদী ধর্মনিষ্ঠ বলে। অর্থাৎ দু-দলই তাঁকে নিয়ে বিবাদ করেছেন, অথচ রবীন্দ্রনাথ যার ঊর্ধ্বেই থেকেছেন বরাবর।

আগেই বলেছি, দু-এক বার তিনি প্রকাশ্যে এই বিবাদ-বিতর্কের জবাব দিয়েছেন, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় নীরব থেকেছেন, নয় ব্যক্তিগত চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন তাঁর মতামত। এই দীর্ঘ বিরোধিতার ইতিহাস ও সেই সব মতামত সংগৃহীত হবে কোন দিন, সেই আশাতেই এই কাঠামো করা রইল।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বইয়ের সময়ানুক্রমিক তালিকা

১৮৭৮—কবি কাহিনী (উপাখ্যান কাব্য)

১৮৮০—বনফুল (কাব্য)

১৮৮১—বাল্মীকি-প্রতিভা (গীতিনাট্য), ভগ্নহৃদয় (কাব্যনাট্য) রুদ্রচণ্ড (কাব্যনাট্য), ইউরোপ প্রবাসীর পত্র (ভ্রমণ কাহিনী)

১৮৮২—সন্ধ্যা সঙ্গীত (কবিতা), কাল মৃগয়া (গীতি নাট্য)

১৮৮৩—বৌঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস), প্রভাত সঙ্গীত (কবিতা), বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ সংগ্রহ)

১৮৮৪—ছবি ও গান (কবিতা), প্রকৃতির প্রতিশোধ (নাট্যকবিতা), নলিনী (গদ্যনাট্য), শৈশব সঙ্গীত (বাল্য কবিতা সংগ্রহ), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (বৈষ্ণব কবিতা)

১৮৮৫—রামমোহন রায় (জীবন আলোচনা), আলোচনা (প্রবন্ধ), রবিচ্ছায়া (গান সংগ্রহ)

১৮৮৬—কড়ি ও কোমল (কবিতা)

১৮৮৭—রাজর্ষি (উপন্যাস), চিঠিপত্র (প্রবন্ধ)

১৮৮৮—সমালোচনা (প্রবন্ধ), মায়ার খেলা (গীতিনাট্য)

১৮৮৯—রাজা ও রাণী (নাট্যকাব্য) .

১৮৯০—বিসর্জন (নাটক), মন্ত্রী অভিষেক (রাজনৈতিক পুস্তিকা), মানসী (কবিতা)

১৮৯১—ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী (১ম খণ্ড—ভ্রমণ)

১৮৯২—চিত্রাঙ্গদা (নাট্যকাব্য), গোড়ায় গলদ (প্রহসন)

১৮৯৩—গানের বহি (গান সংগ্রহ), ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী (২য় খণ্ড—ভ্রমণ)

১৮৯৪—সোনার তরী (কবিতা), ছোট গল্প (গল্প সংগ্রহ), বিদায়-অভিশাপ (নাট্যকবিতা), বিচিত্র গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড—গল্পসংগ্রহ), কথা চতুষ্টয় (গল্পসংগ্রহ)

১৮৯৫—গল্পদশক (গল্প সংগ্রহ)

১৮৯৬—নদী (বর্ণনাত্মক কাব্য), চিত্রা (কবিতা), সংস্কৃত শিক্ষা (১ম ও ২য় খণ্ড—পাঠ্য পুস্তক), কাব্য গ্রন্থাবলী (এই খণ্ডে অপ্রকাশিত মালিনী নাট্য ও চৈতালী কবিতা সংগ্রহ সংযোজিত হয়)

১৮৯৭—বৈকুণ্ঠের খাতা (প্রহসন), পঞ্চভূত (দার্শনিক প্রবন্ধ)

১৮৯৯—কণিকা (নীতি কবিতা)

১৯০০—কথা (গাথা কবিতা), কাহিনী (নাট্যকবিতা ও গাথা কবিতা), কল্পনা (কবিতা), ক্ষণিকা (কবিতা), গল্পগুচ্ছ (১ম ও ২য় ভাগ—গল্প সংগ্রহ)

১৯০১—নৈবেদ্য (তত্ত্ব কবিতা), বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা (ভাষা তত্ত্ব)

১৯০৩—চোখের বালি (উপন্যাস), কর্মফল (গল্প), কাব্যগ্রন্থ (১—৯ খণ্ড —মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত)

১৯০৪—ইংরাজী সোপান (পাঠ্য পুস্তক), স্বদেশী সমাজ (রাজনৈতিক পুস্তিকা), রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী—চিরকুমার সভা উপন্যাস আকারে এই খণ্ডে প্রথম সন্নিবিষ্ট), শিবাজী উৎসব (কবিতা)

১৯০৫—স্বদেশ (দেশাত্মবোধক কবিতা), বাউল (স্বদেশী গান), বিজয়া সম্মিলন (রাজনৈতিক পুস্তিকা)

১৯০৬—আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, রাজভক্তি, দেশ নায়ক (রাজনৈতিক পুস্তিকা), খেয়া (কবিতা), নৌকাডুবি (উপন্যাস)

১৯০৭—বিচিত্র প্রবন্ধ (প্রবন্ধ সংগ্রহ), চারিত্র পূজা (জীবনালোচনা), প্রাচীন সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), লোক সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), আধুনিক সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), হাস্য কৌতুক (হাস্য রসাত্মক নিবন্ধ), ব্যঙ্গ কৌতুক (হাস্য রসাত্মক নাটিকা)

১৯০৮—প্রজাপতির নির্বন্ধ (চিরকুমার সভার উপন্যাস রূপ), সভাপতির অভিভাষণ (পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলন), প্রহসন (গোড়ায় গলদ ও বৈকুণ্ঠের খাতা একত্রে), রাজা-প্রজা, সমূহ, স্বদেশ (রাজনৈতিক পুস্তিকা), সমাজ (সামাজিক প্রবন্ধ), কথা ও কাহিনী (কবিতা), শারদোৎসব (নাটক), গান (গীত সংগ্রহ), শিক্ষা (শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা), মুকুট (শিশু নাট্য)

১৯০৯—শব্দতত্ত্ব (ভাষা-বিজ্ঞান), ধর্ম (ধর্মতত্ত্ব), শান্তিনিকেতন (১ম—৮ম ভাগ—ধর্মজিজ্ঞাসা), ইংরাজী পাঠ (১ম ভাগ পাঠ্যপুস্তক), ছুটির পড়া

(পাঠ্যপুস্তক), শিশু (কবিতা), চয়নিকা (কবিতা সঙ্কলন), প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)

১৯১০—রাজা (রূপক নাট্য), শান্তিনিকেতন (৯ম—১১শ ভাগ), গোরা (উপন্যাস), গীতলিপি (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), গীতাঞ্জলি (গান)

১৯১১—শান্তিনিকেতন (১২শ ভাগ), গীতালিপি (৪—৬ খণ্ড, গান ও স্বরলিপি)

১৯১২—ডাকঘর (রূপক নাট্য), ধর্মশিক্ষা, ধর্মের অধিকার (ধর্মতত্ত্ব), শান্তিনিকেতন (১৩শ ভাগ), জীবন-স্মৃতি (আত্মজীবনী), ছিন্নপত্র (চিঠি), অচলায়তন (রূপক নাট্য), আটটি গল্প, গল্প চারিটি (গল্পসংগ্রহ), পাঠসঞ্চয় (পাঠ্য পুস্তক)

১৯১৪—উৎসর্গ (কবিতা), গীতিমাল্য (গান), গীতালি (গান)

১৯১৫—কাব্যগ্রন্থ (দশ খণ্ডে—কাব্য ও নাটক), গল্প সপ্তক (গল্প সংগ্রহ)

১৯১৬—চতুরঙ্গ (উপন্যাস), ফাল্গুনী (রূপক নাট্য), ঘরে বাইরে (উপন্যাস), বলাকা (কবিতা), পরিচয় (প্রবন্ধ), সঞ্চয় (প্রবন্ধ)

১৯১৭—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (রাজনৈতিক নিবন্ধ), গান (গীত সংগ্রহ), ধর্মসঙ্গীত (গীত সংগ্রহ), গীতলেখা (গান ও স্বরলিপি)

১৯১৮—গুরু (রূপক নাট্য—অচলায়তনের রূপান্তর), গীতলেখা (২য় ভাগ—গান ও স্বরলিপি), পলাতকা (কবিতা), গীতপঞ্চাশিকা (গান ও স্বরলিপি), অনুবাদ চর্চা (পাঠ্য পুস্তক)

১৯১৯—বৈতালিক (গান ও স্বরলিপি), গীতবীথিকা (গান ও স্বরলিপি), কেতকী (গান ও স্বরলিপি), জাপান যাত্রী (ভ্রমণ), শেফালি, কাব্য গীতি (গান ও স্বরলিপি)

১৯২০—অরূপরতন (রূপক নাট্য—'রাজা'র রূপান্তর), পয়লা নম্বর (ছোট গল্প)

১৯২১—ঋণশোধ (নাটক—'শারদোৎসবে'র রূপান্তর), শিশু ভোলানাথ (শিশুকাব্য), শিক্ষার মিলন, সত্যের আহ্বান (রাজনৈতিক নিবন্ধ)

১৯২২—মুক্তধারা (নাটক—'প্রায়শ্চিত্তে'র রূপান্তর), বর্ষামঙ্গল (গান), লিপিকা (গদ্য কবিতা)

১৯২৩—বসন্ত (গীতিনাট্য), নব গীতিকা (গান ও স্বরলিপি)

১৯২৫—পূরবী (কবিতা), সঙ্কলন (প্রবন্ধ সংগ্রহ), গৃহ-প্রবেশ (নাটক), প্রবাহিনী (গান), শেষ বর্ষণ (গান), দেশের কাজ (রাজনৈতিক পুস্তিকা), গীতচর্চা (গান সঙ্কলন)

১৯২৬—শোধ-বোধ (নাটক), রক্ত করবী (রূপক নাট্য), নটীর পূজা (নাটক), ঋতু উৎসব (শারদোৎসব, বসন্ত, শেষ বর্ষণ, ফাল্গুনী প্রভৃতি ঋতুনাট্য একত্রে), গীত মালিকা (১ম ভাগ—গান ও স্বরলিপি)

১৯২৭—লেখন (অটোগ্রাফ কবিতা—জার্মানীতে মুদ্রিত), ঋতুরঙ্গ (গীতিনাট্য)

১৯২৮—শেষ রক্ষা (প্রহসন—'গোড়ায় গলদে'র রূপান্তর), পল্লী-প্রকৃতি (বক্তৃতা)

১৯২৯—সমবায় নীতি (বক্তৃতা), পরিত্রাণ (নাটক—'প্রায়শ্চিত্তে'র রূপান্তর), যাত্রী (ভ্রমণ কাহিনী), যোগাযোগ (উপন্যাস), শেষের কবিতা (উপন্যাস), তপতী (গদ্য নাটক—'রাজা ও রাণী'র রূপান্তর), মহুয়া (কবিতা)

১৯৩০—গীত মালিকা (২য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), ভানুসিংহের পত্রাবলী (চিঠি)

১৯৩১—নবীন (গীতি নাট্য), পাঠ প্রচয় (২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ—পাঠ্য পুস্তক), সহজ পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ—পাঠ্য পুস্তক), রাশিয়ার চিঠি (ভ্রমণ), গীতবিতান (১ম ও ২য় ভাগ—১১২৮টি গানের সঙ্কলন), বনবাণী (কবিতা), সঞ্চয়িতা (কবিতা সঙ্কলন), প্রতিভাষণ (৭০তম জয়ন্তী উৎসবের অভিভাষণ), শাপমোচন (গীতি নাট্য)

১৯৩২—গীতিবিতান (৩য় খণ্ড—গান), পরিশেষ (কবিতা), কালের যাত্রা (নাটিকা), পুনশ্চ (গদ্য কবিতা)

১৯৩৩—দুই বোন (উপন্যাস), বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকিরণ, মানুষের ধর্ম (বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা), চণ্ডালিকা (নাটিকা), তাসের দেশ (নাটিকা), বাঁশরী (নাটক), বিচিত্রা (সচিত্র কবিতা), ভারত পথিক রামমোহন (জীবনালোচনা)

১৯৩৪—মালঞ্চ (উপন্যাস), শ্রাবণ গাথা (বর্ষাসঙ্গীত), চার অধ্যায় (উপন্যাস)

১৯৩৫—শেষ সপ্তক (গদ্য কবিতা), বীথিকা (কবিতা), স্বরবিতান (১ম ভাগ—গান ও স্বরলিপি)

১৯৩৬—শিক্ষা স্বাঙ্গীকরণ (বক্তৃতা), চিত্রাঙ্গদা (নৃত্যনাট্য), পঞ্চভূত (সংশোধিত সংস্করণ), প্রাক্তনী (বক্তৃতা), পত্রপুট (গদ্য কবিতা), ছন্দ (ছন্দতত্ত্ব), শ্যামলী (গদ্য কবিতা), সাহিত্যের পথে (প্রবন্ধ), পাশ্চাত্য ভ্রমণ (ইউরোপ প্রবাসীর পত্র ও ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরির সংশোধিত সংস্করণ), বিচিত্র প্রবন্ধ (সংশোধিত সংস্করণ), স্বরবিতান (২য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), বাংলা শব্দতত্ত্ব (সংশোধিত সংস্করণ)

১৯৩৭—খাপছাড়া (হাসির ছড়া), সে (ছোটদের গল্প), জাপানে ও পারস্যে (ভ্রমণ), কালান্তর (সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ), বিশ্বপরিচয় (বিজ্ঞান), ছড়ার ছবি (ছেলেদের কবিতা), প্রান্তিক (কবিতা)

১৯৩৮—স্বরবিতান (৩য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), পথে ও পথের প্রান্তে (চিঠি), সেঁজুতি (কবিতা), বাংলা ভাষাপরিচয় (ভাষাতত্ত্ব), প্রহাসিনী (রঙ্গ কবিতা), সমাজ (সংশোধিত সংস্করণ), গীতবিতান (১ম খণ্ড—নূতন সংস্করণ)

১৯৩৯—গীত বিতান (২য় খণ্ড—নূতন সংস্করণ), চণ্ডালিকা (নৃত্যনাট্য), আকাশ প্রদীপ (কবিতা), শ্যামা (নৃত্যনাট্য), পথের সঞ্চয় (চিঠি), বাংলা কাব্য পরিচয় (বাংলা কবিতার সঙ্কলন)

১৯৪০—স্বরবিতান (৪র্থ ভাগ—গান ও স্বরলিপি), নবজাতক (কবিতা), সানাই (কবিতা), চিত্রলিপি (ছবি সংগ্রহ), ছেলেবেলা (বাল্য কাহিনী), তিন সঙ্গী (গল্প সংগ্রহ)

১৯৪১—আরোগ্য (কবিতা), জন্মদিনে (কবিতা), গল্প সল্প (ছোটগল্প ও ছড়া), সভ্যতার সঙ্কট (রাজনৈতিক বক্তৃতা)

বিশ্বভারতী সময়ানুক্রমে সাজিয়ে কবির সমুদয় গ্রন্থাবলী ছাব্বিশ খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এই 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র আনুষঙ্গিক রূপেই বেরিয়েছে কবির বাল্যরচনা সমূহেরও একটি সংগ্রহ। তার নাম 'অচলিত সংগ্রহ'। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট বের করছেন এই রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ।

ওপরে যে তালিকা দেওয়া হল, তা থেকে কতকগুলি সাময়িক পুস্তিকার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, আর ঐ তালিকায় বই-এর প্রকাশ কালকেই অনুসরণ করা হয়েছে। কোন-কোন আগেকার লেখা বই সেই জন্যে পরে বসেছে।

গান ও স্বরলিপির ক্ষেত্রে গানগুলিই কবির রচিত। স্বরলিপির বেশীর ভাগই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈরী। এ ছাড়া অন্যদেরও আছে।

ইংরেজী বইয়ের তালিকা

1912—Gitanjali (গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, নৈবেদ্য, খেয়া, শিশু, চৈতালী, স্মরণ প্রভৃতি বইয়ের নির্বাচিত কবিতার কবি-কৃত গদ্যানুবাদ)

1913—Gardener (বিবিধ কবিতার অনুবাদ), Crescent Moon (শিশু কবিতার অনুবাদ), Chitra (চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ)

1914—The King of the Dark Chamber (রাজার অনুবাদ—অনুবাদক ক্ষিতীশ সেন), Post Office (ডাকঘরের অনুবাদ—অনুবাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়), Sadhana (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা), Poems of Kabir (কবীরের দোঁহার অনুবাদ—Underhill-এর সহযোগিতায় কৃত)

1915—Maharani of Arakan (দালিয়া গল্পের অনুভাবে কবি কর্তৃক লিখিত)

1916—Fruit-Gathering (বিভিন্ন বইয়ের কবিতার অনুবাদ), Hungry Stones and other Stories (ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি গল্পের অনুবাদ), Stray Birds (কণিকার অনুবাদ)

1917—My Reminiscences (জীবনস্মৃতির অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর), Sacrifice and other Plays (বিসর্জন প্রভৃতি নাটকের অনুবাদ), Cycle of Spring (ফাল্গুনীর অনুবাদ), Personality (আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা), Nationalism (জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

1918—Lover's Gift and Crossing (বিভিন্ন বইয়ের কবিতার অনুবাদ), Mashi and other Stories (কঙ্কাল, শুভদৃষ্টি প্রভৃতি গল্পের

অনুবাদ), Stories From Tagore (গল্প সঙ্কলন), Parrot's Training (ব্যঙ্গ রচনা)

1919—Centre of Indian Culture (বক্তৃতা), The Home and the World (ঘরে বাইরের অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

1921—Greater India (রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর), The Wreck (নৌকাডুবির অনুবাদ), The Fugitive (মানসী, সোনার তরী, কথা ও কাহিনী, পলাতকা প্রভৃতির নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ), Poems from Tagore (কবিতা সঙ্কলন) Glimpses of Bengal (ছিন্নপত্রের অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

1922—Thought-Relics, Creative Unity (বক্তৃতা)

1924—Gora (গোরার অনুবাদ—অনুবাদক W. Pearson)

1925—Red Oleanders (রক্ত করবীর অনুবাদ), Broken Ties and other Stories (চতুরঙ্গ এবং আরো কয়েকটি গল্পের অনুবাদ)

1931—The Child (মূল ইংরেজী কবিতা), Religion of Man (অক্সফোর্ডে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতা)

1937—Collected Poems and Plays (সমস্ত ইংরেজী কবিতা ও নাটকের সংগ্রহ)

